

শহ-ইয়ার

সৈয়দ মুজিব আলী

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৬

প্রকাশক

ব্রজকিশোর মণ্ডল ,

বিশ্ববাসী প্রকাশনী

৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

মুদ্রক :

শ্রী অশোককুমার নোম

নিউ শশী প্রেস

১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :

গৌতম রায়

শ্রীমান পশুপতি খানের
করকমলে—

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

তুলনামূলক

শব্দনাম

অবিশ্বাস

মুদ্রাক্ষর

কত না অক্ষর জল

ধূপছায়া

ছন্দমধুর

হিটলার

যৌবনে আমার মাথায় ছিল কাঁথার মত চুল। সেলুনের তো কথাই নেই, গাঁয়ের নাপতে পৰ্বন্তু ছাঁটতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত। কাজেই সমস্ত অপারেশনটা এমনই দীর্ঘস্থায়ী আর একঘেয়ে লাগতো, যে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়ে সেলুনে ঢুকতুম। চুলকাটা শেষ হলে পর সেলুনের নাপতে ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেদিনও হয়েছে তাই। কিন্তু—ইয়াল্লা, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চুলের যা বাহারে ‘কট্’ দিয়েছে সে নিয়ে চিতাশয্যায় পৰ্বন্তু ওঠা যায় না, ডোম পোড়াতে রাজী হবে না। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। মহা বিরক্তি আর উন্মাদ গোস্‌সাসহ রাস্তায় নাবলুম।

ঠিক যে ভয়টি করেছিলুম তাই। দশ পা যেতে না যেতেই পাড়ায় ‘উত্তম কুমারের’ সঙ্গে দেখা। উভয়েই খমকে দাঁড়ালুম। আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হলে আমি বেঁচে যেতুম—উত্তম কুমার তা হলে সে বাহারে ‘হেয়ার কট’ দেখতে পেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনারা পেতায় যাবেন না, উত্তম শুধোলে, ‘খাসা ক্যাশানে চুলটা ছেঁটেছে তো হে—সেলুনটা কোথায়? তোমার আবিষ্কার বুঝি?’ গোড়ায় ভেবেছিলুম বাবু আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন। পরে দেখলুম, না। সে গড্ড্যাম্ সিরিয়স।

সেই দিন থেকে একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছি। যা-ই করো, ষা-ই পরো কেউ না কেউ সেটার প্রশংসা করবেই। এমন কি যা-ই লেখ না কেন। সে লেখা সাগররমাপদমণীপ্রাস্ত সবাই কেরং পাঠানোর পরও দেখবে, সেটি লুফে নেবার মত লোকও আছে।

তাই আমার বিশ্বাস, কোন্টা যে সরেস সাহিত্য আর কোন্টা যে নিরেস, সে সম্বন্ধে হ্লেপ করে কিছু বলা যায় না। যদি বলেন, সবাই অমুকের লেখার নিন্দা করছে তবে আমি উত্তর দেব: প্রথমত ভোট দিয়ে সাহিত্য বিচার করা যায় না (এমন কি রাশায় নাকি এক বার 'গণভোট—প্রেবিসিট—নেওয়া হয়, ভগবান' আছেন কি' নেই এবং ভগবান শতকরা 'একটি ভোট পান!) দ্বিতীয়ত, ভালো করে খুঁজলে নিশ্চয়ই সে-লেখকের তারিফদার পাঠকও পাবেন।

তাই আমার পরের স্টেপ: সরেস সাহিত্যিক এবং নিরেস সাহিত্যিকে পার্থক্য করা অসম্ভব।

অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আমি নিরেস সাহিত্যিক বলে এই মতবাদটি প্রচার করছি। আমি ঘাড় পেতে মেনে নিলুম।

মেনে নিয়েছি বলেই ট্রেনে প্লেনে—বিশেষ করে ট্রেনে—আমি আমার পরিচয় দি নে। ছ' একবার আমার সঙ্গীসাথীরা মানা না শুনে ট্রেনে আলোচনার মাঝখানে' অপরিচিতদের কাছে আমার নাম প্রকাশ করে দেন। দেখলুম, আমার ভয় বা ভরসা অমূলক। কেউ কেউ আমাকে চিনতে পারলেন। যদিও আমি নিরেস লেখক।

এ সবে স্মরণে, একদিন যখন আমি একটা মহা বিপদে পড়েছি তখন নিষ্কৃতি পাবার জন্ত আমার নাম, আমি যে সাহিত্যিক সে কথাটা প্রকাশ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটার শব্দ। কে একজন ব্যঙ্গ প্লেষ ঠাট্টা মস্করা সব কিছুই একটা ঘ্যাট বানিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক! ছোঃ! এরকম চেয় চেয় সাহিত্যিক দেখছি নিত্য নিত্য। আমি মশাই আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী কমিটির মেম্বর—কই, আপনার নাম তো কখনো শুনি নি!' আর-সবাই তাঁরই কথায় সায় দিলে।

ঐ দিন থেকে স্থির করেছি, জেলে যাবো, কাঁসীতে ঝুলবো

তাও সেই কিস্তি নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না। পেঁয়াজ-
পয়জার দুই-ই কবুল বিলকুল উল্লুকই শুধু করে।

*

*

*

আমার আপন ভাগ্নী পর্ষস্ত করিয়াদ করে, আমার লয়েলটি-
বোধ নেই; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের নিয়ে গল্প উপন্যাস
লিখিনে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখিনে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোলপুর থেকে শৈয়ালদা যাচ্ছি। এবং
পূর্ব সৎ-কসম অমুখায়ী মুখ যা বন্ধ করেছি তারপর কি ইরেসপনসিবল
কি রেসপনসিবল কোনো 'টকে'র জগুই ডিআইআর আমার
গোঁপাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না—যতপি তখন কম্পার্টমেন্টে তুমুল
তর্ক বেধেছে শ্লীল অশ্লীল সাহিত্যের জাতিভেদ নিয়ে। একবার
লোভও হয়েছিল কিছু বলি, যখন একে অশ্বে সবাই সবাইকে শুধতে
আরম্ভ করেছেন, কেউ লেডি চ্যাটারলিজ লাভারজ পড়েছেন কি
না? দেখা গেল কেউই পড়েন নি। আমার পড়া ছিল। কিন্তু
পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আলোচনাতে কোনো প্রকারের সাহায্য
করলুম না—পাছে ঐ খেই ধরে শেষটায় কেউ না হুম্ করে
শুধিয়ে বসে, 'মহাশয়ের নাম?'—এদেশে এখনো অধিকাংশ লোক
নাম জিজ্ঞাসা করাতে কোনো-কিছু আপত্তিজনক দেখতে পায়
না। আমিও পাইনে—অবশ্য আমি যখন কোঁতুহলী হয়ে অশ্বে
শুধোই, ভাইস্-ভারসা নয়।

তবু আমি চুপ, এবং এমনই নিশ্চুপ যে স্বয়ং কমুনিষ্ট করেন
আপিস পর্ষস্ত আমার বাক-সংঘম দেখে, 'খরশ্শো, খরশ্শো',
শাবাশ শাবাশ জয়ধ্বনি তুলতো।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলুম, এক কোণে যে একটি যুবতী
বসে আছেন তিনি যেন আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন

—আড় নয়নে না, পুরো-পাক্কা সাহস ভরেই। আমি বিশেষ শঙ্কিত হলাম না, কারণ পারতপক্ষে আমি কাউকে আমার কটো উপহার দি না, আর খবরের কাগজে আমার যা ছবি উঠেছে তার তুলনায় আলীপুরের শিম্পানজীর ছবি উঠেছে ঢের ঢের বেশ।

১৮৩০ না ৪০ খৃষ্টাব্দে আসামে বুনো চায়ের গাছ আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বর্ধমান-কেলনার খবর পায় নি যে চা নামক পানীয় আদৌ এ পৃথিবীতে আছে এবং বাংলাদেশেও পাওয়া যায়। কারণ গত চল্লিশ বৎসর ধরে আশ্রয় চেষ্টা করেও আমি বর্ধমান-কেলনারের কাছ থেকে চা আদায় করতে পারি না। এ তত্ত্বটি অনেকেই জানেন; কাজেই বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ানো মাত্রই কামরার অধিকাংশ লোকই চায়ের নিষ্ফল সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নেবে গেলেন। আমি মুসলমান—শ্রীশ্রীগীতার মা ফলেষু কদাচনতে না-হক্ক কেন বিশ্বাস করতে যাবো? বসে রইলুম ঠায়।

এমন সময় ছফ্কার শোনা গেল, 'এই যে আলী সায়েব, চললেন কোথায়?' এবং সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রসহ রেলের মজুমদারের প্রবেশ। আমি ভালোমন্দ কিছু বলার পূর্বেই ফের প্রশ্ন, 'তারপর? "শবনম" কি রকম কাটছে?'

এর পর যা ঘটলো সেটা অবিশ্বাস্য না হলেও আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। সেই অল্প প্রান্তের যুবতীটি হরিণীর মত ছুটে এসে, আমার 'আরে করেন কি, করেন কি, ধামুন' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুসলমানী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করে বাঙ্কের উপর উঠে বসলেন আমার মুখোমুখি হয়ে। ঠিক যেরকম গুরু-শিষ্য পদ্মাসীন হয়ে মুখোমুখি হয়ে বসেন। কারণ, একটু আরাম করার জন্তু আমি ইতিপূর্বে বাঙ্কের হাতলটাকে হেলান বানিয়ে বসেছিলুম হাক্ক-পদ্মাসনে। যুবতী যে-ভাবে আসন নিলেন তাতে আমাদের একে অগ্নোর হাঁটুতে হাঁটুতে আধ ইঞ্চিরও ব্যবধান নয়। এবং সমস্ত অভিযানটি তিনি সম্পূর্ণ করলেন মজুমদার, তাঁর মালবাহী-

কুলী, ছ'একজন প্যাসেঞ্জার যাঁরা 'ভাঁড়ের' চায়েতেই সন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে পড়েছেন—ঐদের সকলের বাহ অবহেলে ভেদ করে।

হার্ড-বয়েলড মজুমদারও যে বেকুবের মত তাকাতে পারে এটা আমি জানতুম না। আমার কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমি যে বেকুব সে আমি চার বছর বয়েস থেকে বড়দার মুখে শুনিছি ; এখনো শুনি।

যুবতী একবার শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, 'ওগো, এদিকে এসো—আমাদের আলী সাহেব!' আমাকে শুধু বললেন, 'বে-আদবী মাফ করবেন, আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারি নি।' ব্যস্ তখনকার মত আর কিছুর না। আমি তো মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছি—বাদবাকি ধীরেস্থস্থ হবে।

ইতিমধ্যে ঐ 'ওগো'-টি, এবং আর পাঁচজনও কামরায় ঢুকলেন। যুবতীর আদেশে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। 'ডাঃ জুলফিকার আলী খান। যেমন দেবী তেমন দেবা নন। ভদ্রলোক বরঞ্চ একটু মুখ-চোরা। শুধু একটু খুশীমুখে বললেন, 'ইনি আপনার প্রকৃত ভক্ত পাঠিকা।' দেবী মুখঝামটা দিলেন, 'আর তুমি বুঝি না?' ভদ্রলোক কোনো গাভিকে জান বাঁচিয়ে কামরার অস্থ কোণের দিকে পাড়ি দিলেন।

নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্ত আমি যুবতীর সঙ্গে মজুমদারের আলাপ করিয়ে দিলুম। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটি তোলার 'একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বহুৎ শুক্রিয়া। 'শবনম' বীবীকে এ কামরায় দাওয়াৎ না করলে আমি তাঁর স্বামীকে পুরোপুরি চিনে নিতে পারতুম না।'

সেই বর্ধমান থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি বেগম খান কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, তাঁর আপন মনের কথা কি কি বলেছিলেন তার পুরো বয়ান কেন, নির্ধাস দেওয়াও আমার তাগতের

বাইরে। গোড়ার দিকে তো তাঁর কোনো কথাই আমার কানে ঢুকাছিল না। বেচারী ডাঃ খান যে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছেন সে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশেষত দেবীর বসায় ধরনটা। আমার ছু হাঁটুর সঙ্গে তাঁর ছু হাঁটু প্রায় ছুঁইয়ে দিয়ে, আমাকে শর্কার্বে কোণ-ঠাসা করে—আমিই বা করি কী, নড়তে গেলেই যে হাঁটুতে গোত্তা লাগবে—আসন না নিয়ে যদি 'ভদ্রতার' দুরূহ বজায় রেখে স্কুল গার্লটির মত ব্রীড়াত্তরা ব্যবহার করতো ত হলে তো ওঁদিকে আর কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো না। এ তো আকছারই হয়। গোড়াতেই আমি নিবেদন করি নি, সব লেখকই বরাবর? সকলেরই কিছু-না-কিছু ভক্ত, অন্ধ স্তাবক ধাকার কথা। তছপরি এ মেয়ে মুসলমান। বাকি গাড়ি হিন্দু। অবশ্য আমাকে আর ঐ হাফ-হিন্দু মোন্দারকে বাদ দিয়ে। হিন্দুদের ধারণা—এবং সেটা হয়তো ভুল নয়—যে, মুসলমান মেয়েরা মাত্রাধিক লাজুক (নইলে বোরকা পরতে যাবে কেন?) কিন্তু এখানে যে ঠিক তার উল্টোটা!

তা সে যাই হোক, গাড়ির সবাই ভদ্রসন্তান; তাঁরা আমাদের ছ'জনকে আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নিয়ে পড়লেন। বেগম খান শুধু মাঝে মাঝে মজুমদারকে তাঁর বাক্য সমর্থনের জন্য বরাত দিচ্ছিলেন। সেও এতক্ষণে হালে পানি পেয়ে গিয়েছে বলে শুধু যে সায় দিচ্ছিল তাই নয়, মাঝে মাঝে খাসা টুইয়েও দিচ্ছিল। তখন আর বেগমকে পায় কে? 'একে ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তায় পেল মৃদঙ্গের তাল!' আমার মনে পড়লো মজুমদার কলেজ আমলে মেয়েদের নিয়ে মস্করা করে কবিতা লিখে রীতিমত নটরিয়াস হয়েছিল। বাঁদরটার খাসলং তিরিশটি বছরেও বদলালো না!

আমি শুধু একটি বার বেগমকে শুধিয়েছিলুম, 'আচ্ছা মিসিস খান—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার নাম শহু-ইয়ার—আরব্য রজনীর শহু-ইয়ার।'

'আচ্ছা, বেগম শহু—'

'না, শুধু শহু-ইয়ার।'

'আচ্ছা, শহু-ইয়ার, আপনি কি কখনো সত্যকার বড় লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যেমন মনে করুন, পরশুরাম—'

'সত্যিকার, মিথ্যেকার জানিনে,—আপনি বড় লেখক।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, 'যাক। আমার কিন্তু সত্যি একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কোনো গ্রেট লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলে আপনি কি করেন। বোধ হয় কবিগুরু যে বর্ণনা দিয়েছেন,

অমল কমল চরণ কোমল চুমিষু বেদনা ভরে -'

বেগম খান সঙ্গে সঙ্গে পদপুরণ করে বললে,

'বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, এই কবিতাটি যে খুব পরিচিত তা নয়, তবু মেয়েটি এর সঙ্গে পরিচিত। এর কাছে কি তবে মুড়ি-মুড়কির একই দর!

এবারে আমি শক্ত কণ্ঠে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি আমার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ না করেন, তবে আমি আর একটি মাত্র কথা বলবো না।'

বিন্দুমাত্র ছুখ প্রশ্ন না করে বললে, 'আপনার মব্জী! ভবিষ্যতে তো সুযোগ পাবো। আমার ভাবনা কি? কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি লক্ষপাত? শাস্তিনিকেতনের বাসা ঠেলেতে গিয়েই আমি লবেজান! বন্ধুর বাসায় উঠবো।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করে চলে গেল স্বামীর কাছে। আমিও তন্মুহূর্তেই পা নামিয়ে বান্ধে সোজা হয়ে বসলুম। পদ্মাসনব্যূহর দুই হাঁটুতে আমি আর হরগিজ বন্দী হবো না।

একটু পরেই ডাক্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে মাঝখানে বসিয়ে ছুঁনা ছুঁদিকে বসল। আমি বললুম, 'ভালোই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। মরার আগে একটা ট্রান্স কল পাবেন। তখন এসে শেষ ইনজেকশনটি দিয়ে দেবেন।'

ডাক্তার বললেন, 'তওবা, তওবা! আর আমি তো প্র্যাকটিক্যাল ডাক্তারী ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। আমি তো রিসার্চ নিয়ে পড়ে আছি।'

বেগম ফিসফিস করে ডাক্তারকে বললেন, 'আঃ! যা কইবার তাই কও না!'

ডাক্তার বললেন, 'যদি ইজাজৎ দেন তবে একটা আর্জ্ আছে। শুনলুম, কলকাতায় আপনি এক দোস্তের বাড়িতে উঠবেন। তার চেয়ে এবারে আমাদের একটা চান্স দিলে আমরা সেটা মেহেরবানী মেনে বড় খুশী হব। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে। যদি হিম্মত দেন তো বলি, আপনার কোনো তকলীফ হবে না।'

আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম, 'কিন্তু এ-যাত্রায় হবে না, আমারই কপাল মন্দ। আসছে বার নিশ্চয়ই।'

বেগম ডাগর চোখ মেলে বললেন, 'আপনার দোস্ত কি ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উপেটা। বহুকাল ধরে শয্যাশায়ী।'

বেগম বললেন, 'আমাদের বাড়িতে ঐ আরেকটি মাইনর সুবিধে যা খুশী খান, যত খুশী খান, কিংবা তিন দিন ধরে কিছুই খেলেন না, হিমে সমস্ত রাত ছাতে চক্কর মারুন, যা খুশী করুন—ডাক্তার তো হাতের কাছে রয়েছে, ভয় কি?'

আমি হেসে বললুম, 'উনি না ডাক্তারী বেবাক ভুলে গিয়েছেন!'

বেগম বললেন, 'কী যেন—নউজুবিল্লা, বলতে নেই—হাতীর দাম লাখ টাকা।'

আমি ভালো করে বুঝিয়ে বললুম যে আমার শয্যাশায়ী বন্ধু আমার জন্তু প্রহর গুণছে। তাই সেখানে না গিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু আসছে বারের অতি অবশ্য, সাত সত্য, তিন কসম ওঁরাই হবেন আমার কলকাতার অন্নদাতা—মেজ্‌মান্ ।

ট্রেন দক্ষিণেগ্বরে ধামলো বলে বেঁচে গেলুম । আমার এক চেনা এবং দোস্ত, পাশের ভিমকোতে কাজ করে ; বোস বলেছিল স্টেশনে আমাকে দেখতে আসবে । লাফ দিয়ে নামলুম প্ল্যাটফর্মে । মজুমদারও বোসকে চেনেন । তিনিও নামলেন ।

কই, রাস্কেলটা আসে নি ।

মজুমদার বললেন, 'জ্যুনে' আলী সাহেব, মেয়েটি বড়ই সরলা । কিন্তু যে কোনো লোক অতি সহজেই ভুল বুঝে মনে করতে পারে উনি বুঝি পুশিং ফ্লাট । এ টাইপ আমি খুব বেশী দেখি নি কিন্তু যা হু'একটি দেখেছি সেও মুসলমান পরিবারে ।'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আপনি এ মীমাংসায় পৌঁছলেন কোন্ পর্যবেক্ষণের ফলে ?'

মজুমদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে গামরায় তুলে দিয়ে নিজে পিছনে ঢুকলেন । বললেন, 'পরে হবে ।'

এবারে কামরাতে সার্বজনীন আলোচনা হলো হিন্দুসমাজে যে 'ডিভোর্স বা লগ্গছেদ প্রবর্তন হয়েছে তাই নিয়ে । মুসলমানদের ভিতর তো গোড়ার থেকেই আছে ; কিন্তু প্রশ্ন তার সুবিধে নেয় বাঙলাদেশের কি পরিমাণ মুসলমান নরনারী ? অল্পই । তবে হিন্দুদের বেলা ? আলোচনাটা জমলো ভালো, কারণ ডাক্তার আর আমি, হিন্দুদের অজানা, মুসলমানদের পারিবারিক ভিত্তি সম্বন্ধে তথ্য সাপ্লাই করলুম, আর হিন্দুরা তাই নিয়ে স্পেকুলেট করলেন ।

'বেগম সাহেব মুখ খুললেন না । তবে ওস্তাদের মার শেষ রাত । ট্রেন যখন শেয়ালদা পৌঁছল তখন তিনি মোক্ষম বাণ ছাড়লেন, 'হিন্দুদের মেয়ে-ইস্কুলে এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড টেকস্ট বুক ছুদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ । আমার বান্ধবীর মেয়েকে দিন সাতেক আগেও পড়িয়েছি ।'

দুই

হিন্দুরা বলে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। বোধহয় কথাটা সত্য, নইলে শহর-ইয়ার আমার ক্যালিবারের লেখককে নিয়ে অতখানি মাতামাতি করবে কেন? এদেশে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মুসলমান লেখক নেই, কাজেই আলী, আলীই সই। কথায় আছে, বিপদে পড়লে শয়তান তক্ মাছি ধরে ধরে খায় L

উপস্থিত অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাছিই শয়তান খাবে। কথাবার্তায় তো মনে হলো ডাক্তার পরিবার কলকাতার খানদানীদের একটি। অতএব নিশ্চয়ই উত্তম মোগলাই খানাপিনার অনটন হবে না। সুভাষিতের একটি দোহা সামান্য ট্যারচা করলে অর্থ দাঁড়ায় 'পণ্ডিতদের সবই গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, ব্যাটারা বড় মূর্খ।' হিন্দুদের বেলাও তাই। ওদের অনেক গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, তারা মাংস রীতিতে জানে না। সেটা মেরামৎ করার জন্ম সমস্ত জীবন ধরে জীবনটা তো ওদের সঙ্গেই কাটালুম—চেষ্টা দিয়েছি। মাতাল যেমন গাঁঠের পয়সা খচা করে অন্যকে মদ খেতে শেখায়, পরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেশাটি করবে বলে, আমিও তেমনি বিস্তর হিন্দুকে গায়ে পড়ে মোগলাই শেখাবার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার মেহন্নৎ বরদাস্ত করেছি, পরে তারই মেওয়াটি খাবো বলে, কিন্তু হলে কি হয়, ঐ যে মুসলমানবা বলে হিন্দুরা বড় সঙ্কীর্ণচেতা, আপন ধর্মের গণ্ডীর ভিতর কাউকে 'ভাইব্রাদার' বলে নিতে চায় না, রান্নার বেলা অন্তত নিশ্চয়ই তাই। তা সে যাক্ গে, এখন যখন 'শহর-ইয়ার' গল্পোদক জুটে গেছে তখন 'কূপোদকের কি প্রয়োজন।

কিন্তু হায় নল রাজার ভাজা মাছটির মত আমার মুর্গ-মুসল্লমগুলো হঠাৎ প্যাখনা গজিয়ে ডানা মেলে 'কোকোরো' রব ছেড়ে হাওয়ায়

মিলিয়ে গেল। ট্রেনে কথা ছিল, যেখানেই উঠি না কেন, ডাক্তার-পরিবারে প্রথম একটা ডিনার দিয়ে 'মুখবন্ধ' অবতরণিকা সেয়ে পরের পরিপাটি ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে উঠেই দেখি আমার নামে টেলিগ্রাম—তদগুেই শান্তিনিকেতন ফিরে যেতে হবে।

সে রাত্রেই আপার-ইণ্ডিয়া ধরতে হলো। রেলের মোন্দার ঠেলেঠেলে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিলে।

ঘণ্টু বাগচীকে বরাত দিতে এলুম সে যেন আমার আকস্মিক নির্ঘণ্ট পরিবর্তনটা শহর-ইয়ার' বাবুকে জানিয়ে দেয়। আমার রাঢ়ী, বৈদিক, কুলীন, মৌলিক মেলা চেলা আছে, কিন্তু মুসলমানকে ট্যাঙ্ক করতে হলে বারেন্দ্রই প্রশস্ততম। ওরা এখনো বদনা ব্যবহার করে।

বোলপুরে ফিরে হপ্তা তিনেক সাধনার ফলে মুর্গী রোস্টের শোক ভুলে গিয়ে যখন পুনরায় ঝঙে-পোস্ত, কলাইয়ের ডাল হার টমাটোর টকে মনোনিবেশ করছি এমন সময় শূনি তীব্র মপদ্র বামা-কণ্ঠ। আমার বাড়িটা একেবারে শ্মশানের গা ঘেঁষে অর্থাৎ লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে। বামা-কণ্ঠ কেন, কোনো কণ্ঠই সেখানে শোনা যায় না। বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, শহর-ইয়ার, দূরে ডাক্তার, তারো দূরে প্রাচীন যুগের ইয়া লাশ মোটর গাড়ি।

আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। শহর-ইয়ার পুরো-পাক্কা বাঙালী-মুসলমানী কায়দায় মাটিতে বসে, মাথায় ঘোমটা টেনে, ছ'হাত দিয়ে আমার ছ'পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আমি তাকে দোয়া জানালুম, মনে মনে দরুদ পড়লুম।

এবারে দেখি ওর ভিন্ন রূপ। আমি আশঙ্কা করেছিলুম সে কলরব করে নানান অভিযোগ আরম্ভ করবে—খবর না দিয়ে চলে এলুম, এসে একটা চিঠিপত্র দিলুম না—বাকি আর বলতে হবে না; মেয়েরা করিয়াদ আরম্ভ করলে যাছকরের মত ফাঁকা বাতাস থেকে করিয়াদের খরগোশ বের করতে পারে।

শুধু অত্যন্ত নরম গলায় বললে, 'আমরা কোনো প্রকারের খবর না দিয়ে এসে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলি নি তো ?'

আমি বললুম, 'আমি সত্যই ভারী খুশী হয়েছি যে আপনারা আমাকে আপন জন ভেবে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা এখানে চলে এসেছেন বলে।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পৌঁচেছেন। তার সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁকেও সেই কথা বললুম এবং যোগ করলুম, 'আপনারা জানেন না, এদেশে আমার খুব বেশি আপন জন নেই।'

শহর-ইয়ারের চোখ দুটি বোধহয় সামান্য একটু ছলছল করছিল। বললে, 'আমাদেরও বেশির ভাগ আপনজন পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। আমার দাদারা, দিদিরা সবাই। সেদিক দিয়ে আমার কর্তা লাকি।'

আমি কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার প্রায় হাতজোড় করে বললেন, 'আমার একটা গরীবানা আরজ্ আছে।'

আমি বললুম, 'কী উৎপাত। আমাকে চিনতে আপনার ক'শতাব্দী লাগবে ?'

'তা হলে বলি ; আপনার চেলা ঘণ্টুবাবু এসেছিলেন আপনার চলে যাওয়ার খবর দিতে। উনি সত্যি আপনার আপন জন। তাঁকে ইনি নানা রকমের প্রশ্ন শুধোন--এ জায়গা সম্বন্ধে। ঘণ্টুবাবু বললেন, আপনি নাকি বাজার-হাট থেকে অনেক দূরে থাকেন। এবং চাকর-বাকর কামাই দিলে নাকি শুধু টিন-ফুড খেয়ে চালিয়ে দেন। তাই আমরা এঁটা-সেটা কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি। যদি—'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য ! নদীতে চানে যাবার সময় কলসী ভরে জল নিয়ে যাওয়া আহাম্মুখী, কিন্তু আমার এই সাহারা-নিবাসে জল না নিয়ে আসা ততোধিক আহাম্মুখী। আপনি সমূচা হগ-বাজার কিনে এনে থাকলেও অস্তুত আমার কোনো আপত্তি নেই। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দি ; হাত মুখ ধোবেন।'

আমার লোকটি খুব মন্দ রাঁধে না। সে-বিষয়ে আমার অত্যধিক
হুঁচকুতা ছিল না।

বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি 'শহর-ইয়ার' তালগাছ
সারির গা ঘেষে ঘেষে একা একা চলেছেন রেল লাইনের দিকে।
আমি বসার ঘরে ঢুকলুম ডাক্তারের খবর নিতে। তিনি দেখি
আমার 'জার্মান এনসাইক্লোপীডিয়া' খুলে একটার পর একটা ছবি দেখে
যাচ্ছেন—আরামসে বড় কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে। আমি যেতেই
বললেন, 'শহর-ইয়ার বেড়াতে বোরিয়েছে; ও একা থাকতে
ভালোবাসে আবার, মজার কথা, খানিকক্ষণ পরে সর্ঙ্গী না হলেও
চলে না। এই দেখুন না, একশ কুড়ি মাইল ঠেঙিয়ে এল এখানে
আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আর আপনার সঙ্গে ছুটি কথা না বলে
ছুট করে বেড়াতে চলে গেল একা একা।'

'তা আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?'

'ওর মুড়ু আমি জানি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে
বেধে নিয়ে যেতো—আমি শত আপত্তি জানালেও। বেডাক না
একটু আপন মনে। আপনার বাড়ির বড় সুবিধে—সাঁড় দিয়ে
নামা মাত্রই বেড়ার মাঠ আরম্ভ হয়ে গেল! কলকাতার হাল তো
জানেন।' তারপর একটু খেমে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার
কাছে অনুরোধ, আপনার ডেল রুটিন আমাদের আসাতে যেন
আপসেট না হয়।'

আমি হেসে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে থাকুন, ডাক্তার, আমার
রুটিন বলে কিছু নেই। আমি শুধু বলি, এন্জয় ইয়োরসেলভস।
আজ্ঞা, এখন চলুন না, আমরা ম্যাডামকে খোয়াইডাঙার মাঝখানে
গিয়ে আবিষ্কার করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এখানে এই
বিন্নাট খোলামেলার মাঝখানে যে কি রকম টপ করে অঙ্ককারটি ড্রপ
করেন সেটা শহরেরা অনুমানও করতে পারে না।'

বাড়ি থেকে বোরিয়ে বললুম, 'ঐ ওখানে যে গোটা ছই

ভিতের মত ঢিপি দেখতে পাচ্ছেন ঐটেই এ অঞ্চলের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। সেখানে উঠলেই ঠাহর হয়ে যাবে বীবী কোথায় কবিত্ব করছেন।’

ডাক্তারটি স্বল্পভাষী। আমি শুধালুম, ‘আপনি ডাক্তারির কি নিয়ে কাজ করছেন?’

বললেন, ‘এখনো ঠিক হদীস পাচ্ছিনে। ভাবছিলুম, যমজ, বামন এদের স্কেলিটেন নিয়ে।’

আমি বললুম, ‘ডক্টর ইয়াংকার যা নিয়ে—’

তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শুধোলেন, ‘আপনি জানলেন কি করে?’

আমি বললুম, ‘আপনারা দু’জনাই বড় সরল আর কর্তাভজা।’ ‘কর্তাভজা’ ইচ্ছে করেই বললুম। ‘কর্তার গুণ আছে কি না চিন্তা পৰ্বন্ত করেন না। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি ডাক্তারির কিছুই জানিনে; অতএব ইয়াংকারকে চেনা আমার পক্ষে আকস্মিক যোগাযোগ বই আর কিছু না। বন্ শহরে আমি যখন পড়তুম তখন তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার সংস্কৃতির অধ্যাপকের বন্ধু ছিলেন। মোটামুটি ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৩৩/৩৪-এ তিনি পুরো মাহুশের এক্সরে নেবার কল আপন হাতে বানান। ও-সব কথা আরেক দিন হবে। এই তো পৌঁছে গেছি আমাদের এভারেস্টে, আর ঐ—ঐ যে—ছুটো তাল গাছের মাঝখানে বসে আছেন বেগম সাহেবা।’

অতদূরে আমাদের সাধারণ কথাবার্তার কণ্ঠস্বর পৌঁছনোর কথা নয়। কিন্তু এই নির্জনতার গভীরতম নৈস্তব্ধ্যে বোধহয় ধ্বনি ও টেলিপ্যাথির মাঝখানে এক তৃতীয় ট্রান্সমিটারহীন বেতারবার্তা বহন করে। শহর-ইয়ার হঠাৎ অকারণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ‘আলসেশিয়ান ‘মাস্টার’ তাঁর দিকে ছুট লাগালো।

মাঝপথে দেখা হতেই আমি বললুম, 'আত্মচিন্তার জন্ত এ ভূমি প্রশস্ততম।'

'বামু বললেন, 'না, আমি "শব্দনের" কথা ভাবছিলুম।'

আমি বললুম, 'দেখুন, ম্যাডাম, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্তে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তাই করবো। ঐ ভাল গাছটা যদি চড়তে বলেন তারও চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি কিন্তু একটি জিনিস করতে আমার সাতিশয় বিতৃষ্ণা। আপনারা হুঁজুনাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট; তাই যদি আমি করজোড়ে একটি মেহেরবানী—'

শহর-ইয়ার যদি বটতলার চার আনা দরের সাক্ষীর পেশা কবুল করতেন, তবে তিনি ও-লাইনের সুলতানা রিজিয়া হতেন নিশ্চয়ই। উকীল আধখানা প্রশ্ন শুধোতে না শুধোতেই বটতলার ঘড়েল সাক্ষী আমেজ করে ফেলে, উকীলের নল কোন দিকে নিশানা করেছে। আমাকে বাধা দিয়ে শহর-ইয়ার বললেন, 'আর বলতে হবে না। ট্রেনে বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন আপনি নিজের রচনা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না, এখানে সেটা ভদ্রভাবে বলতে যাচ্ছিলেন—এই তো? আচ্ছা, আমি মেনে নিচ্ছি, যদিও অতিশয় অনিচ্ছায়। শুধু একটা শেষ প্রশ্ন শোধাবো; আপত্তি আছে?'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললুম, 'চালান গাড়ি! ফাঁসীর খানা খেয়ে নিন।'

'শব্দনের সঙ্গে সেই শেষ বিরহের পর আপনাদের আবার কখনো দেখা হয়েছিল?'

আমি বললুম, 'এ প্রশ্ন একাধিক পাঠক-পাঠিকা আমাকে বাচনিক, পত্র মারফৎ শুধিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন হিন্দু মহিলা; পাবনার মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। অশ্বদের আমি এ প্রশ্নের, উত্তর দি না। ঐর বেলা ব্যত্যয় করলুম। লিখলুম, "মহাশয়া, আপুঁও, যখন পাবনা সেকেশুয়ারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস তবে নিশ্চয়ই অ'

স্কুল রাজশাহী ডিভিডনে পড়ে। আমার স্ত্রী সেখানকার স্কুল-ইনস্পেকট্রেস। তিনি যখন আবার আপনার স্কুল দেখতে আসবেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে পাকা উত্তর পাবেন।” আপনাকে ঠিক তা বলছি। তবে তারই কাছাকাছি। আমার গৃহিণী বছরে একাধিকবার পুত্রদ্বয়সহ এখানে আসেন। পথিমধ্যে কলকাতায় কয়েকঘণ্টা জিরোতে হয়। এবার না হয় আপনাদের ওখানেই উঠতে বলবো।’

শহর-ইয়ারকে সেই ট্রেনে দেখেছিলুম উল্লাসে লম্ব দিতে, আর দেখলুম এই। সেবারে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের, এবারে অবিমিশ্রিত উল্লাসের। শুধোলেন, ‘কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো তো?’

আমি বললুম, ‘কী আশ্চর্য! সেটা আপনাদের ছু’জনকার একান্ত নিজস্ব, অল রাইট্‌স্‌ রিজার্ভড কারবার। সেখানে আমিই বা কে, আর ডাক্তার জুল্ফিকারই বা কে? কি বলেন ডক?’

ডাক্তার বললেন, ‘আমার বীবী কি আলোচনা করবেন আর কি করবেন না তার উপর আমাকে আমাদের ইমাম আবু হানিফা সাহেব কোনো হুক দিয়ে থাকলেও—খুব সম্ভব তিনি দেন নি—আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি হুক চাইনে—আমি চাই শাস্তি।’

আমি বললুম, ‘আমেন, আমেন! হায়, এই না-হকের উপর গড়া ছনিয়ার সিকি পরিমাণ স্বামী-সমাজ যদি আমাদের ডাক্তারের এই মহামূল্যবান তত্ত্বকথাটি মেনে নিত তবে বাদবাকী তাঁদের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডিভোর্স প্রতিষ্ঠানটির উচ্ছেদ সমাপন করতো।’

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।

বহু. শহর-ইয়ারকে বললুম, ‘একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে আঁমিয়েছিলুম। আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভালো ভালো রেকর্ড ‘মাস্টার’ হার বেশির ভাগ ‘না কাম, না অর্থ’ নাইদার কর লাভ নয় কর

মানি আজ আর পাওয়া যায় না। যখন খুশী বাজাবেন। রাত তিনটেয় বাজালেও আমার আহা-র-শয্যাসন-ভোজন কোনো-কিছুরই ব্যাঘাত হয় না।’

শহর-ইয়ার বললে, ‘আমি এখু-খুনি দেখবো।’ ছুটি করে চলে গেল।

আমি বললুম, ‘ডাক্তার, আপনার বাঙলাতে বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ থাকে। এটা কি আপনাদের পরিবারেরই বৈশিষ্ট্য, না আপনাদের গোষ্ঠীর, কিংবা আপনারা যে মহল্লায় বাস করেন?’

ডাক্তার বললেন, ‘বিশ্বাস করুন, আমি একটি আস্ত অশিক্ষিত প্রাণী।’ চিকিৎসাশাস্ত্র—আমি বলি স্বাস্থ্যশাস্ত্র, তার মানে হাইজীন নয়—আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছে যে আমি যেটুকু সামান্য সাহিত্য, ইতিহাস এমন কি গণিত ইস্কুল-কলেজে পড়েছি সে সব ভুলে গিয়েছি। শহর-ইয়ারের সঙ্গে একই জিনিস উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি তার সব শখের বিষয়ে দিল্-চম্পী নিতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। সে এক ট্রাজেডি—সে কথা পরে হবে। তা সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, আপনি যে প্রশ্ন শুধিয়েছেন সেটার উত্তর দিতে হলে যে সব বিষয় জানার দরকার তার একটাও আমি জানিনে। তবে যেটুকু শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, জব চার্ণকের আমলের তো কথাই নেই, এমন কি ক্লাইভের সময় এবং তার পরও কোনো ভদ্র মুসলমান এবং হিন্দুও নবাবের মুর্শিদাবাদ, খানদানী-ঢাকা ছেড়ে এই ‘ভুঁইফোড় আপস্টার্ট কলকাতায় আসতে চায় নি। আমার পিতৃপুরুষ আসেন রাজা রামমোহন রায়ের আমলে, বাধ্য হয়ে, কোনো রাজনৈতিক কারণে। তাঁরা আপোসে কি ভাষা বলতেন, জানিনে, তবে আমার ঠাকুরদার আমল পর্বস্তু তাঁরা ফার্সী ভিন্ন অণ্ড কোনো ভাষাতে লেখেন নি। আমার পিতা ‘ছতোমের’ ভাষা বলতে পারতেন, কলকাতার উছু ডায়লেকট এবং উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ দরবারী উছুও, শহর-ইয়ার-২

কিন্তু আমার মা ছিলেন খাস শাস্তিপুত্রের মেয়ে। তিনি উচ্চ জানতেন না এবং সেটা শেখবার চেষ্টাও করেন নি। আমাকেও কেউ উচ্চ শেখাবার চেষ্টা করে নি। ফলে আমি যে কোন্ বাঙলা বলি সে আমিও জানিনে। খুব সম্ভব ডাইলিয়ুটেড হতোম। আমার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা আমার ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু তাদেরই একজন—খানদানী কলকাত্তাই সোনার বেনে—আমাকে বলেছিল, তার ঠাকুরমা আমারই মত বাঙলা বলেন।’

আমি বললুম, ‘আশ্চর্য! বাঙলা ভাষা কী তাড়াতাড়ি তার ভোল বদলেছে! ভারতচন্দ্র এমন কি ‘আলাল’ হতোম ছ’জনাই আপনার চেয়ে বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বেনামী লেখাতে ‘বিচ্ছেসাগর মশাই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন হতোমের চেয়ে কম। কিন্তু তিনিও যা করেছেন সেটা নগণ্য নয়। আজ যদি ‘প্যারীচাঁদ, ‘কালীপ্রসন্ন, ‘বিচ্ছেসাগর কলকাতায় নেমে আড্ডা জমান তবে তাই শুনে বোধ হয় আপনার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা ভিরমি যাবেন। কাজেই আমার পরামর্শ যদি নেন তবে বলবো, আপনার ভাষা বদলাবেন না। কেউ যদি মুখ টিপে হাসে, হাসুক। আমার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও অত্যন্ত সংস্কৃতঘন বাঙলা বলেন—যেমন ‘হপ্তা ছ’ত্বিন’ না বলে বলেন ‘পক্ষাধিককাল’ এবং তাই শুনে হিন্দু মুসলমান উভয়ই কৌতূহল অনুভব করে। তাতে কি যায় আসে?’

এমন সময় শহর-ইয়ার চিন্তাকুল ভাল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত শুধোলেন, ‘আপনার রেকর্ড-সঞ্চয়ন অদ্ভুত। আপনি বাছাই করেছিলেন কি ভাবে?’

আমি হেসে বললুম, ‘কোনো ভাবেই না। আমি বরদায় ছিলাম ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪। এই সময়টার মধ্যে যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে তাই কিনেছি—কোনো প্রকারের বাছবিচার না করে তার বছ বৎসর পর মোহরদি ছ’চারখান’ রেকর্ড আমাকে দেয়—

বাস্ । ৪৪-এর পর, আজ পৰ্বস্তু, কোথাও ভালো করে আসন পেতে বসতে পারি নি । ফলে কলেকশনটা বাড়াতে পারি নি । সে নিয়ে আমার কোনো মনস্তাপ নেই ।

‘ “সাধের জিনিস ঘরে এনেই
এনে দেখি লাভ কিছু নেই ।
খোঁজার পরে চলে আবার খোঁজা ।”

চলুন মাদাম, চলুন মসিয়ো ল্য দকৃত্যোর,

‘ দুইটি বস্তু প্রতি মানবের টানিতেছে বরাবর ।
{ দানাপানি টানে একদিক থেকে অগ্ন্যদিকেতে গোর ॥

দো টীজ্ আদম্‌রা কশদ্ জোর্ জোর্

য়কী আব্ ও দানা দিগর থাক্-ই-গোর

ঐ তো এ-বাড়ির দানা-পানির প্রতীক দিলবর জান্ সশরীরে উপস্থিত । আমি তার রান্নার প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করবো না । আপনি শহূ-ইয়ার বাহু যখন এখানে রয়েছেন তখন আহারাদির জিম্মেদারী আপনার ।’

শহূ-ইয়ার শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, ‘আপনার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা ট্যাব্ ; তার উল্লেখ না করে বলছি, আপনি খেতে ভালোবাসেন সে-কথা আমি জানি, কিন্তু—’

আমি যেন আসমান থেকে পড়ে তাঁর বক্তব্যে বাধা দিয়ে বললুম, ‘আপনিও পঁচি-টেপির মত এই ভুলটা করলেন ? লেখার সঙ্গে জীবনের কতখানি সম্পর্ক ? রবিঠাকুর নিদেন হাজারটি প্রেমের কবিতা লিখেছেন । অতএব, তিনি সমস্তক্ষণ প্রেমে পড়ার জগ্গ্ হোক হোক করতেন ? সেই সুদূর ইয়োরোপে বসে মাইকেল কপোতাক্ষীর স্মরণে কি যেন লিখেছেন—‘সতত পড় হে নদী আমার স্মরণে’ ; ফিরে এসে সামান্যতম চেষ্টা দিয়েছিলেন এক ঘণ্টার তরেও ঐ নদীর পারে বাবার ! এ তো আমি চিন্তা না করেই বলছি । খুঁজলে এমন সব উদাহরণ পাবেন যে আপনার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে ।

একাধিক কবি লিখেছেন, আ মরি আ মরি গোছ প্লাতোনিক, দেহাতীত
শিশির-বিন্দুর ঝায় পুতপবিত্রে স্বর্গীয় প্রেমের কবিতা—ওদিকে,
তাদেরই একজন, হাইনে, বেরুতেন নিশাভাগে প্যারিসের কুখ্যাত—
নেভার মাইণ্ড, আপনি ডাক্তারের স্ত্রী, সহজে শকুট হবেন না—’

‘এবং আমাদের বিয়ে হয়েছে দশটি বছর আগে,’ বললেন শহর-
ইয়ার।

তিন

‘একি ! আপনি এখানে !’

বাড়িটার একাধিক বারান্দা, তার একাধিক প্রান্তে একান্তে অন্তরালে বসে থাকা যায়। তারই একটাতে বসে আমি পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়েছিলুম। আজ কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী বা সপ্তমী, রাত প্রায় এগারোটা, একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তারই আভাস লেগেছে তালের সারিতে। ঘরের ভিতরে শহর-ইয়ার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছিল। তার বাজানোর পদ্ধতিটা সভ্যই বিদগ্ধ। একটা গান বাজানোর পর অন্তত মিনিট দশেক পর আরেকটা বাজায়। অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো সাড়া শব্দ শুনতে পাই নি বলে ভেবেছিলুম সে বৃষ্টি শুতে গেছে। ডাক্তার আমার ঘরে পেয়ে গেছেন ‘ল্যার্নবের্ক মোকদ্দমার একখানা বই—যেটাতে যুদ্ধের সময় নাৎসি ডাক্তারদের অদ্ভুত অদ্ভুত একস্পেরিমেন্টের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তিনি সেই বই নিয়ে রাতের মত উধাও।

শহর-ইয়ার বারান্দার নিভৃত প্রান্তে আমাকে আবিষ্কার করলেন।

আমি বললুম, ‘ঠিক সময়ে এসেছেন। একটু পরেই চাঁদ উঠবে আর এই জায়গাটা থেকেই সে দৃশ্যটি সব চেয়ে ভালো দেখা যায়। ডাক্তারের ঘরে তো এখনো আলো জ্বলছে; ওকে ডেকে আনুন না।’

শহর-ইয়ার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ‘শুনুন, আপনার সঙ্গে সোজাসুজি পরিষ্কার কথা হয়ে যাওয়াই ভালো। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কি আমার সঙ্গে পেলে আপনার অস্বস্তি বোধ হয়?’

ঠিক ধরেননি আমার বোঝা উচিত ছিল শহর-ইয়ারের বুদ্ধি এবং স্পর্শকাতরতা দুইই তীক্ষ্ণ। কিন্তু আমি এর উত্তর দেব কি ?

আমি বললুম, 'না। কিন্তু তিনি যদি সেটা পছন্দ না করেন তবে আমি দুঃখিত হব।'

শহর-ইয়ার বললেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনি তো জ্ঞানী লোক; আপনি তো বুঝবেন যে, তাঁর কোনো আপত্তি থাকলে তিনি আমাকে আপনার এখানে নিয়ে আসবেন কেন?'

আমি বললুম, 'আমাদের এই বাঙলাদেশে মুসলমান মেয়েরা সবে মাত্র অন্দর মহল থেকে বেরিয়েছেন। ঐরা পরপুরুষের সঙ্গে কিভাবে মেলা-মেশা করবেন, কতখানি কাছে আসতে পারবেন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, থাকার কথাও নয়। ইয়োরোপে এ বাবদে মোটামুটি একটা কোড তৈরী হয়ে গিয়েছে, কয়েক পুরুষের মেলা-মেশা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। এই দেখুন না, কটিনেণ্টের একটা মজার কোড। নাচের মজলিসে কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হলো, কিন্তু পরিচয়টা তাঁর স্বামী করিয়ে দেন নি। এস্থলে আমি যদি মহিলাটির সহিত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি তবে লোকে আমাকে আর যা বলে বলুক 'ছোট লোক' বলবে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, এবং তারো বাড়ী, যদি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দাইয়ে—এবং তারপর যদি স্বামীর অজানতে আমি মহিলার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করি তবে সমাজ আমাকে বলবে, 'ছোট লোক', 'নেমকহারাম'। ভাবখানা এই, ভজ্রলোক তেগামাকে বিশ্বাস করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আর তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে! আবার—'

আমার 'লেকচার' আর শেষ হল না। ইতিমধ্যে শুনি শহর-ইয়ার খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করেছেন। হাসি আর কিছুতেই ধামে না। ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার এই পর্ববেক্ষণে এতখানি হাসবার কি থাকতে পারে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হাসি পুরো ধামার পূর্বেই শহর-ইয়ার বলতে লাগলেন, এবং বলার মাঝে মাঝেও চাপা হাসি কলকলিয়ে উঠলো—‘আপনি কি বেবাক ভুলে গেলেন, ট্রেনে আমি নিজে, স্বেচ্ছায়, গায়ে পড়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে উইদাউট এনি প্রোভোকেশন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলুম?’

আমি বললুম, ‘কী আশ্চর্য! আমি এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলুম। আমি কি আর আপনি আমি ডাক্তারের কথা ভাবছিলুম?’

শহর-ইয়ার তবু হাসতে হাসতে বললেন, ‘বুঝেছি বুঝেছি, খুব ভালো করেই বুঝেছি। ইয়োরোপের উদাহরণ যে এদেশে খাটে না সে আমি ভালো করেই জানি। ইয়োরোপের কেন, বাঙালী হিন্দুর উদাহরণও আমাদের বেলা সর্বক্ষেত্রে খাটে না, সেও তো জানা কথা। জানেন, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।’

যে সাহিত্য মানুষ পড়ে সেটা যে তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এ তো জানা কথা। ‘বাঙলা সাহিত্য গড়ে তুলেছে হিন্দুরা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ। সৈয়দ আলাওল বা নজরুল ইসলাম তো এমন কোনো জোরালো ভিন্ন আদর্শ দিয়ে যান নি যার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হিন্দুর গড়া বাঙলা সাহিত্যে বিবাহিতা নারীর আদর্শ কি, সে তো সবাই জানে। সে ‘সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী এবং সর্বোপরি সে পতিব্রতা। ওদিকে দেখুন আপনার স্ত্রী আপনার সহধর্মিণী নাও হতে পারেন, তিনি যদি খুঁটান হন। এবং এই ‘পতিব্রতা’ আদর্শটা আমাদের মুসলমানদের ভিতর তো ঠিক সে রকম নয়। কোনো সন্দেহ নেই, স্ত্রী সেবা করবে, ভালো বাসবে তার স্বামীকে, তার সুখছুঃখের ভাগী হবে, তার আদেশ মেনে চলবে—কিন্তু, এখানে একটা বিরাট কিন্তু আসে—স্ত্রী তার সর্বসত্তা সর্বব্যক্তিষ্ট সর্বঅস্তিষ্ট স্বামীতে লীন করে দিয়ে ‘পতিব্রতা’ হবে এ কনসেপশন তো আমাদের ভিতর নেই। খুব একটা বাইরের মামুলী

উদাহরণ নিন। আমার আব্বাজানের নাম মুহম্মদআল্লা বখ্শ্ খান—
 তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান হন আর নাই হন, তাঁরা সাতপুরুষ 'খান'
 উপাধি ব্যবহার করেছেন। আমার আন্মা আবার চৌধুরী বাড়ির
 মেয়ে—তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত নাম সই করেছেন মিহরুল্লিসা
 চৌধুরী। তিনি মাত্র কয়েক বছর হলো ওপারে গেছেন। শেষের দিকে
 সবাই যখন হাল ফ্যাশানমাক্কিক তাঁকে বেগম খান, 'মিসেস খান বলে
 সম্বোধন করছে তিনি তখনো সই করছেন, মিহরুল্লিসা চৌধুরী।'

আমি শুধালুম, 'সমস্যাটা ঠিক কোন্‌খানে আমি বুঝতে পারছিনে।
 অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান মেয়ের বিশেষ সমস্যাটা কোন্‌খানে?'

শহর-ইয়ার বড় মধুরে হাসল। বললে, 'আমার মগজটা বডুই
 ঘোলাটে আর হৃদয়—সেটা যেন কেটে কেটে বেরুতে চায়, তাই না
 আপনাদের বাঙাল মেয়ে বলেছে,

• 'ইচ্ছা করে কলিজাডারে

গামহা দিয়া বান্ধি—

শুনুন। হিন্দু মেয়েরা 'অন্দর থেকে বেরিয়েছেন কবে? বছর
 'তিরিশের বেশী হবে না। অথচ স্বরাজ লাভের ফলে এবং 'অর্থনৈতিক
 অবনতি বশতঃ কিংবা আকাশে বাতাসে এক অভিনব সর্বব্যাপী
 স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্ট হওয়ার দরুন এই দশ পানরো বৎসরেই
 মুসলমান মেয়েরা দ্রুত হিন্দুদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। গত ত্রিশ
 বৎসর ধরে হিন্দু মেয়েরা এই যে তাদের আংশিক স্বাধীনতা ক্রমে
 ক্রমে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানা-অজানায় চেষ্টা করছে
 সে স্বাধীনতা ঠিক কি ভাবে কাজে লাগাবে, তার কোড্‌স্ কি, তার
 নরম্ কি। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত নিন। কন্টিনেন্টে কোনো মেয়ে
 যদি বিয়ের উদ্দেশ্য কিংবা অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই হোক তার
 পরিচিতের সংখ্যা বাড়তে চায় তবে সে তার বান্ধবী—নিদেন
 'ল্যাগুলেভির সঙ্গে নাচের হলে যায়। পুরুষরা এসে বাও করে
 'নাচবার জন্ত নিমন্ত্রণ জানায়—তার জন্ত কোনো কর্মাল ইনট্রোডাকশন

দরকার নেই—এবং এই করে করে মেয়েরা যত খুশী তাদের পরিচিতির সংখ্যা বাড়াতে পারে। এদেশে এখনো সমস্তটা চান্স। বান্ধবীর মাধ্যমে, আপিসের সহকর্মীদের মাধ্যমে যে আলাপ-পরিচয় হয় সেটাকে 'উটকো' মেথড—অর্থাৎ চান্স বলা যেতে পারে।

আমার বক্তব্য, হিন্দু মেয়েরা যে উদ্দেশ্যে চলেছে সেটা মুসলমানদের ঠিক স্মুট করবে না।

একটা কথা তো ঠিক, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা সাড়ে পনরো আনা মেয়ে বিয়ে করে মা হতে চায়। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে, আপনি স্বাধীন স্বেচ্ছায় হিন্দু মেয়ে বর বাছাই করে নিয়ে হবে—কি হবে?—পতিব্রতা।

মুসলমান মেয়েও ঠিক ঐ একই পন্থায় আপন স্বামী বেছে নেবে কিন্তু সে হিন্দু মেয়ের মত পতিব্রতা হওয়ার আদর্শ বরণ করে নিতে পারবে না। দোহাই আল্লাহ, তার অর্থ এই নয় যে সে অসতী হবে—তওবা, তওবা!—তার অর্থ, আবার বলছি, সে তার সর্বসত্তা স্বামীতে বিলীন করে দিতে পারবে না।

আপনি ভাববেন না, আমি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে-কথা বলছি—আমি শুধু পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

আমি বললুম, 'পতিব্রতা কতিব্রতার আদর্শ আজকাল হিন্দু রমণীরা কি আর খুব বেশী বিশ্বাস করে? আর 'আজকালই' বলছি কেন? ইংরেজী সভ্যতা-কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে তারা সতীদাহ বন্ধ করলো, বিধবা-বিবাহ আইন পাস করালো, তারপর সিভিল মেরিজ যার ভিতর তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে, হালে হিন্দুশাস্ত্রমত বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের ভিতরও তালাকের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।'

শহর-ইয়ার বাস্তু দেখলুম অনেক চিন্তা করে রেখেছেন। বললেন, 'সতীদাহ বন্ধ করাটা হিন্দুকে মেনে নিতে হয়েছে, নইলে সাজা পেতে হয়। কিন্তু যেখানে বাছাই করার স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে

হিন্দু নারী কোন্টা বরণ করেছে ? এ যাবৎ কটা বিধবা বিবাহ হয়েছে—'

আমি বললুম, 'মুসলমান মেয়েদের ভিতরই বা কটা হয় ? কিংবা ধরুন তালাক। এদেশের মুসলমান ভক্তসমাজে কি আরবিস্তানের আধার আধারও তালাক হয় ?'

শহু-ইয়ার বললেন, 'আরবিস্তানে তালাক দেয় পুরুষে— মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার এতই সীমাবদ্ধ যে সে-অধিকার আদপেই নেই বললে চলে। আমি মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলছি— যেমন বিধবা-বিবাহ। প্রশ্ন উঠবে, আরো অধিক সংখ্যক মুসলিম বাল-বিধবা বিয়ে করল না কেন ?

আসলে কি জানেন, পরাধীন অবস্থায় মানুষে মানুষে পার্থক্য কমতে থাকে ; স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয়। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে এদেশের হিন্দু মুসলমান রমণী উভয়ই ছিল স্বাধীনতালুপ্ত হারেমবদ্ধ (বরঞ্চ আফগানিস্তান, ইরান আরবের মেয়েরা বোরকা পরে রাস্তায় বেরোয়, আত্মীয়স্বজনের মোলাকাৎ করে এমন কি বাজার-হাটেও যায়— এদেশে সে ব্যবস্থাও ছিল না)। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দুইই এক। এই যে আপনার ড্রইংরুম—এর ভিতর ডার্বি ঘোড়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াকে ছেড়ে দিলে দুজনাই ছুটবে মোটামুটি একই বেগে। কিন্তু ছেড়ে দিন আপনার বাড়ির সামনের খোলা মাঠে। তখন কোথায় ডার্বি, আর কোথায় ছ্যাকড়া ! যার যার ভিতরকার সুপ্ত বৈশিষ্ট্য তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় চোখের সামনে জাজ্জল্যমান হয়।

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসুক হিন্দু-মুসলমান দুই নারীই ; তখন দেখতে পাবেন তাদের পার্থক্য কোন্ জায়গায়।

আবার বলছি, কসম 'আল্লাহ, আমি আদৌ বলছি না, মুসলমান মেয়ে হিন্দু মেয়ের চেয়ে সুপেরিয়র ; আমি বলছি, সে ডিক্লরেন্ট।'

এমন সময় ছোটো তালগাছের মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ একটা গাছের উপর ঈষৎ হেলান দিয়ে আকাশের পূর্বপ্রান্ত আলোকিত করে দিলেন।

শহর-ইয়ার বললে, 'আহ্! বড় সুন্দর এ জায়গাটা। অতএব এখন থাক নারী সমস্তা!'

চুপ করে তাকিয়ে আছি ল'বাবুর বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটে ছাড়িয়ে, রেল লাইন পেরিয়ে তালসারির দিকে। বার বার এ দৃশ্য দেখেও আমি তৃপ্ত হইনে, কিন্তু এও সত্য শহর-ইয়ারের আনন্দ তার এখানে আমা অবধি প্রত্যেক আনন্দ ছাড়িয়ে যায়। চুপ করে আছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তার সর্বান্ত থেকে যেন সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ঘোরঘুড়ি অন্ধকার দূর করতে করতে চাঁদ আর কিছুক্ষণ পরেই তার জ্যোতিঃশক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছবেন— এরপর রাতভর যে-আলো সেই আলোই থাকবে। আমি শহর-ইয়ারকে বললাম, 'পূর্ণিমা চাঁদের যেন বড় দেমাক, অন্তত এর তুলনায়। আচ্ছা, একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে হয় না?'

বললে, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু কি জানেন, উনি নিজেই বলেন, এসব দৃশ্যের সৌন্দর্য তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সেটা তার হৃদয় স্পর্শ করে না। ওদিকে অসম্ভব ভদ্রলোক বলে আমরা যতক্ষণ চাই তিনি আমাদের সঙ্গে দেবেন—এবং বিশ্বাস করবেন না, সানন্দে। এবং তাতে কণামাত্র ভগ্নামি নেই। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। দরকার হলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব নিয়ে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কারণ সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি কঠোর কঠিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছেন। জানেন, একবার একটি অজানা অচেনা তুরূণ গাওয়াইয়াকে এক জলসায় গোটাকয়েক দস্তী অথবা আক্রমণ করে—ঘরানা ঘরানায়

আড়াআড়ি তো এদেশে একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কেন জানিনে উনি গেলেন ক্ষেপে—অবশ্য বাইরে তার কণামাত্র প্রকাশ তিনি হতে দেন নি, কখনো দেন না, একমাত্র আমিই শুধু বুঝতে পেরেছিলুম—এবং তারপর সে কি তর্কযুদ্ধ! শুধু যে সেই তরুণের জ্বালা প্রাপ্য সম্মান সপ্রমাণ করে দিলেন তাই নয়, তার বিরুদ্ধপক্ষের মহারথীদের সঙ্গীতশাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পাঁচজনের মনে গভীর সন্দেহ জাগিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অথচ তিনি আমাকে বলবার বলেছেন, সঙ্গীত তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না! কী জানি, হয়তো ডাক্তারি শেখার পূর্বে রস গ্রহণ করার রুটিং পেপারখানা করকরে শুকনোই ছিল; এখন সেটা চিকিৎসা-জ্ঞানে জবজব।’

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, ‘কি জানি! আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটাও বোধ হয় ঐ ধরনের! তবে কিনা, বিয়ের দশ বছর পরে, এই ত্রিশ বছর বয়সে এটা নিয়ে চিন্তা করা বেকার!’

হঠাৎ উঠে বললেন, ‘এবারে শুতে যাই। যে ঘরখানা আমায় দিয়েছেন তার জানলা দিয়ে মেটার্নেল আনকল মিঃ মূনের সঙ্গে মনে মনে রসালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু তার পূর্বে একখানা শেষ রেকর্ড বাজাবো। বলুন, কি বাজাবো?’

আমি চিন্তা না করেই বললুম, ‘“কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুমুম চয়নে।”’

চার

শরের দিন ওরা চলে যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যে শুধু ফলকাতা আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল তাই নয়, শহর-ইয়ার পাকা হুকুম মোক্তারের মত ক্রস এগজামিনেশন করে করে একেবারে তারিখ এমন কি কোন্ ট্রেন ধরতে হবে সেটা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়ে গেল। একাধিকবার বললো, 'এখানে তো দেখে গেলাম, আপনি কিভাবে থাকেন, আমাদের ওখানে সেভাবেই ব্যবস্থা করবো। আপনার খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

'তিন দিন পরেই চিঠি :

১২ গোলাম সিদ্দিক রোড,
কলকাতা

'সালাম পর আরজ এই,

আপনার ওখানে কিভাবে আমার সময়টা কাটল সেটা আপনি নিজেই দেখেছেন।

আমরা আলোচনা করছিলাম, মুসলমান মেয়েদের নিয়ে, যারা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসছে ; বলুন তো, আপনার ওখানে গিয়ে আমি যে-আনন্দ ও বৈভব—গনীমৎ শব্দটা আরও ভালো—পেলুম, কটা মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে সেটা জোটে? আমরা যে কী গরীব সে তো আপনি জানেন না, কারণ আপনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন আপনার হিন্দু আত্মজনের সঙ্গে।

স্বাধীনতা বড় সম্পদ। আমরা, মুসলমান মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হচ্ছি কিন্তু সে-স্বাধীনতার ফল আশ্বাদন করার সুযোগ পাচ্ছি কই? মনে হয়, আমি যেন একাকিনী কোনো নির্জন দীপে বাস করছি; প্যাঁটারায় লক্ষ টাকা কিন্তু কিনবো কি? লোকালয়ে এই লক্ষ টাকা দিয়ে যে কত কিছু করা যায় সেটা না জানা থাকলে

ব্যক্তি অতথানি নির্ভর মনে হতো না। এই লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিয়েও আমি আনন্দ পেতুম। কিন্তু দেব কাকে ?

আপনার ডাক্তার লেবরেটরিতে গেছেন সকাল সাতটায় ; তাঁকে ফের পাবো রাত আটটায়—কপাল যদি মন্দ না হয় !

আপনি আমার বহুৎ বহুৎ আদাব তসলিমাৎ জানবেন।

‘খাকসার’

শহর-ইয়ার ”

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা পড়লুম। এই প্রথম নয়, আগেও ভেবেছি, ‘এ-মেয়ের অভাব কোন্‌খানটায় ? স্বামী আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে সে তার যথেষ্ট সঙ্গ পায় না—এইটেই দুঃখ ? উহ, তা নয়। এ মেয়ে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষিতা নয় ; এ মেয়ে বিদগ্ধা এবং এর কল্পনাশক্তি আছে। দিন-যামিনীর অষ্ট প্রহরের প্রত্যেকটি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে তার থেকে কি করে আনন্দ-রস বের করতে হয় সে সেটা খুব ভালো করেই জানে। তাকে তাস মেলে ‘পেশেনস্’ খেলে দিন কাটাতে হবে না। এ মেয়ে গোপাল ভাঁড়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। গোপাল চেউ গুণে পয়সা কামিয়েছিল। এ মেয়ে চেউ গুণে আনন্দের ভাণ্ডার ভরে তুলবে। এবং বাড়ি ফিরে তাই দিয়ে হরিমুট লাগাবে।

আচমকা খেয়াল গেল, কই, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা তো কিছু লিখলো না ? যাক্‌গে—তার জন্ম এখনো সময় আছে।

কোন্‌ এক পোড়ার বিশ্ববিদ্যালয় ‘তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব’ প্রবর্তন করতে চায়। আমাকে অনুরোধ করেছে প্ল্যানটা করে দিতে। সাধারণ অবস্থায় এসব বুনো হাঁস খেদাতে আমি তো রাজীই হই না, উন্টে কয়েকটি সরল প্রাজ্ঞল বাক্যে এমন সব আপত্তি উত্থাপন করি যে তারা প্ল্যানটার আঁতুড়ে ঘরে তার গলায় ছুন ঠেসে দেয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-পথ বন্ধ। পোশাকি সরকারী চিঠির এক কোণে আমার বন্ধু—সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলর—স্কুদে স্কুদে হরক্

করাসীতে লিখেছেন, বাপের সুপুত্রুরের মত প্ল্যানটি পাঠিয়ে, নইলে এ-শহরের যে-সব পাণ্ডনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে তাদের প্রত্যেককে তোমার বর্তমান ঠিকানাটি জানিয়ে দেব—উইদ মাই বেস্ট কম্প্লিমেন্টস্ !'

প্ল্যানটা তৈরী করা তো সোজা—কিন্তু সেমেন্ট কই লোহা কোথায়? অর্থাৎ এই পবিত্র আর্ধভূমিতে যাবনিক ধর্মগুলোর মেটিরিয়াল পাই কোথায়?

তারই জোগাড়-যন্ত্রের ছুর্ভাবনায় দিনগুলো কোন্ পথে যে চলে গেল খেয়ালই করি নি। অবশেষে একদা রাত্রে দ্বিপ্রহরে ত্রিশটি শাতার শেষ পাতাটি টাইপ করে যুমুতে গেলুম।

'মাস্টার' বড় ঘেউ ঘেউ করছে,—চতুর্দিকে প্রীতি রাত্রে চুরি হচ্ছে :স খবর বাবুর্চী আমায় দিয়েছিল—কিন্তু এ চোরটা তো একেবারেই রামছাগল। 'ছ'ছোটো আলসেশিয়ান আমার বাড়িতে। এ দেশটাই মোস্ট ইনকমপিটেন্ট, চোরগুলো পর্যন্ত নিষ্কর্মা—দিনের বেলা একটু খবরাখবর নিলেই তো বুঝতে পারতো ভদ্র চোরের পক্ষেই এ বাড়ি ভাদ্রবধু।

নাঃ! উঠতেই হলো। 'মাস্টার' গুরুকম করছে কেন? বিষাক্ত খাবার দিচ্ছে না কি কেউ?

দরজা খুলে বারান্দার আলো জ্বাললুম।

ছ'বার চোখ কচলালুম। গায়ে চিমটি কাটলে অবশ্য ভালো হতো—স্বপ্নটা তাহলে উপে যেত।

ব্যাকরণে যখন সে ভুল হয়েই গেল তখন স্বীকার করতেই হয় সামনের ডেক-চেয়ারে বসে শহর-ইয়ার ঠোঙা থেকে শিককাবাব বের করে করে মাস্টারকে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে তাঁচ্ছল্যভরে বললেন, 'আপনি আবার উঠলেন কেন?'

আমি বললুম, 'বেশ, শুতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা শুধুই, শ্মশানের কাছে এসে টাঙার পথ যেখানে শেষ হয় সেখান

থেকে আপনি এলেন কি করে? তার পর তো পথ নেই, অন্ধকার—'

'ও। 'রিকশাওলা খানিকটে পথ এসেছিল। আমি বিদেয় করে দিলুম। ব্যাগটা তো ভারী নয়।'

রবীন্দ্রনাথের মত কবি পরিপক্ব বয়সে তাঁর যত অভিজ্ঞতা, অশ্রুর হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি সঞ্চারণ করার যত দক্ষতা, তাঁর সম্মোহিনী ভাষা অলঙ্কার ধ্বনি সর্বস্ব প্রয়োগ করে একটি দীর্ঘ কবিতার মাঝখানে এসে ধমকে দাঁড়িয়ে, যেন হার মেনে বলছেন, দুটি শব্দ—

'বৃথা বাক্য।

যামিনীর তৃতীয় যামে, জীবনেরও তৃতীয় যামে অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুরুবদননিঃসৃত এই আপ্তবাক্যটি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলুম। চূপ করে বসে থাকি ভিন্ন গতি কি?

মাস্টারকে খাওয়ানো শেষ হলে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে, ঘোমটা টেনে আগের চেয়ে আরো বিনয়নম্র সেলাম করলো।

পাশে চেয়ার এনে বসে বললে, 'আজ আর চাঁদ উঠবে না। না?'

আমি বললুম, 'আজ শুক্লা পঞ্চমী। চন্দ্র অনেকক্ষণ হলো 'অস্ত' গেছে। আচ্ছা আমি শুধু আপনাকে একটি প্রশ্ন শুধবো। এ আসাটা কিভাবে হলো?'

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'একটি কেন, আপনি যত খুশী আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন; আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যমত উত্তর দেব। কথা ছিল উনি 'লেবরেটরি থেকে সন্ধ্যা আটটার ফিরে আসবেন। আমরা খেয়ে দেয়ে সাড়ে নটার গাড়ি ধরে এখানে দেড়টায় পৌঁছব। তিনি নিশ্চয়ই কাজে ডুবে গিয়ে সব কথা ভুলে গেছেন, আর এরকম তো মাঝে মাঝে হয়ই। আমি আদর্শেই দোষ দিচ্ছি। যে যে-জিনিস ভালোবাসে তাতে মজে গিয়ে বাস্তবজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি

গর জন্ত শেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করে ছুটি খেয়ে স্টেশনে এসে গাড়ি
'বলুম ।'

'আমি তো কাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা আসতুমই ।'

'এক্জেক্টুলি । যাতে সেটাতে কোনো নড়চড় না হয় তাই
মাসা ।'

এবার পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মনে মনে বললুম, 'বুধা বাক্য ।'

বললুম, 'ছুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন অল্প অল্প খিদে পেয়েছে
নশচয়ই । সামান্য কিছু খাবেন ?'

'আর ক'ঘণ্টা বাকি ? সকালবেলা চা খাবো ।'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কে বললে মুসলমান মেয়ে, বিশেষ
রয়ে আপনি, আপনাদের স্বাধীনতার কল উপভোগ করতে পারছেন
না ? কটা হিন্দু মেয়েরই এ রকম সাহস আছে ?'

খুশী হয়ে বললে, 'এবং ঠিক সেই কারণেই এইখানে বসে
আপনাকে বলেছিলুম, মুসলমান মেয়ে ডিফরেন্ট, কিন্তু কলকাতায়
করে গিয়ে যত চিন্তা করতে লাগলুম, ততই মনে হলো এই যে আমি
র বার ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট বলছি এটা আমারই কাছে খুব পরিষ্কার
না, এবং যেটুকুও পরিষ্কার সেটুকুও বুদ্ধি দিয়ে বুঝি নি, অনুভব করেছি
দয় দিয়ে । বুদ্ধির জিনিস বোঝানো তেমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু
হুভূতির জিনিস অস্ত্রের তিতর সঞ্চারিত করতে পারে শুধু আর্টিস্ট—
।ও বহু সাধনার পর । কিন্তু এ সব কথা পরে হবে । আপনি
মুতে যাবেন না ?'

'আর আপনি ?'

'আমি একটা কাজ সঙ্গে নিয়ে এসেছি । তার কিছুটা এইখানে
সে করবো । ওয়েস্ট জার্মনি থেকে একটা খবরের কাগজ এ-মেশের
রীসমাজের অবস্থা জানতে চেয়েছে । কিন্তু বিপদ হলো গিয়ে যে
খাটেখার অভ্যাস একে তো আমার নেই, তার উপর ইয়োয়োপীর
গজের জন্ত লেখা, ইয়োয়োপ গিরে কটিনেটাল ভিত্তি জোগাড়

করা, আরো কত কী—এক কথায় ইয়োরোপ ইয়োরোপ সর্বক্ষণ ইয়োরোপ এই মনোবৃত্তিটাই আমাকে পীড়া দেয়। তাই লেখাটা তৈরী করবার জন্ত কোনো উৎসাহ পাচ্ছি নে। কিন্তু, আর না, আপনি দয়া করে শুতে যান।’

‘নিশ্চয়ই যাবো, যদি আপনিও কাজটা আজ রাতের মত মূলতবী রেখে ঘুমুতে যান।’

‘আপনার কোনো আদেশ আমি কখনো অমান্য করেছি?’

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, এ মেয়ে কি ধাতু দিয়ে তৈরী? এক দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার পর্দানশীন মা বোনের মত শাস্ত, নম্র, বিনয়ী। টেনে একবার ঐ যেটুকু যা হামলা করেছিল—সেটা নিশ্চয়ই ব্যত্যয়। আর এই যে ছুপুর রাতে আমার বাড়িতে আসা, সেটা সে পর্যায়ে পড়ে না। এটার মূলে আছে, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা মেয়েটির মন হৃদয় যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সে-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে নিষ্পাপ চরিত্রের সম্মেলন এটা বিরল এবং এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বা অন্তরমহল থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রীষ্ম নয়। সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা কটুর পর্দানশীন আমার সম্পর্কে এক ভারী তাঁর স্বামীর নষ্টাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাত ছুপুরে খানা-ঘাটে হাঁকড়া ছেড়ে নৌকো জোগাড় করে চলে যান কয়েক মাইল দূরে গৌসাইদের আখড়ায়। একে তো ছোট সেই শহরের সবা সে কেলেঙ্কারির কথা জেনে যায়, তছপরি ঐ আখড়াটির মোহান্তে আবার খুব সুনাম ছিল না। শুধু তাই নয়, বৌদিটি আখড়া ছ’দিন কাটানোর পর ফের সেই পার্টনিকে ডেকে পাঠিয়ে ফি এলেন শহরে। দাসীকে দিয়ে জড়ো করালেন পাঁচজন মুরুববীকে ওঁরা সবাই এসেছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু জানতেন না এ আমায় বৌদিটি এঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে যা-হুলস্থল লাগা

তার চেয়ে পঞ্চায়েতে যাওয়াই ভালো—বৌদির পয়েন্ট অতি পরিষ্কার—‘আপনারা বিচার করে দিন, আমার তালাক পাওয়ার হুকু আছে কিনা।’ মুসলমান হিসাবে এ স্থলে কেউ বৌদির আচরণে কোনো খুঁত ধরতে পারে না। শেষটায় বৌদি তালাক পেল, নির্মম কাবুলীর মত তার মহর, অর্থাৎ স্ত্রীধনের প্রত্যেক কড়ি আদায় করে মক্কা চলে গিয়ে সেখানে বাকী জীবন কাটালো। এর সব-কিছু সম্ভব হলো কারণ আমাদের অঞ্চলের সবাই জানতো, ঐ বৌদির মত পুণ্যশীলা নারী আমাদের মধ্যে কমই আছেন। এবং তাঁর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস—আমি যা করছি ঠিকই করছি।

বৌদির উদাহরণটি মনে এল বটে এবং শহর-ইয়ারের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আছে বটে, কিন্তু ছ’জনার বাতাবরণে হাসমান-জমীন ফারাক। আমার সম্পর্কের দাদাটি ছিলেন ইন্ডিয়ান লোক, কিন্তু একেতে—অর্থাৎ একমাত্র ভাবীতে তাঁর ‘জনিয়াস’ সৌম্যবদ্ধ না রেখে ভূমিতে স্মৃথের সন্ধান করতেন! ডাক্তার লুক্কার তাঁর ঠিক বিপরীত। অতিশয় একদারনিষ্ঠ—এমন কি রথামুথেয়ালি পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন। হুর-ইয়ারও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং ভক্তি করেন—বটা এ যুগে কিছু কম কথা নয়।

তবে ?

তারপর ক্লাস্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্নে শুনছিলাম কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে গান গাইছে। ত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক একটি নিটোল শিশির বিন্দু। আর শিশির বিন্দুরই মত যেন আপনার থেকে জমে উঠছে; তার গছনে কোনো সচেতন প্রচেষ্টা নেই। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ধ্বনি ছরের পর বছর আপ্রাণ রেওয়াজ করে হয় না—এর সঙ্গে একমাত্র মিলনা করে শুধু বলা যায় এ যেন মাতৃস্বপ্নে সহজ হৃদয় সঞ্চার।

সহজে বয় তার শ্রোত। সহজে পান করে নবজাত শিশু। যে
শুনবে সে-ই পান করবে এ-সঙ্গীত শিশুরই মত অপ্রচেষ্টায়।

ধীরে ধীরে উঠে সঙ্গীত-উৎসের সন্ধানে বেরলুম। কোথা থেকে
আসছে এ-সঙ্গীত? বেহেশৎ খেবে না হ'লে খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ
অসম্ভব নাও হতে পারে। মাটিতে পা ফেলতেই বুঝলুম এটা স্বপ্ন
নয়। মোটামুটি অল্পমান করলুম কোন্ জায়গায় এ-গানের উৎস।

এ বাড়ির দেড়তলায় একটি ছোট্ট কুটুরি আছে। সেখানে দেখি
শহর-ইয়ার নড়াচড়া করে কি-সব সাজাচ্ছে। আমাকে দেখেই
'সুখলো, 'চা খেয়েছেন?'

'না।'

'বসুন এই মোড়াটায়, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাটু স্টেশনে
গেছে, ফেরার পথে হাঁট করে নিয়ে আসবে—আজকে হাঁটবার।'

তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি শহর-ইয়ার কুটুরিটি চা
বানাবার, এবং সেইখানেই আরামে বসে চা খাবার অতি চমৎকার
ব্যবস্থা করেছে। বললে, 'এ ঘরের যা যা প্রয়োজন সেগুলো আমি
বাজারে ভিতর রেখে এসেছি স্টেশনে। কাটু আনতে গেছে।
আপনি জানেন না, আমি বেলা-অবেলায় চা খাই। তাই এ-ব্যবস্থা।
রান্নাতে আমার কোনো শখ নেই। তবে মা ডাকসাঁইটে রান্নার
আর্টিস্ট ছিলেন। হাঁসের বাচ্চা কি আর সাঁতার কাটতে পারে না
—তাই যদি নিতাস্তই চান—'

একটু ধেম্বে বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই। এ বাড়িটাকে আমরা
টাইক এণ্ড কটেজ রূপে দেখাচ্ছি নে। এটা কি রকম জানেন? খুব
বড় লোক যে-রকম ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ওটা খরচ করার কোনে
প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মাসের আমদানিটাই পুরো খরচ হয় ন
কোনো মাসেই।'

আমি বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানেন? আপনি যা'
'এখানে এসে আনন্দ পান তবে যত খুশী আসবেন। কিং

ভালো হয় ডাক্তারকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে 'এই কারণে বলছি, ভুললোক যে রকম 'বেদম' খাটছে সেটা তার পক্ষে ভালো নয়। এখানে এলে দেহ মন দুইই তাঁর জুড়ায়, আমার তো তাই মনে হয়। ওদিকে আপনারও কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি এখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ালে, আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে উনি ভারি খুশী হন। নয় কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ওঁকে ওঁর কাজ থেকে ছিনিয়ে এখানে আনা বা অস্থ কোনোখানে, সে আমার শক্তির বাইরে।'

তার পর একটু চিন্তা করে নিয়ে বললে, 'হয়তো সব-কিছুই আমার আদিখ্যেতা। আমার সমস্যা আর এমন কি নূতন? আমার শশুরমশাইকে আমি দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সেই 'যে' সকালবেলা বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন তার পর কেবল অন্ধরমহলে ঢুকতেন রাত ছুপুরে কিংবা তারও পরে—'ছ'বেলার খাওয়া-দাওয়াই ঐ বৈঠকখানায় ইয়ার-দোস্তুদের সঙ্গে। সে হিসেবে তো আমি অনেক ভালো।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আর আপনার শাস্ত্রী এ-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'কি জানি। তখনকার প্যাটার্নটাই ছিল আলাদা। আমার চোখের সামনে ছবিটা যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে না। কারণ আমার বাপের বাড়িতে ছিল অস্থ প্যাটার্ন। আমাদের আমি অল্প বয়সেই হারাই। আকবা সমস্ত দিন কাটাতেন নামাজ পড়ে, তসবী, তিলাওত আর দীনিয়াতির কিতাব পড়ে। সংসারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এইটুকু যোগ ছিল যে বেশ কড়া নজরে রাখতেন, আমার যত্ন-আত্তি ঠিক মত হচ্ছে কি না। থাক, এসব কথা এক দিনে ফুরোতে নেই। মেয়েছেলের পুঁজিই বা কতটুকু? ছেলেরা ঘোরাঘুরি করে, কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের হয়। আপনিই কত না ভ্রমণ করেছেন, কত না অস্থত অস্থত—'

আমি বললুম, 'কিছু না, কিছু না। আমার বড় ভাই-সাহেব তাঁর জীবনে মাত্র একবার কলকাতা আসেন, সেখান থেকে আমাকে দেখবার জন্ত এই বোলপুর—বাস্! মেজদা বুকি একবার আগ্রা গিয়ে সেখানে ছু'টিমাত্র দিন ছিল। দেশ-ভ্রমণের শখ তাঁদের মাইনাস নিল। অল্প লোকে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে যা খুশী রোমাটিক ধারণা পোষণ করে করুক, কিন্তু আমি জানি, আমরা তিন ভাই যখন এক সঙ্গে বসে আলাপ-চারী করি তখন কার দৌড় কতখানি। কিছু না, কিছু না—ওসবেতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।'

'হুঁ, অনেক-কিছু দেখেছেন বলে এ-সব কথা কইছেন। আচ্ছা, এবারে আমি নাইতে, সাজগোজ করতে চললুম।'

সমস্ত দিন শহর-ইয়ার আপন কামরা থেকে বেরলো না। তবে কি সে নিজের সঙ্গে কোনো রকমের বোঝাপড়া করছে? তা হলে মাঝে মাঝে আবার গান গেয়ে উঠছে কেন? আল্লা জানে তার কিসের অভাব। একাধিক বার সে বলেছে সে মুসলমান মেয়ে, বহু যুগ পরে এ-যুগে এসে অন্দর মহল থেকে বেরিয়েছে; তাই তার সমস্তা এক নূতন প্যাটার্নের প্রথমাংশ—ক্রমে ক্রমে বহু মেয়ের চোখের জল আর ঠোঁটের হাসি দিয়ে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ হবে। তারপর নব যুগান্তরে সমস্ত প্যাটার্নটা যাবে মুছে, ভাগ্যবিধাতা বসে যাবেন আবার নূতন আল্লা আঁকতে।

কিন্তু আমার কাছে এটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না যে শহর-ইয়ার মুসলমান।

আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য আছে। এবং সে আইনের

৩ত কুরান-হাদীসে। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থা অল্প রকম—যেমন, হিন্দু-
 মাজে ব্রাহ্মণের হিন্দুর কোনো ধর্মামুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য নয়।
 মুসলমানকে দিনে পাঁচ ওকৎ নামাজ পড়তে হয়, খৃষ্টানকে রববারে
 রববারে গির্জায় যেতে হয়, ইহুদিকে শনিবারে সিনাগগে, এবং খুদ
 হিন্দুধর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যাহিক করতে হয়। সেখানেও
 মাবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মামুষ্ঠান। কিন্তু
 মুসলমানের বেলা স্ত্রী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই : পুরুষকে যে-
 রকম পাঁচ ওকৎ নামাজ পড়তে হয়, পুরো রোজার মাস উপোস
 করতে হয়, স্ত্রীলোককেও তাই। এবং তারই ফলে জানা-অজানাতে
 মুসলমান মেয়ে অনুভব করে যে স্বয়ং আল্লার সামনে যখন নামাজ
 রোজার মারফতে পুরুষ স্ত্রীলোককে একইভাবে দাঁড়াতে হয় তখন
 এই পৃথিবীতেই তার অধিকার কম হবে কেন? অবশ্য কর্মক্ষেত্রে
 অধিকারভেদ থাকার কথা, কিন্তু মূল নীতি তো অতিশয় অপরিবর্তনীয়
 মুদ্র।

পক্ষান্তরে ধর্ম যাই বলুক আইন-কানুন যে আদেশই দিক একই
 দেশে যুগ যুগ ধরে থাকার ফলে সামাজিক প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে
 খুব বেশী ভিন্ন হয় না। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়
 প্যালেস্টাইনে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের
 ভিতর তিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আদেশ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষে তিন ভিন্ন
 প্রকারের অধিকারভেদ—অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক
 প্যাটার্ন তিন সমাজেরই মোটামুটি এক। একটি ছোট উদাহরণ
 মনে পড়লো : হিটলারের ভয়ে যখন ইহুদি নরনারীরা জার্মানি ত্যাগ
 করে জেরুজালেমে এল তখন বালিনের কোনো কোনো অত্যাধুনিক
 যুবতী স্বেচ্ছামাত্র শর্ট শার্ট পরে রাস্তায় বেরুতে আরম্ভ করলো। এই
 বে-আক্রে বেহায়া বেশ দেখে জেরুজালেমের আদিম ইহুদিরা
 লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, এবং নিজেদের সবচেয়ে বেশী কুণ্ঠিত
 বিড়ম্বিত বোধ করতো প্রতিবেশী খৃষ্টান ও মুসলমানের সম্মুখে।

কারণ তিন সম্প্রদায়েরই একই মান, একই স্ট্যাণ্ডার্ড আক্র, ইজ্জৎ, হায়া সম্বন্ধে ।

মনে মনে ভাবলুম, শহর-ইয়ার যা-ই বলুক, বাংলাদেশেও কি তাই নয় ? এমন কি আমাদের ইলিয়ট রোডের এংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচরণ লগুনের খৃষ্টানদের সঙ্গে যত না মেলে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ধরে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে ।

তারপর ছুপুরে শহর-ইয়ারের সঙ্গে দেখা ।

খানার টেবিলে বাবুর্চী একটা মাংসের কালিয়া দেখিয়ে বললে, এটা বেগম সায়েবা রেখেছেন । খেয়ে দেখি, আশ্চর্য, একেবারে, হুবহু কাবুলী রীতিতে তৈরী । কিন্তু রান্নাধলো কখন ?

শহর-ইয়ার বোধ হয় একটুখানি মর্জো ছিলেন । বললেন, 'আমার মা এক কাবুলীর কাছ থেকে এটা শেখেন ।' তারপর আরম্ভ করলো সেই কাবুলীর ইতিহাস । 'কেন জানিনে সেই খান সায়েবের এ-দেশটা ভারি পছন্দ হয়ে যায় । আব্বা তাঁকে একটু জমি দিলেন । সে মামুলী ধরনের ঘর বাড়ি বেঁধে বিস্মে করলো আমাদের এক রায়তের মেয়েকে । তার পর ভালভাত খেয়ে খেয়ে সে তার পাঠানহ ভুলে গেল, গাঁয়ের লোকও সেটা গেল ভুলে ।

বিয়ের পরের বছর খানের একটি মেয়ে হয়েছিল । তার পনরো বছর পর খান মেয়ের জন্ম একটি বর বাছাই করে তার বীবীকে সুখবরটা দিল । কিন্তু পরের দিন সকালে বীবী খানকে জানালেন, মেয়ে তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ-বর তার পছন্দ হয় নি ।

তাজ্জবকী বাৎ ! বাংলাদেশের মুসলমান মেয়ে বিয়ের কথাটি মাত্র উঠলেই লজ্জায় ঘেমে নেমে কাঁই হয়ে যায় । তার যে একটা মতামত থাকতে পারে সে নিয়ে তো কেউ কখনো মাথা ঘামায় না । এ আবার কি ? খান বউকে অস্তর

জানিয়ে বললে যে আখেরে সব ছুরুস্ত হয়ে যাবে এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে বেতে লাগলো। হয়েও গেল সব-কিছু ঠিকঠাক। বরপক্ষ এলেন 'ঢাক' 'টোল' বাজিয়ে, আতশবাজি পোড়াতে পোড়াতে। তারপর যথারীতি এক 'উকিল আর দুই সাক্ষী বিয়ের মজলিস থেকে বরের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন' অন্তর মহলে— সেখানে কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে, লম্বা ঘোমটা সহযোগে তাকে একটি আস্ত পুঁটুলি বানিয়ে চতুর্দিকে বসেছেন তার সখারা। সখীদের কাজ হচ্ছে, উকিল বিয়ের প্রস্তাব করার পর কনে লজ্জায় 'হাঁ' বলতে দেরি করে বলে তাঁরা তখন কনেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 'কবুল' বলায়। উকিল প্রস্তাব পেশ করলেন। ভুল বললুম, প্রস্তাব ভালো করে শেষ করার পূর্বেই মেয়ে পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "না, কবুল নয়"।

হঠাৎ কাহিনী ধামিয়ে আমাকে বললে, 'কই, আপনার কাবুলী-কালিয়া খাচ্ছেন না যে বড়?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য রসভঙ্গ করতে পারেন আপনি! বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে এই সুবে বাঙলার সুদীর্ঘ ইতিহাস কোন্ মুসলমান বঙ্গনারী এ রকম "কবুল নয়" বলেছে, শুনি? তারপর কি হলো বলুন।'

'আমি সেখানে ছিলাম না, তবু খানিকটে অনুমান করতে পারি। ঐ কনের মজলিসে একশ'টা বাজ একসঙ্গে পড়লেও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ধ্বঙ্কুমার লাগাতে পারতো না। তারই ভিতর যাদের একটু মাথা ঠাণ্ডা ছিল তাঁরা কনেকে পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, হাতে পায়ে ধরলেন তাঁদের মাথায়, তাঁদের গোপ্তীর মাথায় যেন কেলেঙ্কারি না চাপায়। কনের 'মামারা তো' পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। আর বাপ, কাবুলি খান সাহেব—সে তার সর্ব পাঠানত্ব হারিয়ে কেলা সত্ত্বেও একটা সামান্য জিনিসে তখনো তার কিছুটা আটকা পড়েছিল সেটা তার

প্রাচীন দিনের একখানা তলওয়ায়ে। কুড়ি বছর ধরে সে ঐ তলওয়ারখানা সাক্ষুংরো রেখেছে। ঐটে নিয়ে করলো খাওয়া মেয়েকে খুন করবে বলে।

ওদিকে বাইরে বরপক্ষের কানে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে। এক সঙ্গে গর্জে উঠলো সবাই, “একী বেইজ্জতি!” আমাদের গাঁয়ের লোক দলে ভারি কিন্তু হলে কি হয়, ওদের সঙ্গে ছিল জনা তিনেক জহাঁবাজ লেঠেল—বরের মুরুবিবদের ভিতর। আর জানেন তো, চাষাভূষার বিয়েতে নানা রকমের ঢং তামাশার মেকি লড়াই হয়—ভাবটা যেন বরপক্ষ কনেকে ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাচ্ছে—তাই সঙ্গে এনেছে যার যার লাঠি। বাস্! লাগ্ লাগ্ লাগ্। আমাদের গাঁয়ের মোল্লাজী, মসজিদের ইমাম সাহেব’ এমন কি বরপক্ষ যে তাদের মোল্লাজী সঙ্গে এনেছিল স্তিনি পর্যন্ত, সবাই মিলে আল্লা রসুলের দোহাই দিয়ে ওদের ঠেকাবার জগ্ন প্রায় পায়ে ধরেন আর কি।

শেষটায় আমার চাচা খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে লড়াই ঠেকালেন। নিজেই থেকেই বললেন, বিয়ের জগ্ন বরপক্ষের যা খরচা-পত্র হয়েছে তিনিই সেটা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু বরপক্ষ কনে না নিয়ে শুধু ‘হাতে’ যদি বাড়ি ফেরে তবে সারা রাস্তা ধরে তাদের শুনতে হবে পাঁচখানা গাঁয়ের টিটকারি। তার ব্যবস্থাও চাচা করে দিলেন। ওদের মোল্লাজীকে আড়ালে নিয়ে আলাপ করে খবর পেলেন আমাদের পাশের গাঁয়ে বরপক্ষের পাল্টা ঘর আছে ও তাদের একটা মেয়েকে এই বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জগ্ন একটা ইশারাও দিয়েছিল। চাচা বরের বাপ-চাচার সঙ্গে কথা বলে আমাদের মোড়লকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বলে দিলেন সে যেন আমার চাচার হয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়ে। চাচা নামকরা জমিদার আর এরা সাধারণ রায়ৎ—এ যে কত বড় সম্মান আর ইজ্জতের কথা—’

আমি বললুম, ‘খুব বুঝতে পেরেছি। আমার আন্টাকে বিয়ে-শাদীর দোয়া দরুদ পড়তে আমার জীবনে মাত্র একবার আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির দাসীর যখন বিয়ে হলো আমাদের এক কুটুম-বাড়ির চাকরের সঙ্গে। পরের দিন বরের দেমাকটা যদি দেখতেন! তারপর কি হলো বলুন।’

‘তারপর আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সেই রাতেই বরপক্ষ পাশের গাঁয়ে গিয়ে বিয়েশাদী সাজ করে কনে নিয়ে মান-ইজ্জতের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো। তবে শুনেছি, আমাদের গাঁ থেকে বেরবার সময় তারা নাকি ভিতরে ভিতরে শাসিয়ে গিয়েছিল যে এ-তল্লাটের মাথা, আমার চাচা, তাদের হাত বন্ধ করে দিলেন কিন্তু সামনের হাটবারের দিন আমাদের গাঁয়ের লোক যেন ছুঁশিয়ার হয়ে হাট করতে যায়।’

‘আর কনেটা?’

‘সে কি আর বেশীক্ষণ চাপা থাকে, কার সঙ্গে সে মজ্জেছে, ছোড়াটা অবশি তুলকালাম দেখে গা ঢাকা দিয়েছিল। তালমু করে ধরে নিয়ে এসে বর সাজানো হলো।’

‘তা মেয়েটা গুরুত্ব শেষ মুহূর্তে এরকম নাটুকে কাণ্ড করলে কেন?’

‘ওর নাকি কোনো দোষ নেই। সে বেচারী তার মাকে অনেক বার তার অমত বেশ জোর গলায়ই জানিয়েছিল, কিন্তু মা পাঠানকে বার বার বিরক্ত করতে সাহস পায় নি। আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছরুস্ত হয়ে যাবে।’

আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ সাজ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উঠি উঠি করে উঠি নি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, শহর-ইয়ার অস্থ কিছু একটা ভাবছে এবং সেইটে চাপা দেবার জন্ত ঘটনাটি বলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, ‘চলুন।’

বসার ঘরে এসে বললে, 'কিন্তু খানের মেয়ের বিয়ে বাবদে আসল কথাটি আপনাকে এখনো বলা হয় নি। মেয়েটির বিয়ে চুকে-বুকে যাওয়ার মাসখানেক পরে খান একদিন তার বউকে বললে যে, সে বড় খুশ যে তার মেয়ের গায়ে পাঠান রক্ত আছে। এ রকম ঘটনা পাঠান মুল্লুকে নিত্য নিত্য না ঘটলেও ব্যাপারটা একেবারে অজানা নয়।'

আমি বললুম, 'তবেই' দেখুন, ইসলাম যে-সব অধিকার আমাদের দিয়েছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করিনে। শুনেছি, আরবভূমিতে এখনো নাকি মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।'

শহর-ইয়ার একটু হেসে বললে, 'ঠিক ঐ জিনিসই এখন বাঙলা-দেশে অল্প অল্প আরম্ভ হয়েছে। যে-সব মুসলমান মেয়েরা এখন মিছেলেনদের সঙ্গে কিছুটা অবাধে মেলামেশা করে তারা নিশ্চয়ই কিছুটা পানেন্ট দেওয়ার পর ছেলেরা বিয়ের প্রস্তাব পাড়ে।'

আমি বললুম, 'ইংরেজীতেও বলে Courtship is the process of a woman allowing herself to be chased by a man তিনিই she catches him.'

শহর-ইয়ারের পছন্দ হলো প্রবাদটি। তারপর বললে, 'তবেই' দেখুন, যে অধিকার মুসলমান মেয়ের ছিল ইসলামের গোড়া পত্তনের সময় থেকে, সেইটেই সে ব্যবহার করলো ইংরিজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, অন্দর মহল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। পাঠান মেয়েরা কিন্তু চিরকাল ধরে এ-হক্কটা দরকার হলেই কাজে লাগিয়েছে। শুনেছি, তারা নাকি অনেকক্ষেত্রেই বাপ-মার তোয়াক্কা না রেখে আপন পছন্দের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে। আপনি তো আপনার লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে আমাকে দেন না, কিন্তু কাবুলে ঐ যে একটি পাঠান মেয়ে আপনাকে ভালোবেসেছিল—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে, প্রাণভরে 'মণিকে' নিয়ে

যত খুশী আলোচনা করতে পারেন। এ কাহিনীতে আমি এমনই না-পাস্ ফেল মেরেছি যে ওটার কথা স্মরণে এলে ‘মণির’ কাছে মনে মনে বার বার লজ্জা পাই আর মাফ চাই—এত বৎসর পরেও।’

‘সে কি ? আমি বুঝতে পারলুম না।’

আমি গভীর ছুঃখ প্রকাশ করে বললুম, ‘মণির কাহিনী গল্প নয়, হাজার পার্সেন্ট সত্য। আমি তার সিকির সিকিও ফুটিয়ে তুলতে পারি নি। আমি আমার জীবনে মাত্র একটি বার—ঐ নিস্পাপ কিশোরী মণির কাছ থেকে—‘অকুণ্ঠ’, ‘সর্বভ্যাগী’, ‘হিতাহিত-জ্ঞানশূণ্ঠ’ প্রণয় পেয়েছি। ও ছিল সত্যই কাবুল পাহাড়ের চুড়োর উপরকার ভার্জিন স্নো—এটা আমার ভাষা নয়, এটা বলেছিলেন মণির মুনিব বেলো, জাতভাই বেলো—জানো তো পাঠানরা সাম্যবাদে কি রকম মারাত্মক বিশ্বাসী—সেই ‘রসকষহীন স্টোন-হার্ড-বয়েলড্ ডিপ্লোমেট শেখ মহবুব আলী খান। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন, যে, পেশাওয়ারে তাঁদের পরিবারে পরে এখানে ব্রিটিশ লিগেশনে পাঠান চীফ একাউন্টেন্ট থেকে আরম্ভ করে পাঠান অরডারলি পর্যন্ত—খাবার সেই প্রাণঘাতী ডিমোক্রেসি—মণির কুপাদৃষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল, কেউ কেউ বিশুদ্ধ পাঠান-রীতিতে মহবুব আলীর কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে মহবুব আলীর শেষ কথাগুলো, ‘ওমেদারদের দৃঢ়তম প্রচেষ্টাও যেন মণির মনে কোনো ক্ষণেকের তরে ছায়াটুকু পর্যন্ত ফেলতে পারে নি। যেন ওসবের কোনো অর্থই হয় না, যেন তার বয়েস ষোল নয়—চার। তাই বলছিলুম, ভার্জিন স্নো, যার উপর রক্তভর ধুলো-বালি পড়ে নি। তারপর সে আপনাকে দেখল—একবার দরজা খুলে দেবার সময় আরেকবার যখন আপনার জঙ্ঘ নাশ্তা নিয়ে এল। সেদিন আপনি এখানে ছিলেন আধ ঘণ্টাটাক। পরদিন আমার স্ত্রী বললেন, মণি যেন জীবনে এই প্রথম জেগে

উঠলো। নরনারীর একে অন্নের প্রতি বাছাই-অবাছাই-না-করা 'আকর্ষণ, 'বিবাহ, 'মাতৃস্ব সব যেন ঐ দিন এক লহমায় সে বুঝে গেল।' এ সমস্ত 'কবিত্ব' একজন ধুরন্ধর ডিপ্লোমেটের মুখ থেকে—হৃদয়ের সৃক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা যায় কাছে আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি।

মণির সেই প্রেম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছিলুম আমি, কিন্তু (তার প্রেমের আবেগ, সে প্রেমের ভিতর তার সম্মোহিত অবস্থা, যেন সে নিশির-ডাকে-পাওয়ার মত চোখ বন্ধ করে ভিতরকার প্রেমের প্রদীপালোকে চলেছে দয়িতের অভিসারে কাবুলের শঙ্কাসঙ্কুল গিরিপর্বত লঙ্ঘন করে)—এসব পারলুম না আপনাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে। জানেন তো, আমাদের কোনো কমন ল্যানগুইজ ছিল না?—তৎসত্ত্বেও আমার হৃদয়ে মণির প্রতিটি হৃদ-স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল অব্যবহিত ভাবে।

আমার আফসোস, আফসোস,—হাজার আফসোস—যে আমি 'মণির প্রেমের নেমক খেয়ে সে নেমকের কিম্বৎ দিতে পারলুম না,— আমার সব সময় মনে হয় আমি যেন নেমকহারাম রয়ে গেলুম। জানেন, মণির এই বেদনা-কাহিনী লেখার পর সেটা আর কখনো পড়ি নি? লেখার সময়ই আমি প্রতি লহমায় হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলুম, সুর লাগছে না, কিন্তু প্রাণপণ আশা করছিলুম যে-সৃষ্টিকর্তা আমাদের নগণ্য সৃষ্টির চলার পথ তৈরী করে দেন তিনি কোনো এক মিরাকুল্ অবতীর্ণ করে শেষ রক্ষা করে দেবেন। কিন্তু আফসোস, তিনি প্রসন্ন হলেন না।'

শহর-ইয়ার গভীর দরদ দিয়ে শুনছিল। শেষটায় বললে, 'মাফ করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে করে, আপনার এই ধারণাটা জন্মালো কি করে?'

'অত্যধিক 'আত্মপ্রত্যয়, 'দস্ত। আমি ভেবেছিলুম এ তো

জলজ্যান্ত ঘটনা। কোনো-কিছু বাড়াতে কমাতে হবে না। স্মৃতির গভীরে কলম ডোবাবো আর লিখব। এতে তো কোনো মুশকিল নেই। সেই হলো আমার কাল। আপন কল্পনা, সহানুভূতি বাদ পড়ে গেল—এক কথায় আমার হৃদয়রক্তে রাঙা হয়ে রক্ত-শতদলের মত মণি ফুটে উঠলো না। হয়ে গেল ফোটোগ্রাফ--সেও আবার রদ্বি ফোটোগ্রাফ। ফোকাস ঢিলে, কোথাও ওভার-এক্সপোজড কোথাও বা আগার। ফ্ল্যাট, কর্ণটুর নেই আর ক্যামেরাও বাঁকা করে ধরা ছিল বলে টিলটেড্‌।’

শহর-ইয়ার শব্দার্থে তামাম শহরের ইয়ার। ইনি আমার লেখার অকৃত্রিম ইয়ার। ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে।

পাঁচ

স্টেশনে আমার পরিচিত ছ'চার জনের সঙ্গে দেখা। সবাই এক কামরায় উঠলুম—যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, শহর-ইয়ারের এ ব্যবস্থাটা আদৌ মনঃপূত হয় নি। তাই আমি আরো বিশেষ করে ওদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম না।

শহর-ইয়ারকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু তার সৌন্দর্যে অপূর্বতা আছে। সে সৌন্দর্য তিনি ধারণ করেছেন অতিশয় সহজে, এমন কি অবহেলাভরে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পুরুষানুক্রমে বিত্তশালীজন যে রকম তার বৈভব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ধনী-দরিদ্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। আমার মনে হচ্ছিল, একে একটুখানি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ইনি সুন্দরীকূলে জন্ম নিয়েছেন, সুন্দরীদের ভিতর বড় হয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে ছেলেবেলায় কেউ আদিখ্যেতা করে নি বলে তিনি এ বিষয়ে এমনই সহজ সরল যে সৌন্দর্যহীনারা তাঁর সৌন্দর্যকে ঈর্ষা করবে না, সুন্দরীরা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখবে না। তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা কিছুটা তাঁর বর্ণে। বংশানুক্রমে পদার আড়ালে বাস করার ফলে তাঁর শাস্ত গৌর বর্ণকে 'অসূর্যস্পশ্যা' বর্ণ নাম দেওয়া যেতে পারে। এ বর্ণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অতি অবশ্য কিন্তু সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করবে সে-কথা বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ রঙের প্রতি আমার নাড়ির টান আছে—আমার মা-বোন সকলেরই 'এই ধরনের' রঙ—কেউ একটু বেশী 'গৌরী' কেউ বা 'কম'। তছপরি শহর-ইয়ার এখন পূর্ণ-যৌবনা—অনুমান করলুম তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে আঠাশের কোনো জায়গায় হবে। মাধায় 'সিঁছর' 'খাকার' 'কর্ধা' নয়, এবং যদিও বেশভূষা ছবছ বিবাহিতা বাঙালী হিন্দু মেয়ের মত তবু কোথায় যেন,

কমন যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি কিছুতেই সে-পার্থক্যটা
 ঞ্জে বের করতে পারলুম না। আমার এক অসাধারণ গুণী চিত্রকর
 জু আছেন এবং অদ্ভুত তাঁর পৰ্ববেষ্ণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। তিনি
 াকলে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। পর্দানশীন খানদানী
 মুসলমান গোঁরীদের রঙ তিনি লক্ষ্য করে আমার সামনে একদিন ঐ
 প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

পরিচিতেরা ছ'এক বার তাঁর দিকে আড়নয়নে তাকিয়েছিলেন—
 এ মেয়ে যে আর পাঁচটি সুন্দরী থেকে ভিন্ন সেটা হয়তো ওঁদের
 চাখেও ধরা পড়েছিল। শহর-ইয়ার কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
 নির্বিকার। কে বলবে, ঐর মা-দিদিমা যুগ যুগ ধরে পর্দার আড়ালে
 দীবন কাটানোর পর ইনিই প্রথম বেগানা পুরুষদের সামনে আত্ম-
 প্রকাশ করেছেন!

কামরাটা সব চেয়ে বড় সাইজের যা হয়। তিনি কিন্তু
 আমার পাশে না বসে আসন নিলেন সুদূরতম প্রান্তে। বেঞ্চির
 উপর পা তুলে মুড়ে বসে, কিন্তু আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে।
 আমাদের পাঁচজনের ভিতর নানা রকম আলাপ-আলোচনা আরম্ভ
 লো। সকলেই 'বুদ্ধিজীবী'—বিষয়বস্তুর অনটন হওয়ার কথা
 য়। শহর-ইয়ার সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন কি না, বুঝতে
 ারলুম না।

কবে হয়ে গেছে ঐর বিয়ে, কিন্তু বাপের বাড়িতে বিয়ের পূর্বে,
 ময়েকে যে তালিম দেওয়া হয়—খশুরবাড়িতে গিয়ে সে কি ভাবে;
 সবে চলবে এবং বিশেষ করে অঙ্গসঞ্চালন নিরোধ করে থাকবে—
 দটা মোটেই অনভ্যাস রশতঃ বিস্মৃত হয় নি। সেই যে বোলপুরে
 ধ-ভাবে আসন নিয়েছিল বর্ধমান পর্যন্ত তার সামান্যতম নড়চড়
 লো না।

বর্ধমানে প্রায় সবাই চায়ের সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। ঐরা
 হন্দু না, ঐরা অপটিমিস্ট।

শহূর্-ইয়ারের পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'শহূর্-ইয়ার, এখানে কিন্তু আপনি একমাত্র আমার ইয়ার।'

মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এইখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু শুধু এখানে কেন, আপনি তো সর্বত্রই আমার একমাত্র ইয়ার।'

আমি বললুম,

'ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী।'

'মানে ?'

'আমি আপনার চেয়ে বয়সে ডবল না হলেও তারই কাছাকাছি আমার পালে ওপার ষাবার হাওয়া লাগে লাগে। তখন আপনি 'হে আমার সাকী, নূতন ইয়ার পাবেন।'

রীতিমত বেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ, আপনি এসব কথ' বলেন কেন ? ভাষার উপর আপনার বিধিদত্ত অধিকার আছে সেটা আপনার হাতে ধারালো তলওয়ার, সাবধানে ব্যবহার না করলে আমার মত সরল জন, যে বিশ্বাস করে আপনার অতি কাছে এসেছে তার বুকের ভিতর তার ফলাটা হঠাৎ ঢুকে গিয়ে খামোখ রক্ত বওয়াবে না ? আপনার কাছ থেকে আমার 'বহুৎ আশা বহু বহু বৎসর আপনার সাহায্য আমি পাবো বলে নিশ্চিত ধরে নিয়েছি।'

'আচ্ছা, শহূর্-ইয়ার, আপনি ইস্কুল কলেজ গিয়েছেন, সে সূত্রে নিশ্চয়ই ছ'পাঁচজনের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে অন্তত কোনো কোনো অধ্যাপকের স্নেহ আপনি অতি অবশ্যই পেয়েছেন, কারণ আমি জানি আপনি পড়াশুনায় অসাধারণ ভাল ছিলেন, আপনার আদব-কায়দা মানুষকে নিশ্চিত মনে মেলামেশা স্নযোগ করে দেয়, এবং তছপরি মুসলমান ছাত্রী এই দশ বছ আগেও এতই বিরল ছিল যে হিন্দু অধ্যাপকরা তাদের বিশেষ আদরের চোখে দেখতেন—হয়তো বা তাতে নূতনের প্রতি ঋনিক

কৌতূহলও মেশানো থাকতো। বিয়ের পরে আপনার স্বামীর ইয়ার-দোস্তের সঙ্গেও আপনার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা না হয়ে যায় না। এদের ভিতর কেউ নেই যার সঙ্গে পেলে, যার সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পান ?’

‘না।’ বাস, ঐ একটি শব্দ। এত ক্ষুদ্র পরিষ্কার উত্তর আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিল।

‘কিন্তু—’ আমার আর কথা বলা হলো না। প্রায় চিংকার করে উঠলুম, ‘এ আমি কি দেখছি! মরীচিকা, মরুত্বা, মিরাজ ? ভানুমতী, ইঞ্জাল ? না, না, এসব কিছুই নয়। আমার চোখ ছোটো বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। ভাই শহর-ইয়ার, কলকাতায় নেমেই সোজা চশমার দোকান।’

আমার উদ্ভেজনার কারণ সরল নয়, অতি কুটিল। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। সরকারী ছকুমে যখন সর্ব রেলওয়ে স্টেশনের মদের ‘বার’ বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই পুণ্যভূমি বর্ধমান স্টেশনের কেলনার হয় ভেবেছিলেন চা, বিয়ার, হুইস্কি একই জিনিস, সব কটাই পৈশাচিক মাদকদ্রব্য, কিংবা চা মত্ত না হলেও উদ্ভেজক দ্রব্য তো বটে। অতএব কংগ্রেসের অকৃত্রিম সদস্য হিসেবে, কংগ্রেস ধর্মানুযায়ী তাঁরা মত্ত জাতীয় সর্ব উদ্ভেজক আবর্জনার সঙ্গে চাকেও কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এ তত্ত্বটি আমি সাত্তিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি। কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে, আমি তা হলে তাকে দেখে নেব—কি কি করবো, এখন বলছি নে, কিন্তু সর্বপ্রথমেই যে আমি তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনবো সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।

এহেন দৃঢ় প্রত্যয় যখন আমার হৃদয়মনে দড় থানা গড়ে টাইট বসে আছে, তখন যদি বর্ধমান রেল কামরায় কেলনারের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—মনে রাখবেন, আমরা তাকে অর্ধেক রাজহ ও ‘রাজকণ্ঠা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, বাস্-ট্যান্সি

পারমিটের প্রলোভন দেখাই নি—আবার বলছি আপন খেয়াল-খুশী-মর্জিমোতাবেক, মেহেরবানী মাফিক একথানা ট্রেতে ঢাউস পট চা, রুটি-মুন্লেট' সামনে ধরে সবিনয় বলে, 'মেম সাহেব, আপকী চা' তবে কি আপনার নলেজ বাই ইনফারেন্স এই হবে না, যে আপনার চোখ আল্লার গজবে বিলকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? এ তো মাতালের সিঙ্গল বস্ত্র ডবল দেখা নয়। এ যে যা নেই তা দেখা, আকাশকুসুম শৌকা, গাড়ির কামরার মধ্যখানে রাজার পিসি কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলতে খেলতে ফ্রেম থেকে খুলে আমসত্ত্বভাজা খাচ্ছেন তাই দেখা।

'না, না, না। ইয়ার শহর-ইয়ার, এ সেই আরব্য রজনীর অন-নশ্শারের কাল্পনিক ডিনার! আমি এসব 'জিনিস' স্পর্শ করার চেষ্টা করে হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধনেওয়ালার মত সমুখের 'বঙ্গীয় উম্মাদ আশ্রমে'র ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে বাদবাকী জীবন বলে থাকতে চাইনে।'

শহর-ইয়ার বললেন, 'আপনার হুঁশিয়ারী অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে এ সম্পর্কে সামান্য একটি কথা আছে। আপনি যখন কাটুকে টাকা দিয়ে বাড়িঘর খবরদারীর কথা বলছিলেন তখন আমি স্টেশনের লৌককে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়েছিলুম। এবারে খান।'

ওঃ! এ খাওয়াতে ডবল সুখ! আর সবাই জান পানি করে পেয়েছে ভাঁড়ের পানি—না চা? সে একই কথা।

'আমি আগের সীটে ফিরে গেলুম না।

এবারে ডাক্তার গাফিলী করেন নি, কিংবা 'ভুলেও যান নি। তাঁর পিতার আমলের সেই 'ঢাউস' পাকী গাড়ির মত মোটর নিয়ে স্টেশনে হাজির। লক্ষ্য করলুম, ডাক্তারদের সামাজিক আচরণ যদিও আর পাঁচজন হিন্দুদেরই মত, তবু বাড়ির বাইরে

বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় পার্লিক প্লেস সেখানে স্ত্রীর সামনে এখনো একটু 'আড়ষ্ট', যেন সবে পরশু দিন তাঁদের শাদী হয়েছে।

প্রথমটায় রাস্তার উপরকার দোকানপাট, ছোটো একটা গারাজ দেখে সেগুলোর পিছনে কি বস্তু আছে ঠিক অনুমান করতে পারি নি। মোড় নিয়ে খোলা গেটের ভিতর দিয়ে গাড়ি তখন সংকীর্ণ একটা গলিপানা প্যাসেজের ভিতর দিয়ে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে নেমে আগাপাস্তলা তাকিয়ে দেখি 'বিরাত, প্রকাণ্ড প্রাচীন যুগের একটা' বাড়ি—বরঞ্চ 'করাসীতে বলা উচিত শাটো'। ক্ষীণ আলোকিত আকাশের অনেকখানি ঢেকে রেখেছে বাড়িটা—তার থেকেই অনুমান করলুম সেটার সাইজ। কারণ সমস্ত বাড়িটা 'অন্ধকার, অপ্রদীপ। শুধু দোতলার বৃহৎ একটা অংশের সারিবাঁধা অনেকগুলো জানলা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আলোর বহা। এ যুগেও যে কলকাতায় এ রকম 'অতিকায়' বসত-বাটি আছে সে ধারণা আমার ছিল না। বাড়িটা কিন্তু রাজামহারাজাদের কলকাতার ক্যান্সি প্যালেস প্যাটার্নে তৈরী করা হয় নি। গাড়ি-বারান্দায় যেন একটি আলো জ্বলছিল তারই আলোকে দেখলুম, অলঙ্কারবর্জিত সাদামাটা—কিন্তু খুবই টেকসই দড় মাল-মসলা দিয়ে বাড়িটা তৈরী। পরিষ্কার বোঝা গেল যে যিনি বাড়িটা তৈরী করান তাঁর অসংখ্য ঘর-কামরার দরকার ছিল বলে সেটাকে যতদূর সম্ভব বড় আকারের করে তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেই সময় এটাও স্থির করেছিলেন যে তাঁর বংশধরগণকে যেন অন্তত 'ছ' বছর ধরে অল্প বাড়ি বানাবার প্রয়োজন না হয়।

দারওয়ানসহ জনা পাঁচেক লোক এগিয়ে এল। 'হঠাৎ নবাব'দের উর্দি পরা লোকজনের হাফ মিলিটারি সেলুটাদির আশঙ্কা আমি করি নি। তারাও মুসলমানী কাঁয়দায় অল্প ঝুঁকে সালাম জানালো। কোনো জায়গায় কোনো কৃত্রিমতা নেই।

ডাক্তার কথা বলে যাচ্ছেন, ম্যাডাম—মনে হলো যেন ক্রমেই গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হয়ে যাচ্ছেন। মুসাক্কিরী ক্লাস্তিও হতে পারে।

বাড়ির বিপুল আকারের তুলনায় দোতলা ষাবার সিঁড়ি যতখানি প্রশস্ত হওয়ার কথা ততখানি নয়, যদিও প্রয়োজনের চেয়েও বেশী।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম যখন দোতলার একটা অতি দীর্ঘ বারান্দার উপর দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজা দিয়ে ডাইনের দিকে দেখি, একটার পর একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম, ড্রইংরুম, মাঝে মাঝে ডাইনিংরুম—কখনো দিশী ধরনের, কখনো বা বিলিতি স্টাইলের। ছ'একটা কামরা মনে হলো যেন বাচ্চাদের পড়াশুনার ঘর। বেডরুমগুলোর কোনোটাতে প্রাচীন দিনের জোড়া পালঙ্ক, কোনোটাতে ছোট ছোট তিনখানা তক্তাপোশ।? কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কোনো ঘরে একটি মাত্র 'জনপ্রাণী' নেই, বিছানাপত্র কিন্তু ছিমছাম তৈরী আর প্রায় প্রত্যেকটি কামরায় বিজলী বাতি জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকে মোড় নেবার সময় আর্মি আবার লক্ষ্য করেছিলুম বাঁ দিকে এটারই মত একটা দীর্ঘ উইণ্ড, রাইট এঙ্গেলে এটার সঙ্গে লেগে ইংরিজি এল শেপ তৈরী করেছে। সেটা কিন্তু অঙ্ককার।

অবশেষে দীর্ঘ অভিযান শেষ করে আমরা একটা বড় সাইজের ড্রইংরুমে ঢুকলুম। আমাকে বসিয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরা দেখা করতে এলে এখানেই বসেন; তাঁরাই পছন্দ করে এটা বেছে নিয়েছেন। একটু পরেই আপনার ঘর দেখাচ্ছি—শহর-ইয়ার সেটা চেক আপ করে নিক্। ঘরটা ভাল না লাগলে কাল আপনার খুশী-মত যে কোনো একটা পছন্দ করে নেবেন। বাঁ দিকে মাদামের বুদ্ধোন্নয়ন—সমস্তটা দিন তিনি এখানেই কাটান। আর এই ডান দিকে আপনার ঘর—অন্তত এ-রাত্রিটার মত। চলুন, দেখি, কদরূ কি হলো। শহর-ইয়ার আবার একটু অতিরিক্ত পিটপিটে, তায় আবার আপনার প্রতি তার 'হিমালয়ান স্ক্রি'।'

অ। মাদাম একেবারে ন'সিকে বিলিতি। একটা চেয়ারে বসে তদারকী করছেন—বেয়ারাটা আমার ছোটো স্মুটকেশ থেকে জিনিসপত্র, জামাকাপড় বের করে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখছে কি না। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশন্ন হাসি হেসে বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনার বইপত্র, কাগজকলম পাশের ঘরে আপনার ঢাঁড়িতে। অন্তরঙ্গ বন্ধু'—এবারে মুখে কোঁতুকের হাসি, 'কিংবা বান্ধবী দেখা করতে এলে ঐ স্টাডিতে নিরিবিলিতে তাঁকে এনটারটেন করতে পারবেন। আর এই এখানে বাথরুমের দরজা। হাতমুখ ধোবেন, না গোসল করবেন? আমি ছুট লাগাচ্ছি এখন, ডালভাতের তদারকী করতে। বেয়ারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে—আমি বাসনবর্তন থেকে ফর্মিং না পেলে।' ডাক্তারকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ গা তুমি খেয়ে দেয়ে পেটটান করে ফেলো নি তো?' ফের আমাকে বললেন, 'লেবরেটরি থেকে ফেরা মাত্রই উনি খাবার টেবিলের দিকে যে স্পীডে ধাওয়া করেন যে দেখে মনে হয়, বহু শত বৎসরের বিরহ কাটানোর পর মজলু প্রিয়া লাইলিকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের একটি অতশিয় মহৎ সদগুণ আছে—বোটা প্রতি যুগ্রে প্রতি দেশে বিবাহিতা রমণী মাত্রই আপন পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। হিন্দু হলে বলবে, না জানি কত শত যুগ তপস্শা করে এ-হেন বর পেলুম, আর আমি বলি আমার বহু মুকুবির বহু দিল্-এর দোওয়ার ফলে এ-হেন কর্তা পেয়েছি। সেই মহৎ সদগুণটি কি? খানা-টেবিলের পানে ধাওয়া করে সেখানে যদি দেখেন সেক' প্লেন এক ধামা মুড়ি, কিংবা পক্ষান্তরে যদি দেখেন কোর্মা-কালিয়া-মুসল্লম-কাবাব-পোলাও গয়রহ তখন এই মহাদয় মহাজনের কাছে ছুই পক্ষই বরাবর! আর না—আমি চললুম।'

ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একেই তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক-

খানা উয়েল-লুব্রিকেটেড রসনা—ডাক্তার হিসেবে নিতাস্ত হিউমেন এনাটমি জানি বলে একখানা রসনাই বললুম, ইতর জন বলবে শতাধিক—তত্পরি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশ-কিস্মৎ নেক-নসীব হওয়ার পর থেকে তার উপর ভর করেছে একটা আস্ত সাহিত্যিক জলজ্যাস্ত মামদো। আপনার সাহিত্যিক গুণটা পেলেও নাহয় সেটা সয়ে নিতুম। তা নয়। রামকে না পেয়ে পেয়েছে তার খড়ম। এখন আমার ব্রহ্মতালুর উপর শুকনো সুপরি রেখে অষ্টপ্রহর দমাদম পিটুনি—সেই আপনি, রামচন্দ্রজী, আপনার খড়ম যে বরায়ে মেহেরবানী এনাম দিয়েছিলেন তাই দিয়ে। ওক্‌।’

আমি বললুম, ‘শত যুগের তপস্যা-ফপস্যা জানিনে, ডাক্তার, কিন্তু আপনি যে রত্নটি পেয়েছেন সেটি অতিশয় ‘কপালী লোকেও পায় কি না-পায়’ সন্দেহ। আর আমার জান-কলিজা-দিল থেকে দোওয়া আসছে, আপনারা যেন একে অশ্বের অক্লাস্ত কদর দিতে দিতে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, দরাজের চেয়েও দরাজ জীবন যাপন করেন। আমেন !’

ডাক্তার বললেন, ‘আমার সব মুক্কাববজন ওপারে। এপারে মাত্র একজন—আপনি। আল্লা যেন আপনাকে ‘একশ’ বছরের জিন্দেগী দেন। আমেন, আমেন।’

রুচিশ্রী অনাড়ম্বর খান্না খাওয়া শেষ হলে পর একটুখানি ইতিউতি করে ডাক্তার বললেন, ‘আজকের মত আমাকে মাফ করে দেবেন, স্মর ? দিনভর বেদম খাটুনি গিয়েছে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—ওদিকে আবার এশার নমাজ এখনো পড় হয় নি।’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল সকালে দেখা হবে তো ! না আপনি লেবরেটরিতে গিয়ে সেখানে ফজরের নমাজ পড়েন ! শুড নাইট, ডাক্তার। ‘খুদা-হাফিজ !’

ডাক্তার মাথা নিচু করে বললেন, 'গুড নাইট, স্মার।' তারপর একটু খেমে বললেন, 'আপনি আসতে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

শহূ-ইয়ার উঠে বললেন, 'আমি ঠিক দু'মিনিটের ভিতর ফিরে আসছি।'

ডাক্তার তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। শহূ-ইয়ার সেদিকে কান না দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি শোবার ঘরে এসে ধীরে শ্বুস্বে কাপড় ছেড়ে সবে একখানা বই নিয়ে বসেছি এমন সময় ম্যাডাম এসে উপস্থিত। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ওঁর নমাজের ব্যবস্থাটা আমি নিজের হাতে করে দি। ঐ একটি ব্যাপারে, সত্যি বলছি ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে উনি সহজে সন্তুষ্ট হন না। আর-সবাই তো বছরের পর বছর একই জায়নমাজে নমাজ সেরে সেটি ভাঁজ করে রেখে দেয়, পরের বারের জঞ্জ ?—উনি বললেন "উছ—কত ধুলোবালি ময়লা জমে তার উপরে।" তাই তাঁর প্লেন লংক্লেথের তিনখানা জায়নমাজ আমি পালাক্রমে রোজ রাতে কেচে রাখি। উনি অবশ্য বলেছিলেন বেয়ারা কাচুক না। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতে কাচা জায়নমাজে তিনি প্রসন্নতর চিত্তে নমাজ পড়েন।'

আমি ঈষৎ বিস্মত হয়েছিলুম, সেই এশার নমাজের কথা শুনে। এবারে পুরো মাত্রায়। শুধালুম, 'উনি কি নমাজ-রোজাতে খুব আসক্ত ? তাই তো মনে হচ্ছে।'

শহূ-ইয়ার বললেন, 'আসক্ত ! ঐ দুটি মাত্র খাতু দিয়েই তো তাঁর জীবন গড়া। নমাজ-রোজা 'আর রিসার্চ।' ?

আমি হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে দোলাতে বললুম, 'আমি সব জানি, আমার কোনো জিনিস অজানা নেই। আমি পয়গম্বর

হজরৎ মুহম্মদ সল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি সসলাম-এর বংশধর, তহুপরি আমি সাতিশয় সম্মানিত গীর খানদানের ছাওয়াল, তহুপরি আমার ঠাকুরদা দাদামশাই ছু'জনাই ছিলেন জ'হাবাজ মৌলানা। আমি জানবো না তো কে জানবে ? আপনি ? ডাক্তার ? আবাদন্ ! হরগিজ নহী।' বলে তিনটি আঙুল তুলে যন যন আন্দোলন করতে করতে বললুম, ট্রিনিটি, ট্রিনিটি—পিতা পরমেশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পূবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা—রূপকার্থে ও শব্দার্থে। কিংবা, ভদ্রে বেগমসাহেবা, কাছে এসে অস্বদেশীয় গীতাটি স্মরণ করুন। জ্ঞানযোগ—সে ডাক্তারের রিসার্চ। কর্মযোগ—সে তাঁর আরাধনা-ক্রিয়া-কর্ম। ভক্তিয়োগ—সে আপনার প্রতি তাঁর অবিচল ভালোবাসা। আপনাদের উভয়ের এ জীবনে সুখ আছে এবং অশ্রু লোকে মোক্ষ-নজাৎ ! অবশ্য দ্বিতীয়টা যেন একশ' বছর পরে আসে। কারণ ফার্সীতে বলে, দেব আএদ, ছরুস্ত আএদ—ষেটা দেব-এ অর্থাৎ দেব্রিতে আসে সেণাই ছরুস্ত—পরিপাটি—হয়ে আসে।'

আমার উৎসাহের বশ্যায় শহর-ইয়ার ডুবুডুবু। সাদা-মাটা ভাষায় বললেন, 'আপনার মুখে মধু, কানে মধু—এই যেন চিরকাল আপনার কিস্মতে থাকে। আর আপনার শুভেচ্ছা-দোয়ার জন্তু আমার ষা কর্তব্য কাল, শুক্রবার, সেটি করবো। আপনার সলামৎ-কল্যাণের জন্তু মহল্লার মসজিদে শিনী পাঠাবো। নমাজাস্তে জমায়েৎ ধর্মনিষ্ঠজন আপনার আত্মার জন্তু দোয়া করবেন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস কেলে বললুম, 'বে-ফায়দা, বে-কার, ইয়ার। বে-ফায়দা, বেকার। আমার মত পাষণ্ড পাপীর জন্তু শিনী পাঠানো তপ্তকটাহে বিন্দুমাত্র বারিসিঞ্চনতুল্য। তা সে যাক্—আল্লা মেহেরবান, তাঁর কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে মাকের আশা রাখি। এবারে বলুন তো, নমাজ-রোজার প্রতি আপনার কি রকম টান ?'

ছুঁথ করে বললেন, ‘আমার বদ-নসীব। আল্লা আমাকে সেদিকে মতিগতি দেন নি।’

‘কর্তা অনুযোগ করেন না?’

‘একদম না। ভদ্রলোক কক্থনো কাউকে কোনো জিনিস করতে বলেন না—ভালোও না, মন্দও না। এমন কি তাঁর মর্দান বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ তাঁর আচারনিষ্ঠতা নিয়ে অল্পস্বল্প স্নেহসিক্ত কোঁতুকের ইঙ্গিত করলে তিনি শুধু মিটমিটিয়ে হাসেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে তাঁদের ভিতর আলোচনা আরম্ভ হলে তিনি সব-কিছু শোনে মন দিয়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে কক্থনো সে আলোচনায় ষোগ দেওয়াতে পারেন নি। বিশ্বাস করবেন না, আমার সঙ্গে তো সব বিষয়েই কথাবার্তা হয়—আমার সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কখনো ঐ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি, আমি সূত্রপাত করলেও না। এই দেখুন, রববারে কাজে বেরন না বলে ফজরের মমাজ পড়ে প্রথম এক খণ্টা কুরান পড়েন সুর করে ‘কারীদের’ মত। তারপর খানতিনেক ইংরিজি বাংলা অনুবাদ আর একখানা আরবী টীকা নিয়ে আরেক ঘণ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি শব্দের গভীরে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে টোকেন। আমি তাঁকে এক দিন ঐ অধ্যয়নের দিকটা আমার সঙ্গে করতে অনুরোধ জানিয়েছিলুম। তিনি বললেন, “আমি নিজে এতই অল্প জানি যে তোমাকে কম্পিউটলি সাহায্য করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। আমি বরং তোমার জন্ম একজন ভালো মোলানা জোগাড় করে দিচ্ছি।” আমি বললুম, থাক। আপনিই তো কবি ওমর খৈয়ামের একটি চতুর্পদী অনুবাদ করেছেন,

“তব সাথে, প্রিয়ে মরুভূমি গিয়ে

পথ ভুলে তবু মরি,

তোমারে ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া

কি হবে মস্ত স্মরি।” ’

আমি বললুম, 'এটা কি ডাক্তারের উচিত হলো ? পরিপূর্ণ সত্য একমাত্র আল্লার হাতে; আমাদের শুধু চেষ্টা তার কতখানি কাছে আসতে পারি। ডাক্তার কি ভাবছেন, তিনি যে মৌলানা এনে দেবেন কুরান শরীফ সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে ? আমি ডাক্তার হলে বলতুম, "মোস্ট ওয়েল্‌কাম্ !" তারপর এক সঙ্গে পড়তে গিয়ে যদি আপনি দেখতেন যে ব্যাপারটা থ্রী-লেগড্‌ রেস হয়ে যাচ্ছে তখন চিন্তা করতুম, এখন তা হলে কি করা যায় ? তার বদলে মৌলানা এনে লাভ ? তিনি তো প্রথম ঝাড়া পাঁচটি বৎসর আপনাকে ব্যাকরণ কঠিন্ করাবেন, এবং তারপর ? আপনি, ডাক্তার, আমি—আমরা কুরানে যা খুঁজি, মৌলানা তো সেটা খোঁজেন না। তাই দাঁড়াবে :

তুষায় চাহিনু মোরা এক ঘটি জল

মৌলানা এনে দিল আধ খানা বেল !

আপনি ডাক্তারের প্রস্তাব না মেনে বেশ করেছেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা ওঠাতে মনে পড়লো, বেচারী সমস্ত দিন খেটেছে, আপনার সঙ্গে ছু চারটে কথা বললে তার শরীর মন জুড়াবে। আপনি যান না।'

শহর-ইয়ারের সে কী খিলখিল হাসি। হাসতে হাসতে যেন চোখে জল দেখা গেল। বললে, 'ইয়া আল্লা ! আপনি আছেন কোন্ ভবে ? এশার নমাজ সেরে বালিশের উপর ভালো করে মাথাটি রাখার আগেই তো তাঁর আগের থেকে তৈরী পরিপাটি নিজ্রাটি আরম্ভ হয়ে যায়। যেন যন্ত্রটি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাজনা—আলাপ না, বিলম্বিত না, আর যন্ত্রটা বাঁধার ভো কথাই ওঠে না। আর হুণ্ডায় ক'দিন আল্লায় মালুম, শুতে গিয়ে দেখি তিনি নমাজ সেরে জায়নমাজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাটে ওঠবার আর তর সময় নি। আর সে কী ঘুম, কী ঘুম ! অত্যন্ত নিষ্পাপ মানুষ ভিন্ন অশ্র লোক বোধহয় আল্লার কাছ থেকে এ-ইনামটি পায় না।'

আমি শুধালুম, 'এ বাড়িতে আপনার সঙ্গী-সাথী কেউ আছে ?'

অবাক হয়ে বললেন, 'এ বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ।'

বললেন, 'এ বাড়িতে তো আমরা দুজন থাকি। সঙ্গী-সাথী আসবে কোথেকে ?'

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। শুধালুম, 'এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় সাজানো গোছানো ঘর পেরিয়ে এলুম।'

'কেউ থাকে না তো।'

'ঐ যে উইংটা—এল শেপের মত এসে লেগেছে ?'

'সেখানেই বা থাকবে কে ?' ওখানে তো আলোই জ্বালানো হয় না।'

'নিচের তলায়, তেতলায় ?'

'সেগুলোও তো অন্ধকার দেখলেন। কেউ থাকে না উপরে, নিচে। থাকি আমরা দুজনে আর যে ক'টি লোক দেখলেন, আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলুম।'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম, 'এই বিরাট বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক !'

শহু-ইয়ার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার ভয় করছে ? কিন্তু এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়, রহস্য উপস্থাসের 'অভিশপ্ত পুরী'ও নয়। যিনি এ বাড়ি বানিয়েছিলেন—সে ক'য়ুগের কথা আমি জানিনে—তার পরিবার, ইস্টকুটুমগুষ্টি নিয়ে এ বাড়িটাও নাকি যথেষ্ট বড় ছিল না। কিন্তু আমি সত্যি বিশেষ কিছু জানিনে। উনিও যে খুব বেশী কিছু জানেন, তাও তো মনে হয় না। ঔঁকে জিজ্ঞেস করবেন নিঃসঙ্কোচে। এ বংশের, এ বাড়ির কোনো গোপন রহস্য নেই, আপনি নিশ্চিত থাকুন।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'আর উনিই বা বলবেন কি ? সেই খুদায় মালুম ক'শ লোকের পরিবার কমতে কমতে মাত্র এক জনাতে এসে ঠেকলো তারই তো ইতিহাস ? আমার

মনে হয় না, তিনি খুব বেশী কিছু একটা জানেন—আর এ বাবদে তাঁর কোনো কোঁতুহলও নেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কত বিরাট বিরাট পরিবার প্রতিদিন ‘বল ক্লীণ’ ‘আয়ুহীন’ হয়ে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, অতীতে গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে। এতে বৈচিত্র্যই থাকি, আর রোমান্সই বা কোথায়? আর, এ তো শুধু একটা পরিবার। কত জাতকে জাত কত নেশনকে নেশন পৃথিবীর উপর থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে গেছে, তারই বা খবর রাখে কে?’

আমি বললুম, ‘খাক্ এসব দুঃখের কথা। আমি এখানে রোমান্সের সন্ধানে আসি নি সে তো আপনি জানেন। এবারে বেশ মোলায়েম, মধুর, দিল্-চস্প্ কোনো একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করুন। আপনার নামের মিতা বাগদাদের শহর-ইয়ার শহর-জাদী এক হাজার এক রাত্রি গল্প বললেছিলেন। আপনি না হয় হাজারের শেষের এক রাত্রি সেইটে আরম্ভ করুন, বা শেষ করুন।’

শহর-ইয়ার বললেন, ‘যবে থেকে এখানে এসেছেন, সেই থেকে তো আমি সুযোগ খুঁজছি।’

আমি বললুম, ‘মাফ করে দেবেন।’

তিনি বললেন, ‘আপনার দোষ কে বললে? বলছিলুম কি, আমারও রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডের একটি মামুলী সঞ্চয়ন আছে। হু’এক খানা শুনবেন?’

‘নিশ্চয়ই, একশ বার এবং ধরে নিচ্ছি ডাক্তারের বিধিদত্ত যোগনিদ্রা তাতে ব্যাহত হবে না।’

আশ্চর্য, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে শহর-ইয়ার বোতাম টিপে একটা ঢাকনা চিৎ করালেন। তিতরের ক্যাবিনেট বা কুলুঙ্গি থেকে যেন রেল লাইনের উপর দিয়ে গ্লাইড্ করে বেরল একটি রেডিোগ্রাম। এ না হয় বুঝলুম, কিন্তু ঘরের পশ্চিম প্রান্তের এস-পার-উস-পার জোড়া দেয়ালে বিল্ট-ইন্ দেয়ালের স্লাইডিং দরজাগুলো বখন এদিক ওদিক সরতে আরম্ভ করলেন তখন তার ‘মামুলী সঞ্চয়ন’

দেখে—আমি বাঙাল—জীবনে এই দ্বিতীয় বার হাইকোর্ট দেখলুম। দশ বিশ বছর ধরে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড না কিনলে তো এ রকম বিরাট সঞ্চয়ন হয় না। এবং খাস মার্কিন স্টাইলে সেগুলো কার্ড ইনডেক্সিং পদ্ধতিতে সাজানো। গোটা ছয় কার্ডশেলফ্ আমান্ন সামনের টেবিলে রেখে বললেন, ‘ক্যাটালগ দেখতে চান তো এই রইল। আমার নিজের দরকার নেই। আমার মুখস্থ আছে। আরেকটা কথা, এ সঞ্চয়নের অনেক out of print রেকর্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পূর্না রেকর্ড নতুনের দামে কেনা।’ তারপর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই লাগালেন, ‘কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে’—এ গানটা যেন আমাদের উভয় পক্ষের সম্মিলিত ‘বিস্মিল্লা’—‘আল্লার নামে আরম্ভ করি’র মত।

শহর-ইয়ার দেখলুম গান শোনার সময় চোখ বন্ধ করে পাষণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এখানেও সেই বোলপুর পদ্ধতি। ছুটো গানের মাঝখানে দীর্ঘ অবকাশ দেন।

আমাকে শুধোলেন, ‘এবারে আপনার পছন্দ কি?’

আমি আমার কণ্ঠে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করে বললুম, ‘আমি এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শপথ নিয়ে বলছি, আপনার আমার রুচি একই। আমার বাড়িতে আপনি বাছাই করে যে-সব গান বাজিয়েছিলেন তার থেকেই আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে।’

বললেন, ‘মুশকিলে কেললেন! আমি যখন নিতান্ত নিজের জগৎও বাছাই করি তখনো আমার এক যুগ কেটে যায় একটা রেকর্ড বাছাই করতে।’ তারপর রেডি়োগ্রামের দিকে যেতে যেতে আপন মনে বললেন, ‘হুঃ! তারও দাওয়াই বের করেছি। কাল আমি শুয়ে থাকবো পাটরাগীর মত আর এই পীরের সম্ভানকে বলবো রেকর্ড বাজিয়ে গানের সূত্রপাত করে পাপ সঞ্চয়ন করুন তিনি।’

এবার বাজালেন, 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি.'

তার মোহভঙ্গ হওয়ার পর যখন আমার কাছে এসে বসলেন তখন আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনার আত্মার খাতি কি?'

'আরো বুঝিয়ে বলুন।'

'দেহ ছাড়া আছে মানুষের মন, হৃদয়, আত্মা। আপনার বেলা ঐরা পরিতৃপ্ত হন কি পেলে? যেমন মনে করুন সাহিত্যচর্চা, নাট্য দর্শন, সঙ্গীত শ্রবণ,—এমন কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, বা যেমন আপনার স্বামীর বেলা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, কিংবা—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'এবারে বুঝেছি এবং তারপর উত্তর দিতে আমাকে আদর্শেই বাছ-বিচার করতে হবে না, একলহমা চিন্তা করতে হবে না। আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি মাত্র জিনিস।'

আমি বললুম, 'বাস্?'

'বাস্।'

এবারে বাজালেন, 'আমার নয়ন—'

কাজে এলে কেবল শুধালুম, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া আর কি?'

বললেন, 'এর অনেক, অনেক পরে আসে ষ্ঠ-সব জিনিস সেগুলোর মধ্যে একাধিক জিনিস আমাকে আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে, আত্মবিস্মৃত করে, কিন্তু এরা আমার প্রাণরস নয়।'

'সেগুলো কি?'

'যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরচ্চার্টব্যের বড় গল্প, আপনার শব্দনম,—'

আমি বললুম 'ধাক্, ধাক্। এ নামগুলো আর কখনো এক নিশ্বাসে করবেন না। লোকে বলবে, আপনার রসবোধ অদ্ভুত, বিজ্ঞান, গ্রোটেক্স।'

‘বলুক। আমি কুমারস্বামী নই, স্টেলা ক্রামরিশও হতে চাইনে।’

এবারে বাজালেন,

ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে বসলেন। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে উত্তম যন্ত্রে, সমঝদার কর্তৃক সযত্নে বাজানো বে-জথমী রেকর্ড শুনছিলাম—পরম পরিতৃপ্ত ও শান্তি লাভ করে আমি যেন আমার সর্ব দেহ মন কোনো এক মন্দাকিনী ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছি। মুছ কণ্ঠে বললে, ‘আপনার পা টিপে দি?’

আমি সর্পাহতবৎ লক্ষ দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসে বললাম, ‘এ আবার কি?’

দেখি, তাঁর মুখ থেকে সর্বশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আমার দিকে তাকালেন না, দৃষ্টি অর্থাৎ দিকে ফিরিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

আমি তখন আশ্বে আশ্বে বুঝতে পারছি, ভুল আমারই, উত্তেজিত হওয়াটা আমার গাঁইয়া বেকুবী হয়েছে। সেটা ঢাকবার জন্য রেডিযোগ্রামের কাছে গিয়ে না দেখে-চেয়ে আগের রেকর্ডটার উষ্টো পিঠটা বাজাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মেশিনটা এমনই নূতন মডেলের যে কোন্ বোতাম টিপলে কি হয়, কোন স্ক্রল কি কানকশন অনুমান না করতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শহর-ইয়ার বুঝতে পেরে কাছে এসে বললেন—আল্লাকে শুকুর, তাঁর গলায় কণামাত্র উত্তাপ বা অভিমান নেই—‘এখন আমি বাজাই। কাল আপনাকে দেখিয়ে দেব। তা হলে আপনার ইচ্ছেমত যখন খুশী তখন বাজাতে পারবেন। তাই এই ঘরটাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম।’ কথাগুলো শুনে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। এ মেয়ের অনেক গুণ প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি কিন্তু সে যে এত-খানি দয়ালু আর ক্ষমাশীল সেটা লক্ষ্য করে যেমন লজ্জা পেলুম তেমনি আনন্দও হলো যে এমন সদগুণ শুধু যে পৃথিবী থেকে

অস্বর্ধান করে নি তাই নয়, আমারই এক পরিচিতার ভিতর পরিপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে ।

রেকর্ড চালু করে দিয়ে এবারে শহর-ইয়ার চেয়ারে বসলেন । আমি ততক্ষণে বিছানায় আবার লম্বা হয়েছি ।

‘বললুম, ‘শহর-ইয়ার ।’

‘জী ?’

‘আগে, যেখানে বসেছিলেন সেই খানেই এসে বসুন ।’

‘জী’ বলে এসে বসলো ।

আমি বললুম, ‘টিপতে হবে না, হাত বুলিয়ে দিন ।’ এবারে তাঁর মুখ আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ।

আমি বললুম, ‘আমি বড়ই মূর্খ । মনে আছে আপনারা দুজনা যখন বোলপুরে আসেন তখন প্রথম পাঁচ মিনিটের ভিতরেই আমি বলেছিলুম, “এদেশে আমার আত্মজন নেই ?” তখন লক্ষ্য করেছিলুম, আপনার চোখ ছলছল করেছিল । তারপরও দেখুন দেখি, আমি কত বড় বেকুব ।’

‘শহর-ইয়ার হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ‘থাক না । এই সামান্য জিনিস নিয়ে—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমি কত বেকুব দেখুন । আচ্ছা, কাল যদি আমার শক্ত ব্যামো হয়. তা হলে আপনিই তো আমার দেহ মনের সম্পূর্ণ ভার নেবেন এবং নার্স যা করে তার চেয়েও বেশী করবেন । নয় কি ? তবে আজ আমার এত লজ্জা কেন ?’

এবারে শহর-ইয়ার শিশিরবিন্দুটির মত ঝলমল করে উঠলো ।

উঠে এসে আমার মুখের উপর তাঁর হাত রেখে আদরে ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ‘আপনাকে বলি নি আর কথা না বলতে । এই আপনার মুখ বন্ধ করলুম । দেখি, কি করে ফের কথা বলেন । আসলে আপনার যাতে এখানে কোনো অসুবিধা না হয় তাই কাটুকে আমি

আপনার কি কি দরকার, আপনার 'ডেলি কটিন কি এসব অনেক প্রশ্ন
শুধিয়েছিলুম। কথায় কথায় সে বললে, আপনি 'গা' 'টেপাতে
ভালোবাসেন। তাই। এবার সব ভুলে যান।' হাত মুখ থেকে
সরালেন।

বললুম, 'ভুলে গিয়েছি!'

হাসলেন। শুধালেন, 'এবারে কি বাজাব?'

ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপেচুপে
তুমি এলে।'

সঙ্গে সঙ্গে একদম ডেডস্টপ। তারপর আমার হাতের কাছে
খাটের বাজুতে বসে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
তারপর অতি ধীরে ধীরে বললেন, 'এই বারে আবার মনের
অন্ধকারতম কোণেও আর কোনো সন্দেহ রইল না যে আপনার
আমার রুচি এমনই অস্বাভাবিক ধরনের এক যে, আর কেউ জানতে
পারলে বলবে, আমি আপনার অন্ধ ভক্ত বলে আমার রুচি আপনার
কচির কার্বন কপি মাত্র। অথচ কী আর বলবো, এ গান আমাকে
যে রকম আত্মহারা করে দেয় অল্প কোনো গান সে-রকম পারে না।
জানেন, এ গান কিন্তু এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমঝদারদের ভিতরও
অতি, অতি দৈবে-সৈবে গাওয়া হয়। এবং যে ছ'বার শুনেছি সেও
একদম বাইরের অজানা অচেনা গাওয়াইয়া গেয়েছে -অর্থাৎ
সমঝদারদের চেলাচেলীর কেউ না। আমার তো বিশ্বয় বোধ হয়,
রেকর্ড কোম্পানি কোন্ সাহসে এ-গানটি বাছাই করলো! দিছু
বাবুর চাপের দরুন না কি?'

'আর কী অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছেন আপনার গুরুদেব এই গানে।'

'ভুবন-মোহন স্বপন রূপে'—কি বস্তাপচা সমাস এই
'ভুবনমোহন'-টা। কোনো মেয়ের নাম ভুবনমোহিনী শুনলেই তো
আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জগদম্বা, রক্ষাকালী, ক্ষান্তমণি! না?
অথচ এই গানের ঠিক এ জায়গাটায় সমাসটা শুনে নিজের কানটাকে

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই বুলি ঝাড়া, সাতান্ন ঘাটের জল খাওয়া, হেকনিড, ক্লিশে সমাসটি এত মধু ধরে, তার এত বৈভব, এত গৌরব! সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ চোখের তারা দুটি যেন আকাশের দিকে ধাওয়া করে—নইলে সমস্ত ভুবন কিভাবে মোহন হল সেটা দেখবে কি করে অনেকখানি উঁচুতে না উঠে, সেখান থেকে নিচের দিকে, ভুবনের দিকে না তাকিয়ে! আর তার পর? ঐ উর্ধ্বলোক থেকে যখন বিশ্বভুবনের মোহনীয়া রূপ বাহাজ্ঞানশূণ্য হয়ে আশ্বাদন করছি তখন অকস্মাৎ কী নিদারুণ গভীর গহ্বরে পতন! শূন্য.

‘বন্ধ ছিলাম এই জীবনের অন্ধকূপে—

আমার চোখের সামনে তখন কী বীভৎস দৃশ্য ভেসে ওঠে, জানেন! আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোক এখনো বিশ্বাস করে, কোনো কোনো বিরাট ধনের মালিক তার সমস্ত ধন কোনো এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে পুঁতে রেখে যায়, এবং সেটাকে পাহারা দেবার জন্তু চুর-করে আনা একটি আট বছরের শিশুকে জন্মের মত শেষবার তাকে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে, সাজিয়ে-গুঁজিয়ে সেই ধনের পাশে বসিয়ে গুহা-গহ্বর বাইরের থেকে সীল কয়ে দেয়। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সেই ক্ষুদ্র বালকটি যেন অন্ধভাবে ধীরে ধীরে আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করছে। তার পর অল্পনয়-বিনয়, তার পর রোদন, সর্বশেষে তার ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়ে চতুর্দিকের দেয়ালে আঘাতের পর আঘাত—’

আমি বললুম, ‘দয়া করে ক্ষান্ত দিন, আমি আর শুনতে চাইনে।’

বললেন, ‘তবে থাক! ঐ যে ‘বন্ধ ছিলাম অন্ধকূপে’—আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি তাই নয়? অন্ধকূপের দেয়ালে জীবনভর করে ষাচ্ছি মুষ্ঠাঘাত আর আর্তনাদ, “ওগো খোলো খোলো, আমাকে আলোবাতাসে বেরুতে দাও।”

তারপর ‘ভুবনমোহন’ রূপ নিয়ে মৃত্যু এসে দেয় নিষ্কৃতি—সে

‘শ্যামসমান’ মোহনীয়া। এ কী ভাস্কর্য ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যে মৃত্যু বিকট বীভৎস ! সে আসা মাত্রই উর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখি, আকাশে ‘স্তরে স্তরে সন্ধ্যাদীপের প্রদীপ জ্বালা’—কত না নক্ষত্র স্তরে স্তরে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করছে আমাকে অমর্ত্য-লোকের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে, আর পদপ্রান্তে—যে মর্ত্যভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছি সেখানে ঝিল্লি-সঙ্গীতের সঙ্গে পুষ্পবনের গন্ধবৃপের সৌরভ !

আপনাকে শুধোই, আপনি বয়সে বড়, অনেক-কিছু পড়বার, শোনবার সুযোগ পেয়েছেন—এ রকম আরেকথানা গান কেউ কখনো রচতে পেরেছে ?’

আমি বললুম, ‘না, কিন্তু আপনি যে রকম গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, ক’জন বাঙালী পারে সেটা ?’

শহর-ইয়ার অনেকক্ষণ ধরে সমুখপানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। শেষটায় বললেন, ‘ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছিনে। আমি যে গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তার জন্ম আমার হৃদয় ছিল প্রস্তুত। কিন্তু সে প্রস্তুতিটি নির্মিত হল কি প্রকারে ? রবীন্দ্রনাথের গানে গানে। ভিলেজ ইন্ডিয়টেরও হৃদয় আছে কিন্তু সেই আকারহীন পিণ্ড সারাজীবন ধরে একই পিণ্ড থেকে যায়। আমার হৃদয় প্রতি নূতন গানের সামনে নূতন আকার ধরেছে, যেন সে শিল্পীর হাতের কাঁদা। ঐ চিন্ময় গান শুনতে শুনতে আমার হৃদয় যেন ঐ গানেরই মূর্ত্ত্বয় রূপ ধারণ করে একটি মূর্ত্ত্বরূপ ধারণ করে। গানটি যেন শিল্পী। গানের প্রতিটি সুর প্রতিটি শব্দ তার আঙুলের চাপ। সুরে সুরে শব্দে শব্দে অর্থাৎ গান-শিল্পীর আঙুলের চাপে চাপে মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর শুনলুম আরেকটি গান। আগের মূর্ত্তিটি তনুহুর্তেই আবার শিল্পীর হাতে কাঁদাতে পরিবর্তিত হয়েছে। সুরে সুরে শব্দে শব্দে আবার সে এক নবীন মূর্ত্ত্বয় মূর্ত্তিতে পরিণত হলো। এভাবে

আমার হৃদয় কত শত মূর্তিতে পরিণত হয়েছে কত শত গানে গানে। আর এখন ? এখন চেনা গানের ছুটি শব্দ শোনা মাত্রই সম্পূর্ণ মূর্তি আপনার থেকেই তার আকার, তার রূপ নিয়ে নেয়। অথবা কি অল্প তুলনা দিয়ে বলবো, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান যেন ভিন্ন আকারে রঙিন পানপাত্র, আর আমার হৃদয় বর্ণহীন তরল দ্রব্য। ঐ গানের পাত্রে প্রবেশ করে সে নেয় তার আকার, তার রঙ।)

আমার সুখ-ছুঃখের অনুভূতি, আমার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের অশ্রুপাত আনন্দোল্লাস আমার সর্বপ্রকারে সৃষ্টানুভূতি, স্পর্শকাতরতা—সব, সব নির্মাণ করেছে, প্রাণবন্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান : সেই শত শত গানই শিল্পী—শ্রষ্টা !

আমি চুপ করে, কোনো বাধা না দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছিলাম। বললাম, 'আমরা হিন্দু আর মুসলমান মেয়ের হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেই সুবাদে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসঙ্গীতে যে চরমসত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি তো মুসলমান সূফীদের 'অল-হক্', পরম 'সত্য' সত্তাস্বরূপ। এ গানগুলো আরবী বা ফার্সীতে অনুবাদ করলে কারো সাধ্য নেই যে বলতে পারে এগুলো রচেনে এমন এক কবি যে মুসলমান নয়। আপনি মুসলমান। এ গানগুলো শুনে আপনার হৃদয় কি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের চেয়ে বেশী সাড়া দেয় ?'

গভীর ছুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'ঐ খানেই তো ট্র্যাজেডি : কয়েকটি ব্যত্যয় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধর্মসঙ্গীতই আমার বৃকে তুফান তোলে না। তুললে তো আমার সর্ব সমস্তা ঘুচে যেত। আমার দেহমন সেই চরমসত্তার কাছে নিবেদন করে পরমা শান্তি পেতুম। একেই তো বলে ধর্মানুরাগ। স্বরূপ দেখুন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, আল্লা মানুষের রূপ

ধারণ করে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তৎসঙ্গেও
যে ধর্মসঙ্গীতটি আমার হৃদয়ের ভিতর ছরস্তু তুফান তোলে, সেটি—

মেরে তো গিরিধর গোপাল

‘দোসরা তো কোঈ নহী রে—

চরম অসহায় অবস্থায় এ-ভজনটি যে আমি কত সহস্র বার কখনো
চিৎকার করে এই নির্জন বাড়িতে গেয়েছি, কখনো গাড়িতে বসে
গুনগুনিয়ে, আর(সবচেয়ে বেশী) জনসমাজে—বস্তুত সেখানেই আমি
সবচেয়ে বেশী একা, বর্জিতা, অসহায় শক্তিহীনা বলে নিজেকে
অনুভব করি—নিঃশব্দে শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে।’)

* * * *

নিরুম নীরব সে গৃহ, বিরাট ভবন স্তব্ধ, বাইরের ভুবন তন্দ্রামগ্ন।
হয়তো এস্থলে আমার উচিত ছিল সহানুভূতি প্রকাশ করে
জিজ্ঞেস করা শহর-ইয়ার কেন নিজেকে ‘বর্জিতা’ ‘অসহায়’ বলে মনে
করেন। কিন্তু করলুম না।

‘সর্বনাশ!’ হঠাৎ বলে উঠলেন শহর-ইয়ার। ‘তিনটে বেজে
গেছে, আপনি ঘুমুন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ছি ছি. আমার
একেবারে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই!’

ছয়

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা নারী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়েছেন। শহর-ইয়ার ঘুমিয়েছে ক'ঘণ্টা ? তিন ঘণ্টা ? সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী নিশ্চয়ই নয়। সাড়ে সাতটায় খাবার ঘরে চা খেতে এসে দেখি, তার চেহারা যেন শিশিরধোয়া শিউলি ফুলটি। কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি বেশী মেহেরবান।

শহর-ইয়ার ডাক্তারের ব্রেকফাস্টের তদারকি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার লাঞ্চার জ্বালাও উইচ সন্দেশ এটা সেটা ছোট টিফিন-বক্সে সাজাচ্ছে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাজার-সরকারকে হাটের ফিরিস্তি বলে যাচ্ছে। আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি ছুপুরে, রাত্রে কি খাবেন যদি বলেন তবে এই বেলাই হাটের সঙ্গে সেগুলো এসে যাবে।'

আমি বললাম, 'দোহাই আপনার! আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনি তো দেখেছেন, আমি আমার বাড়িতে একেবারে একা। দিনের পর দিন কাঁচা, পাকা—সব বাজারের ফিরিস্তি বানানোর মত একঘেয়ে মেয়েলি কাজ করতে হয় আমাকে। আমি ছুটি চাই।'

কাছে বেরবার পোশাক পরে ডাক্তার এলেন। ভালো ঘুম হয়েছে কি না শুধোলেন, সকালবেলা যে শুধু চা না খেয়ে এটা সেটা খাওয়া উচিত সেটা শোনালেন এবং তারপর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার কপাল, তাছাড়া আর কি বলবো। এশার নমাজ যেই না শেষ হয় অমনি সুলেমান বাদশার ছুই জিন্ আমার ছুই চোখের পাতার উপর তাদের আড়াই'শ মণ ওজন নিয়ে হয় সওয়ার। আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন পাঁচটি

মিনিটও জেগে থাকতে পারিনে। সকালবেলা উঠেই বুকে পাপ হিংসার উদয় হল—আপনারা ছুজনাতে যে মজলিস জমালেন আমি তার হিশ্তেদার হতে পারলুম না বলে।’

আমি বললুম, ‘আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি আপনাকে বার বার মিস্ করেছি?’

ডাক্তার বললেন, ‘কোথায় না সান্ত্বনা পাবো শোকটা আমার আরো উথলে উঠছে।’

শহর-ইয়ার সঙ্কোচের সঙ্গেই ডাক্তারকে বললেন, ‘তাহলে আজ একটু বেলাবেলি বাড়ি ফিরলেই তো ঔর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্তু খানিকক্ষণ সময় পাবে।’

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন, ‘ঠিক বলেছে। আজ তাহলে গাড়ি সাতটার সময়ই পাঠিয়ে দियो।’ আমাকে বললেন, ‘গাড়ি আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফেরত আসবে। আপনি যদি কোথাও যেতে চান তো কোনো অসুবিধে হবে না। এমন কি সাতটার সময় গাড়ি না পাঠাতে পারলেও আমার কোনো হাঙ্গামা হবে না। আমাদের দফতরে একটি হর-ফেন্-মৌলা, সকল-কাজের-কাজী চাপরাসী আছে—জিনিয়াস লোকটা। এই কলকাতা শহরের একশ’ মাইল রেডিওসের ভিতরও যদি কুলে একথানা ট্যাক্সি খালি থাকে তবে সে সেটা পাবেই পাবে—যেন ব্লাড হাউণ্ডের মত সে ট্যাক্সির বদ্-বো গুঁকতে পায়।’

আমি বললুম, ‘আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিই না ; আমার কোনো প্রকারের এন্‌গেজমেন্ট নেই।’

ডাক্তার বললেন, ‘তাহলে তো আরো ভালো। শহর-ইয়ার আপনাকে নিয়ে যাবে এখানে সেখানে, সর্বশেষে তার প্যারা প্যারা বইয়ের দোকানে। আর ইতিমধ্যে যদি ইচ্ছে হয়, তবে আমাদের পাঁচ-পুরুষের জমানো আরবী ফার্সী কেতাব ঘাঁটতে পারেন আমাদের লাইব্রেরিতে—একপাশে আছে, আমার কেনা কিছু

ইংরেজী আর বাঙলা বই। না, না, না। তওবা! ডাক্তারী বই এখানে থাকবে কেন?’

হঠাৎ যেন নূতন অনুপ্রেরণা পেয়ে বললেন, ‘আপনার বাগচী, ভটচায়, চাটুয্যো চেলাদের একদিন ডাকুন না এখানে, কলকাত্তাই মোগলাই খানা খেতে? দোস্ত আশনাদেরও? না, তাহলে বোধ হয় ঠিক জমবে না। আলাদা আলাদা করে দাওয়াৎ করলেই ভালো। কি বলেন আপনি?’

আমি নষ্টামির চোখে বললুম, ‘তার চেয়ে শহর-ইয়ার তাঁর বান্ধবীদের স্মরণ করুন। তাঁদের সঙ্গে ছুঁদগু রসালাপ করে সেই গোলাপজলে শুকনো জানটাকে ভিজিয়ে নেব।’

ডাক্তার যেন সম্মুখে ভূত দেখতে পেয়ে বললেন, ‘ওরে বাপরে! ওর মত জৈলাস আর পঁজেসিভ রমণী অ্যাপনি ত্রিসংসারে পাবেন না বরঞ্চ আপনাকে আমাকে ছুঁজনাকে চিরজন্মের মত ষমের হাতে ছেড়ে দেবে, তবু তার বান্ধবীর হাতে এক মিনিটের তরেও ছাড়বে না—হোক না সে বান্ধবীর বয়েস নব্বুই।’

টেবিল ছেড়ে উঠে বললেন, ‘তাহলে স্মর, খুদা হাফিজ টিল উই মীট এগেন।’

বউয়ের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হেসে বুলেট-বেগে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে ম্লান হাসি হেসে শহর-ইয়ার বললেন, ‘আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন, তিনি আজ সাতটায় ফিরবেন? সময়মত ফেরা, না-ফেরা কি ওঁর এখুঁতেয়ারে? সেটা তো সম্পূর্ণ তাঁর কাজের নেশার হাতে। নেশা না কাটা পর্যন্ত কি মাতাল দাঁড়িয়ে উঠে চলতে পারে? আজ যদি সাতটায় কাটে তো ভালো। আর যদি তার বদলে দশটায় কাটে, তবে সেটা কাটার পর, ঐ মাতালেরই মত আপনার পা ধরে মাক চাইবেন একশ’ বার, হাজার বার। আপনাকে উনি যা শ্রদ্ধা করেন তাতে আপনাকে অবহেলা করা

তার স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু নেশা জিনিসটা নেশা। কাজের নেশা, খোড়ার নেশা, প্রেমের নেশা।’

একটু ভেবে নিয়ে ছুঃখের সুরে বললেন, ‘আমার যদি কোনো একটা নেশা থাকতো তাহলে ‘এই জীবনের অন্ধকূপের’ তলায় দিব্য মাতাল হয়ে পড়ে রইতুম।’

আমি বললুম, ‘আপনি না-হক্ পেসিমিস্ট।’

‘আমি পেসিমিস্ট নই। আমি ইমোশোনাল—বড্ড বেশী স্পর্শকাতর—মাত্রাধিক অনুভূতিশীল। এবং তার জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শত শত গানের শত শত মেশিনের ভিতর দিয়ে আমার কলিজাটাকে এস্পার-উস্পার করে কিমা কিমা বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে এখন আর এসব কথা বলবো না। এ প্রসঙ্গের জন্ম পুণ্যালয় রাত্রে, গান শোনার মাঝে মাঝে। আর ঐ আমার কর্তাটি যে বললেন, আমি জেলাস, আমি পজ্জেসিভ সেটা উনি চিন্তা না করে বলেছেন—’

আমি বললুম, ‘কি বলছেন ! উনি মস্করা করেছেন।’

‘না, উনি চিন্তা না করেও একদম খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। আমি খুব ভালো করেই জানি আমি জেলাস্ এবং আমার হক্ আমার সম্পদ সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন। তবে হ্যাঁ, আমি লড়নেওয়ালী নই। কেউ হামলা করলে আমি তখন আমার চোখের জলের দঙ্গ খুঁজি।’

আমি বললুম, ‘খাঁটি মুসলমান বঙ্গ রমণী! কোথায় গেল মুসলমান পাঠান রমণীর দৃপ্তকণ্ঠের জঙ্গী জবাব ‘না, কবুল না।’?’

গুনগুন করে গান ধরলো, ‘কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে।’ সঙ্গে সঙ্গে দিব্য লাঞ্চার টেবিল সাজানো, ব্রেকফাস্টের জিনিস সরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখা, ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরের তদারকী করা, বাঙলা কথায় পুরো গেরস্তালির কাজ করে যেতে লাগলো—গান-গাওয়াতে কোনো খিরকিচ না লাগিয়ে। বাইরে থেকে যে কেউ

সে-গাওয়া শুনে নিঃসন্দেহে ভাবতো, চোখ বন্ধ করে প্রাণমন ঢেলে-তন্ময় হয়ে কেউ গানটি গাইছে।

শেষ হলে আমি বললুম, 'আমার মতের মূল্য অনেকেই দেয়, তাই বলছি, আপনি বড় সুন্দর গাইতে পারেন। কিন্তু বাইরে, মজলিসে কোথাও গেয়েছেন বলে শুনি নি, কাগজেও দেখি নি।'

বললো, 'একই বিষয়বস্তু কেউ লেখচাররূপে সভাস্থলে প্রকাশ করে, অথো ঘরের ভিতর পাঁচকথার মাঝখানে বলে। আমার গান—যদি সত্যি সেটা গানের সুরে ওঠে—দ্বিতীয় পর্যায়ে। বাড়িতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এ গান তার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সভাস্থলে গাইলে নিশ্চয়ই আমার গান আড়ষ্ট শূঙ্ক কাষ্ঠ হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে একটি গানের মাঝখান থেকে গেয়ে উঠলেন,

‘সভায় তোমার ও কেহ নয়

ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়

যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে

রয়েছে এক পাশে।’

এ গানের ঘরের প্রণয়ীও নেই। নিতান্ত আমার কাজকর্মের নিরালা দিনের, নির্জন অবসরের এক পাশে পড়ে থেকে বেচারী আমাকে সঙ্গ দেয়।’

‘নজরুল ইসলামের গানে শখ নেই? আর কিছু না হোক, মুসলমান হিসেবে, অস্তিত্ত যেগুলোর যোগ আমাদের ধর্মের সঙ্গে আছে?’

‘আছে কিন্তু মুশকিল স্বরলিপি জ্বোগাড় করা। আর যে-ভাবে সচরাচর গাওয়া হয় সেটা আমার পছন্দ নয়। কুক্ষণে তিনি ‘বিদ্রোহী’ রচেছিলেন। গাওয়াইয়ারা এখন তাঁর শাস্ত লিরিকগানেও ঐ বিদ্রোহী সুর লাগান! বিলকুল বেথাপ্লা। এমন কি বিশ্বাস করবেন না, তাঁর ‘ঝিঙে ফুলের’ মত লক্ষে গোটেক, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের ‘নাজুক’ কবিতাটিও আবৃত্তি করা হয় ‘মোশন’ চুকিয়ে জোশ

লাগিয়ে ! বদখদ বরবাদ ! চলুন, আমার কাজ উপাস্ত এখানে খতম ।
বাজার আসুক ; তখন দোসরা কিস্তি ।’

আমি বেরুতে বেরুতে বললুম, ‘একটি রেওয়াজ আমি পৃথিবীর
সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি । স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অল্প তৃতীয় প্রাণী যে-বাড়িতে
নেই, এবং স্বামী লাঞ্চ খেতে বাড়ি আসেন না, সেখানে স্ত্রী লাঞ্চ
রাঁধে না । কি খায় অবশ্য দেশভেদে খাও ভেদ । জানিনে লাঞ্ের
পরিবর্তে আপনি কি খান । বিশ্বাস করুন আমি সেই খেয়েই সন্তুষ্ট
হব । সেক’ আমার জন্ত আসমান জমীন স্থানচ্যুত করে আগা
খানের খাওয়ার মত লাঞ্চ তৈরী করতে হবে না ।’

চলতে চলতে বললেন, ‘আপনার লোক দিলজান শেখও বলছিল
আপনি লাঞ্ের তোয়াক্কা করেন না । ডিনারও নাকি প্রায়ই
মীটসেক্ থেকে বের করে রাত ছপুয়ে খান । কিন্তু এ বাড়িতে
আমি বে-চারী, নিরুপায় । ইসলামী অনুশাসন অনুসারে এ বাড়িতে
শতাধিক বর্ষ ধরে অলঙ্ঘ্য ঐতিহ্য, প্রভু ভৃত্য খাবেন একই খানা ।
চাকররা সৰু চাল খেতে পছন্দ করে না এই আর্জী পেশ করায় কৰ্তা
সৰু চাল ছেড়ে দিয়ে মোটা ধরেছেন ! আমার কাছ থেকে পয়সা
নিয়ে ওরা মোড় থেকে মাঝেমাঝে ফুচকা নিয়ে আসে—জানেন তো
কি রকম ধুলোবালির সঙ্গে মিলে মিশে সে-ফুচার ‘মাটির শরীর’ ।
কোনো দিন যদি দৈবাৎ ওঁর চোখের সামনে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে
উল্লাসে লক্ষ দিয়ে ঠোঙা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চিৎকার, “দে, দে আমায়
দে । একা একা খাস নি । গুনাহ্ হবে ।” শুনুন, মশাই, শরিয়তের
অভিনব ব্যাখ্যা ! চাকরকে না দিয়ে মুনিব যদি একা একা খুশ্ খানা
খায় তবে সেটা অশোভন (মকরুহ্) বলা হয়েছে, গুনা (পাপ) কি
না জানিনে, কিন্তু মুনিবকে বাদ দিয়ে চাকর যদি—এবং সেটা
মুনিবেরই পয়সায়—মামুলীই কিছু একটা খায় তবে নাকি সেটা
চাকরের গুনাহ্ ! আবার ফুচকা খেতে খেতে গস্তীর কঠে সহপদশ
বিতরণ : “ত্বাখ্, রাস্তার ফুচকা খাসনি । জামটার্ম থাকে । অসুখ-

বিশ্ময় করে।” তারপর আবার বিড়বিড় করে বলেন, “বাড়ির ফুচকা কিন্তু অখাদ্য বস্তু।” এই তো এখানকার হাল। অতএব আপনি খান আর না খান, আমি খাই আর না খাই, ছুপুরের রান্না হবে ঠিক ঠিক। কাল সন্ধ্যায় দেখলেন না, ঘরের পর ঘর সাজানো—জনপ্রাণী নেই ? এটাও ঐতিহ্য !’

আমি বললুম, ‘আরেকটা কথা। আজ বিকেলে সাড়ে ছ’টায় আপনাকে নিয়ে আমার প্রয়োজন। অবশ্য আপনার যদি ঐ সময় অল্প কোনো কাজ না থাকে।’

‘কি ব্যাপার ? আমার তো ভয় করছে।’

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ‘রক্তিতর ভয়ের কারণ নেই। বঙ্গবালাদের—অবশ্য সবই হিন্দু—‘লাজুক’ তবিত্ত বাবদে আমি ওয়াকিফ-হাল।’

উনি গান গাইতে গাইতে বিদায় নিলেন,

‘জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীকু প্রেম, হায় রে।’

ছুপুরে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শহর-ইয়ার বললেন, ‘ক বার যে গিয়েছি আপনার বন্ধ দরজার কাছে ! দোরে কান পেতে না দেখেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আপনি পড়ছেন। তাই দোরে টোকা দি নি।’

আমি বললুম, ‘সর্বনাশ করেছেন। আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু-একটা না পড়ে থাকতে পারিনি। আর সর্বক্ষণ পড়ি বলে যে কোনো সময়ে যত ঘণ্টার জঙ্ঘ চান আমি সে-পড়া মূলতুবি রাখতে পারি। তাই আপনি যে সময় খুশী যত ঘণ্টার তরে খুশী আমার কাছে এসে গল্প করতে পারেন, রেকর্ড বাজাতে পারেন—যা খুশী তাই। ও ! অত প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কেন ? বিস্তর পড়ি বলে ? হায়, হায়, হায় ! জানেন, মাথা খাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে

ব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য একটু আধটু হয়তো মাঝে-মাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি সেটা আমার নেশা, নেশা, নেশা। একেবারে নেশার মত। তাতালকে শুধোবেন, সে বলবে, প্রথম দু তিন পাস্তুর তার দহমনের জড়তা কাটে, সে সময় মনে ফুটিও লাগে কিন্তু তার পর যে সে খেয়ে যায় সেটা নিতান্তই মেকানিকেল। সর্বশেষে সে নিস্তেজ হয়ে আসে, তবু খাওয়া বন্ধ করে না। তাই তো সেটার নাম নেশা। যতক্ষণ মদ তাকে আনন্দ দিচ্ছে ততক্ষণ তো সেটা কাজের জিনিস—খুব বেশী গালাগাল দিতে চাইলে হয়তো লাভে পারেন বিলাসিতা—কিন্তু যখন সেটা আর আনন্দ না দিয়ে থাকে নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায় তখন সেটা রীতিমত নিন্দনীয় নেশা। আমার পড়া ঐ ধরনের। আপনাকে চোখ থেকে পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। আরেক দিন না হয় আরো গভীরে গিয়ে আপনাকে বোঝাবো। আপনিও যদি না বোঝেন তবে আমার শেষ নোঙর ভাঙলো।

কিন্তু আপনার কর্তার বেলা ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রথমত তাঁর বয়েস কম বলে এখনো বহু বৎসর ধরে তাঁকে নানা রকম তথ্য ও তত্ত্ব সঞ্চয় করে জ্ঞানবৈভব বাড়াতে হবে এবং দ্বিতীয়ত তারই দাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন—জর্মনরা বলে ভেন্টআনশাউউঙ, গড়ে উঠবে। সব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার আদর্শ এই জীবনদর্শন নির্মাণ করা। কিন্তু আজ এখানেই ফুলস্টপ না, ফুলস্ট স্টপ।’

শহর-ইয়ার বললেন, ‘আচ্ছা। এখনকার মত না হয় বিশ্বাসই করে নিলুম।’

বললুম, ‘শাবাশ! এই জন্মই তো আপনাকে এত ভালোবাসি। কার্কার্কি অত্যন্তম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেটা সময়মত, কিছু সময়ের জন্ম, লতুবী রাখার মত সহিষ্ণুতা আর বদাশুতা যেন দিলের ভিতর

ধাকে । গাঁয়ের মেয়েরা অবশ্য কৌদল মূলতুবী রাখে অন্য কারণে সংসারের কাজে ফিরে যেতে হবে বলে দুই লড়নেওয়ালী তখন জিহ্বাস্ত্র সংবরণ করে অদৃশ্য কাগজকালিতে টেম্পারারি আর্মিস্টিস সহ করে ; এবং তার প্রতীক, দুজন দুই শূণ্য ধামা ধপ্ করে মাটিতে উৎ করে কৌদলটা 'ধামাচাপা' দিয়ে রেখে যার যার ঘরে চলে যায় কাজকর্ম শেষ হলে উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে ফিরে এসে ধামা দুটো তুবে নিয়ে কৌদলকে দেয় নিষ্কৃতি । তারপর ফিন্ শুরুসে ।

কিন্তু, মাদাম, বললে পেত্যয় যাবেন না, এই যে রেজালা নামক সরেস জিনিসটি খাচ্ছি, এটা যে তৈরী করেছে সে মাইকেল এঞ্জেলো—রান্নার কলাসৃষ্টিতে ।'

মাদাম আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বাড়ি সন্ধ্যা দিক দিয়ে আমার অনেক বেশী ভালো লাগে । সেখানে আমার দেহমনে এক অপূর্ব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসে । ঐ একটি মাড় জায়গা যেখানে আল্লাকে শুক্ দেবার জন্য তসবী জপতে ইস্তে করে ।'

আমি বললুম, 'হুঃ! দিলজান শেখের রান্না—তাঁও বোলপুর হাতে যা পাওয়া যায় সেই আড়াইখানা শুকনো পটোল, চিমসে উচ্ছে আর সজনের ডাঁটা, সুপিচ্ছিল কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত তদাভাবে বাড়িপোস্ত দিয়ে, কুকুরের জিভের মত যে রুটিকে টেনে-টেনে খাবার টেবিলের এসপার-ওসপার করা যায় তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট তারপর শোবার জন্য শক্ত কাঠের তক্তপোশ এবং বাধরুমে কলের জল নেই । এমন কি সেই আত্মিযুগের গ্রামোফোনটা বাজাতে গেলে দম দিতে দিতে হঠাৎ বেবাক হাতখানা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায় । রাত্রে, হয় এমনি নিশুতি নিঝঝুম যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, নয় শেয়ালের কনসার্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা—নাগাড়ে ।'

আবার বলি, 'হুঃ! রমণীর রুচি যে কত রিদকুটে, বদখৎ হতে পারে ঐই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ !'

হঠাৎ মুখ তুলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখি, শহূর্-ইয়ারের ছ' গাল বেয়ে জল পড়ছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে মাক চাইতে গিয়ে কি যে অসংলগ্ন কথা তোতলাতে তোতলাতে বলেছিলুম সেটা তখনো নিজেই বুঝতে পারি নি এবং এখন স্মরণে আনা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু আল্লার কী আপন হাতে গড়া এই মেয়ে শহূর্-ইয়ার! আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব কব্জায় এনে ছ' চারটি কথা দিয়ে আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে দিল। বললে, আমার রসিকতাবোধ ইদানীং বড্ড কমে গেছে—কতকগুলো আকস্মিক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায়। এই যা সব এখুনি বললেন, তার সব কটি কথা সত্য, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা, আমার কাছে আরো মিথ্যা। যদি সত্যই হবে, তবে আমি আপনার বাড়িতে প্রতিবার আসা মাত্রই এত প্রাণভরা আনন্দে আমার দিকে এগিয়ে আসেন কেন, আপনার বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসেন না আপনার মহাবৎ, আপনার প্যার আপনার হাঁক-ডাক, চেলাচেলিতে? কই, আপনি যে সব অনটন অসুবিধার লিস্টি দিলেন তার ছুঁঁবনায় তো ক্ষণতরেও আপনাকে জরুজ্ঞন করতে দেখি নি। মনে আছে, একদিন রুটি খারাপ ছিল বলে টোস্টগুলো মিইয়ে যায়—কই, আপনি তো একবারও আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নি বা ব্যতিব্যস্ত হয় উঠেন নি। তবে আজ হঠাৎ এসব কেন? দেখুন সিতারা সাহেব—'

এবারে আমি বিস্ময়ের যেন বিজলি শকু খেয়ে শুধালুম, 'আমার ডাক নামটা আপনাকে বললে কে?'

মোনালিজার মত রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলি এটাও ঐ তর্কের মত উপস্থিত ধামাচাপা দিয়ে মূলতুবী রাখা যাক, তবে আপনার আপত্তি আছে?'

আমি বললুম, 'হরগিজ নহী। যে কোনো একদিন বললেই হলো।'

এতক্ষণ খাচ্ছিল বলে শহূর্-ইয়ার কোনো গান ধরতে পারে নি
সে-কর্ম সমাধান হতেই সিতারা (তারা) তাকে টুইয়ে দিল ঐ কঃ
ফিরে যেতে । শুরু করলো,

নিবিড় ঘন আঁধারে

জ্বলিছে ধ্রুবতারা

মন রে মোর পাথারে

হোস নে দিশেহারা

অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে গাইল । বুঝলুম, এটি তার
বিশেষ প্রিয় গান ।

আমি বললুম, ‘ভুলবেন না অথগু সৌভাগ্যবতী শহূর্-ইয়ার, এই
গানের মূল মন্ত্রটি—‘শোভন এই ভুবনে রাখিয়ে ভালোবাসা’ । আর
কাজের কথা শুনুন—অবশ্য গানের মূল মন্ত্রটি সর্ব কাজের চেয়েও
মহান—আজ সাড়ে ছ’টার সময় আপনার সঙ্গে আমার রাঁদেভু—
কয়েক মিনিট আগে এলেই ভালো এবং বাইরে যাবার জন্তু তৈরী
হয়ে আসবেন, প্লীজ । পটের বীবী সাজতে পারেন, নাও পারেন
সাজবার সময়কার মুড্‌মাস্কিক । আচ্ছা, গাড়িটা পাওয়া যাবে
তো ?’

‘নিশ্চয়ই । কিন্তু বলুন তো, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ?’

‘এমনই সাদামাটা সর্ব রোমান্‌স্‌ বিবর্জিত স্থলে যে সেটা সাতা
বলার মত নয় । কাজেই সর্ব সারপ্রাইজের ভয়-ভরসা বর্জন করে
দিন এই বেলাই ।’

শহূর্-ইয়ার

নিশিদিন ভরসা রাখিস

ওরে মন হবেই হবে

গুনগুন করতে করতে চলে গেল ।

সাত

হা ।। জির্ !' 'হা'টার উচ্চারণ আরবী কায়দায় যতদূর সম্ভব দীর্ঘ এবং জির্ টি সেই অনুপাতে হ্রস্বের চেয়েও হ্রস্ব ।

আমি বললুম, 'এ কি ! এ যে একেবারে' রাজরাজেশ্বরীর বেশে সাজেছো ?'

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলো, "তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমের রতনে -
কেয়ুরে কঙ্কণে কঙ্কুমে চন্দনে ॥" '

পূর্বেই বলেছি, পুরোপাকা বঙ্গ হিন্দু-রমণীর বেশ পরলেও শহুরে-ইয়ারের সঙ্গে হিন্দু রমণীর কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যায় । উঁহ ! মাথায় এক ধাবড়া সিঁদুর বসিয়ে দিলেও সে পার্থক্য ঘোচবার নয় । এতদিন তাকে প্রতিবারেই দেখেছি সাদামাটা বেশে ; আজকের এ বেশেও সেই পার্থক্য, বরঞ্চ একটু বেশী ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'কেন ? আমার কি সাজতে মাপ যায় না ?'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অনেক বেশী ঘন ঘন যাওয়া উচিত । সাজসজ্জা করলে সকলেরই যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় তা নয় । এবং কারো কারো বেলা মনে হয় এ যেন ভিন্ন, অচেনা জন । আপনার বেলা ছোটোর একটাও নয় । আর সব চেয়ে বড় কথা আপনি আপনার সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রকম সম্পূর্ণ অচেতন থেকে সেটিকে অবহেলে দায়িত্ব করেন, আপনার সাজসজ্জা প্রসাধনও আপনি ঠিক সেই ভাবে দেখে তুলে নিয়েছেন । মনে হয়, আপনি এই বেশেই নিত্যদিনের গৃহকর্ম করেন, স্নানসবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যা সমাধান করেন । ষে-কথাগুলো বললুম তার সব কটি আমি শেষ-বিচারের দিনের যুগ্মিকর্তার সামনে, ডাক পড়া মাত্র, আপনার মত হা ।। জির্ বলে

কসম খেয়ে বলতে রাজি আছি—অবশ্য যদি এই বেলা এই বো
আপনি আপনার একটি ছবি তুলিয়ে দেন—কারণ ‘তসবিরে জান’
সে সময় ‘দর্-বগল’ না হলে চলবে না।’

‘সে আবার কি ? মনে হচ্ছে ফার্সী। বুলিয়ে বলুন।’

আমি বললুম, ‘সমূহ মুশকিলে আমাকে ফাঁসালেন। দোহা
শুনেছি গুরুর কাছে—ওস্তাদ বললুম না, কারণ তিনি ছিলেন ‘কম্বোজে
কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং জানতেন উৎকৃষ্টতম ফার্সী—আমার বয়ে
যখন তেরো চোদ্দো। তারপর এটি আমি অল্প কারো মুখে শুনি নি
ছাপাতেও দেখি নি। কাজেই আমার পাঠে ছন্দপতন ও যাবতী
গলদ থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থ হচ্ছে এই, শেষ বিচারের দি
(দর্ কিয়ামৎ) প্রত্যেককেই (হর্ কস্) সে সমস্ত জীবন ধরে যা
পাপ কর্ম, পুণ্য কর্ম করেছে এবং করে নি তারই একটি পুরো রিপোর্ট
(আমল-নামা বা শুধু নামা বা নাম) আপন আপন হাতে ধরে
(দস্ত্ গীরদ্) দাঁড়াবে। আমিও নিজে (মন্ নীজ) হাজির হ
(হাজির মীশওম) ‘বগলদাবায় (দর্-বগল্) প্রিয়র তসবিরা
(তসবিরে জান’) নিয়ে।

‘অর্থাৎ ঐ লোকটি সেই শেষ বিচারের সর্বমান্ত পাঠ-পাঁক
বিচারপতিকে বলবে, ‘অন্তেরা আপন আপন কৃতকর্মের পুরো বয়ানে
‘আমল-নামা’ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু ছজুর, আমার কোন
আমল-নামা নেই। তার কারণও সাতিশয় সরল। আমি সম
জীবন ধরে আর-কিছু করি নি—জীবনভর শুধু আমার প্রিয়র ছা
‘ঐকেছি আর’ দেখেছি, ‘দেখেছি আর’ ঐকেছি। সেইটিই আমার
‘কৃতকর্মের ‘আমল-নামা’। এই নিন, ছজুর, ‘দেখে নিন!’ তা
বলছিলুম, অষ্ট-অলঙ্কার-পরা আপনার এখনকার একটি ছবি আমা
দিন। নইলে শেষ-বিচারের আদালতে জেরার চোটে আমার জেরবা
হয়ে যাবে—একসিবিট নাশ্বর ওয়ান এণ্ড লাস্ট না থাকলে।’

শহুর্-ইয়ার বললেন, ‘আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়ি

যই মৌলবী-মৌলানারা আসতেন। তখন এরকম কল্পনাভীত, সম্ভব অসম্ভব প্রেমের দোহা অনেকগুলো শুনেছি। এ সবতে তিশয়োক্তি নিশ্চয়ই, তবু কেমন যেন মনে হয়, ঐ যুগে ওরা বোধহয় মাদের তুলনায় প্রেমের মূল্য দিত ঢের ঢের বেশী। আচ্ছা, সে বাদ দিয়ে আপনার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্তু পরামর্শ দিই : 'পনি-আমার ছবি আঁকুন !'

আমি ভীত রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, 'আর হঠাৎ যদি 'শব্দনম্' এসে ড় ছবিটা দেখে ? ও তো আসবে অতি অবশ্যই। ও যাবার ায় যখন বলে গিয়েছিল সে ফিরে আসছে তখন সে আসবে নিশ্চয়, : নিশ্চয়।'

তাচ্ছিল্যভরে শহুর-ইয়ার বললে, 'এখন এলে আপনি তাকে নতেই পারবেন না।'

রীতিমত তাজ্জব বনে বললুম, 'আপনার মুখে এই কথা ! পনার অনুভূতির কলিজাটা না রবিঠাকুরের, কিমা-মেশিনে তুলো- জ্বা হয়ে গিয়েছে ! শব্দনের অনন্ত তারুণ্য তো কখনো পরিবর্তিত ত পারে না—তাকে তো আমি গড়েছি আমার জিগর কলিজার ন্দু বিন্দু খুন দিয়ে এবং সে নির্মাণ বহু শত যোজন পেরিয়ে এখনো াগাভমে অগ্রগামী। আচ্ছা, এ যুক্তিটা না হয় বাদই দিন। ধরুন, কশ' বছর পরে নিতাস্ত দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ, কিংবা কোনো ছোকরা িব্রেরি-এসিসটেণ্ট 'শব্দনম্' সম্বন্ধে লিখিত আমার আর পাঁচখানা াণ্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানি পড়লো, নিতাস্ত অনিচ্ছায়, ক্রমাত্র বইটা ক্যাটারলগের কোন্ কোঠে পড়বে সেইটে ঠাহর করার ঞ। একশ' বছর পরে পড়ছে বলে কি আপনার ধারণা শব্দনম্ খন একশ' বছর বয়সের জরাজীর্ণা বৃদ্ধা হয়ে সে ছোকরার সামনে বিভূর্ত হবে ?'

রসভঙ্গ করে ড্রাইভার বিনয়নত্র কণ্ঠে শুধলো, 'সরকার, যাবো াথায় ?'

‘সাহেব যেখানে কাজ করেন।’

ককিয়ে উঠে শহুর-ইয়ার বললে, ‘ঐ রসকসহীন জায়গায় যাবার জন্ম আমি এই বৈশভূষা সর্বাঙ্গে চড়ালুম! হু আমার কপাল। এ কপাল কি আর কখনো বদলাবে না? আপনার সঙ্গ পেয়েও না? আরেকটু হলে কেঁদে ফেলতো আর কি!’

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, ‘আপনি আমাদের ইসলামের কিছুই জানেন না। তাহলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন একটি ‘হুদীস’ জ্ঞানসঞ্চয় এবং ‘পুণালাভ দুইই হুসে। অবশ্য আমি ঘটনাটি শব্দে শব্দে টায় টায় বলতে পারবো না, কিন্তু প্রতিপাত্ত বিষয় বর্ণনে যে কোনো প্রকারে উনিশ-বিশ হবে তার জিন্দাদারী আমি নিচ্ছি— যদিও ‘আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ (‘ওয়াল্লাহু আ’লম!’)।’

একদা এক ‘অভিযানান্তে আল্লার পয়গম্বর যখন তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ তাঁদের বাসভূমি মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দলের এক আরব যুবা বড় অসহিষ্ণুভাবে তার উটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সঙ্কলের আগে আগে যাবার চেষ্টা করছে আরবরা বড়ই সাম্যবাদী—এরকম অবস্থায় দলের মুরুবিবরাই যে দলের পুরোভাগে থাকবেন এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তৎসত্ত্বেও ঐ যুবাটির অসহিষ্ণু হজরতের চোখে পড়ল। তিনি তাঁর পাশের উট-সওয়ারকে শুধোলেন, “ব্যাপার কি? লোকটার অত তাড় কিসের?” সে বললে, “হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ! এ-যুবা অতি সম্প্রতি বিবাহ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে চায়।” হজরৎ বললেন, “আচ্ছা, ওকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো।” হজরতের আহ্বান শুনে যুবা শ্লাঘা অনুভব করে তাঁর কাছে এল। হজরৎ বললেন, “বৎস, শোনো। তুমি যদি সঙ্কলের পয়লা পয়লা উট চালিয়ে সঙ্কলের পয়লা আগন বাড়িতে পৌঁছে যাও তবে খুব সুস্থব দেখতে পাবে তোমার নববিবাহিতা বধু এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতো না বলে বিরহিণী হয়তো তার আটপৌরে

অতিশয় 'মামুলী বৈশভূষা' অথহে অবহেলায় পরিধান করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। সে দৃশ্য তোমার 'মনঃপ্ত' নাও হতে পারে, তুমি পুলকিত নাও হতে পারো। পক্ষান্তরে তুমি যদি দলের সকলের 'পিছনে থাকো তবে যে-মুহুর্তে মদিনাবাসী দলের পুরোভাগ দেখতে পাবে তন্মুহুর্তেই শহরের সর্বত্র 'আনন্দ-দামামা বেজে উঠবে, এবং যেহেতু তুমি দলের সর্বপশ্চাতে আছ তাই বাড়ি পৌঁছতে তোমার সময় লাগবে বেশী—ইতিমধ্যে তোমার 'বধু' সেই অবসরে 'উত্তম প্রসাধন করে, 'উৎকৃষ্ট' বৈশভূষা পরিধান করে তোমাকে 'প্রসন্ন অভ্যর্থনা' জানাবার জন্ত 'প্রফুল্ল বদনে তোমার জন্ত অপেক্ষা করার সুযোগ পাবে।" তাই বলি, শহর-ইয়ার, আপনার 'সর্বোৎকৃষ্ট' অলঙ্কার, আপনার 'মহত্তম' 'মুছহাস্ত' কার জন্ত? অপরিচিতজনের জন্ত, পশুগামী জনতার জন্ত?—সেখানেও মনে রাখবেন 'বাস্তাঘাটে' 'স্বৈচ্ছায়' 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' 'অলঙ্কার' 'প্রদর্শন' ইসলামে নিন্দনীয়। অতএব আপনার বৈশভূষা নিশ্চয়ই অপরিচিতজনের জন্তে নয়। আপনি যখনই স্বামীর কাছে যাবেন তখন আপনার বৈশভূষা হবে রাজরাণীর মত, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন যেন তিনিও আসমুদ্রাহিমাচল ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ, এবং তিনিও যখন আপনার কাছে আসবেন তখন আসবেন সম্রাটের বেশে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনি রাজরাজেশ্বরী।

হঠাৎ গলা নামিয়ে ঘরোয়া সুরে বললুম, 'জানেন, শহর-ইয়ার, তাই আমার তাজ্জব লাগে যখন দেখি আমাদের মেয়েরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—বাড়িতে 'ট্যানা' পরে 'মেলছে'র মত স্বামীর চোখের সামনে আনাগোনা করছে, আর যত পাউডার যত অলঙ্কার বাড়ি থেকে বেরবার সময়... যেন ঐ হতভাগা স্বামীটাই এসেছে বানের জলে ভেসে।'

শহর-ইয়ার 'চিন্তিত' হয়ে শুধোলেন, 'আমি কি বাড়িতে সত্যি মেলছে'র মত থাকি।'

আমি হেসে বললুম, 'আদপেই না। আপনি জেনে-না-জেনে সৌন্দর্যের এতই কদর দেন যে আপনার পক্ষে 'অসুন্দর বেশ পরা অসম্ভব,' অসুন্দর আচরণ অসম্ভব,' অসুন্দর—'

'বাস্, বাস্, হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে সাজতে গুজতে কি রকম যেন শরম শরম লাগে। 'লোকে কি ভাববে?'

আমি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'আমার যত রাগ তো ঠিক ঐখানেই। 'লোক' বলতে আপনি কাদের মীন করছেন? চাকর-বাকর এবং যে ছ'একটা উটকো লোক যারা বিন্-নোটেশে কাজে-অকাজে বাড়িতে আসে। আমার প্রশ্ন, আপনি তাদের বিয়ে করেছেন, না ডাক্তারকে? তারা কি ভাবলো, আপোসে কি বলাবলি করলো তাতে কি যায় আসে? আচ্ছা, এখন তবে এ আলোচনা আজ থাক। আমরা মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। আপনি ড্রাইভারকে বলুন না, সে যেন ডাক্তারকে গিয়ে বলে আমি গাড়িতে তাঁর জন্তু অপেক্ষা করছি।' ড্রাইভার চলে গেলে বললুম, 'এইবারে দেখি, আমার সোনার চাঁদটি কি করেন। শহর-ইয়ার, আমিও একদা রিসার্চ করেছি এবং কেউ এসে এভাবে উৎপাত করলে বড্ডই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু আমার আপন অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সেটা পাঁচ সাত মিনিটের ভিতরই অস্তর্ধান করে। বিশেষ করে যারা ডিস্টার্ব করলো তারা যদি তার আপন জন হয়—যাদের সঙ্গলাভে সে আনন্দ পায়। ছ'পাঁচ মিনিট তাদের সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই রিসার্চের ভানুমতী কেটে যায়।'

জোর পাঁচ মিনিট, দেখি ডাক্তার টাট্টুঘোড়ার মত ছুটে আসছেন। শহর-ইয়ারকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের ভিতরকার কী এক উত্তেজনা সখ-কিছু ছাপিয়ে যেন উপচে পড়ছে। মোশনগানের চাইতেও দ্রুততর বেগে আমাকে বলে যেতে লাগলেন, 'ওঃ! আমার কিস্যৎটা আজ সত্যই বড় ভালো, বড্ডই ভালো। এই দশ মিনিট আগে আমি আপনাদের ফোন করে

পেল্লম না। মহা বিপদে পড়লুম, করি কি? হয়েছে কি জানেন, আমার এক ভেরি ডিয়ার ফেণ্ড বউকে নিয়ে দিল্লী থেকে এসেছে। কাল ভোরের প্লেনে ফের দিল্লী চলে যাবে। আপনাকে সে চেনে, দিল্লীতে আপনার লেকচার শুনেছে, ছ' একবার আপনার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তাও বলেছে। আপনার গ্রেট এড্‌মায়ারার। আর তার বউ যখন এসেছে তখন শহর-ইয়ারকে নিয়ে যেতে হয়, নইলে বড় অভদ্রতা হয়। দিল্লীর খানদানী ঘরের ছেলে—ভাববে কলকাত্তার লোক 'তমীজ' 'তহজীব' কিছুই জানে না। আপনারা এসে আমায় বাঁচালেন। চলুন, চলুন, আর দেরি না। আমি ওকে কথা দিয়েছি আপনাদের নিয়ে 'গ্রেট ঈস্টার্নে সাতটা সাড়ে সাতটার ভিতর পৌঁছব। আঃ! বাঁচলুম, আল্লার কী মেহেরবানী!

আমি বললুম, 'এত নমাজ রোজা করার পর আল্লা আপনাকে মেহেরবানী দেখাবে না তো দেখাবে কাকে?' ওদিকে গাড়ির ভিতরকার আলো-অন্ধকারে না দেখেও যেন গাঢ় অন্ধকারেই বিদ্যালেক্ষার মত উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে দেখলুম, শহর-ইয়ারের 'গ্রেট ঈস্টার্নে' যাবার উৎসাহ 'ক্রীজিং পয়েন্টেরও নিচে; আমারও তদৎ। কিন্তু উপায় কি? ডাক্তারের বাবলিং সফেন উত্তেজনা, তার অবিমিশ্র আনন্দ বরবাদ করতে পারে নিতাস্ত পাষণ্ড জন। তত্পরি বেচারী ডাক্তার তো বারো মাস শুধু লেবরেটরি আর বাড়ি, এরই ভিতর মাকু চালায়। করুক না বেচারী একটুখানি ফুটি! আমরা ছুঁজনা না হয় 'সারেসী' 'বলার' সঙ্গতই দেব।

হোটেলের সব ক'জন 'রেসেপসনিস্ট' ওরকম 'লক্ষ' দিয়ে উঠে ডাক্তারকে অতখানি 'সসন্ত্রম' 'অভ্যর্থনা' জানায় কেন—ডাক্তার তো এখানে আসে অতিশয় কালেভদ্রে? লিফটের দিকে যেতে যেতে অনুমান করলুম, 'ডাক্তারের' বাপ ঠাকুর্দা এঁরা কলকাতার 'প্রাচীন' খানদানী 'বিস্তশালী' লোক; এ হোটলে আসুন আর নাই আসুন, এরকম একটা হোটেল নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে এঁদের আনুকূল্য পেয়েছে।

শহুর-ইয়ার ও আম ছুজনাই চূপ। ডাক্তার কিন্তু সেটা আদৌ লক্ষ্য করে নি। এমনিতে মুখচোরা, লাজুক—এখন,—এখন কেন, যবে থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা সেই থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। অনুমান করলুম, দিল্লী-আগত জনের সঙ্গে একদা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব তার সুগভীর ছিল। নইলে এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা!

ভালো, বড় ঘরই পেয়েছেন দিল্লীর মেহমানদর।

ভদ্রলোকের পরনে অতি দামী কাপড়ের অত্যন্ত দর্জির হাতে বানানো স্যুট। শার্ট, টাই একটু যেন বেশী আত্মপ্রকাশ করছে। সুপুরুষ না হলেও ভদ্র চেহারা। আর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা করাতে দিল্লীর লোক পাকা, এটিকেট-দুরুস্ত।

ম্যাডামটি কিন্তু কনট সার্কলের খাঁটি চক্রবর্তিনীদের একজন। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ে ঐর ব্লাউজটি। সেটির নাম ব্লাউজ দেব, না কাঁচুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলে উল্লেখ করবো? এই পেট-কাটা ব্লাউজ যে তাঁর শরীরের উত্তমার্ঘ আচ্ছাদিত করার জন্য নিমিত্ত হয় নি সেটা দেখামাত্রই বোঝা যায়। সেটা যেন সে চিত্রকার করে প্রচার করছে। আমরা ঘরে ঢোকান সময় তিনি তাঁর শাড়ির ক্ষুদ্রতম অঞ্চলাংশ একবারের তরে তাঁর কাঁধে আলতোভাবে রেখেছিলেন। আমরা ভালো করে তাকান নেবার পূর্বেই সেটি স্থানচ্যুত হয়ে উরুতে স্তূপীকৃত হলো। এর পর সেটি আর প্রমোটেড হয় নি। আমি ভাবলুম, শাড়ি ছেড়ে হাঁস রাজপুতানীদের মত ঘাগরা পরলে তো অনেকখানি কাপড়ের নাশ্রয় হয়। কিন্তু এহ বাহ্যিক হাসলে দেখতে হয় তাঁর মেক আপ। এরকম চুলের টপ আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি—খুব সম্ভব প্যারিসের ফ্যাশান পত্রিকা দেখে দেখে হেয়ার ডেসার তাঁর মাথার উপরকার ঐ তাজমহলটি নির্মাণ করেছে। ঠোটে যে রঙ মেখেছেন সেটা লাল তো নিশ্চয়ই নয়, হয়তো ব্রোন্জ বলা যেতে পারে। নখের রঙ অলিভ গ্রীন। কিন্তু সংস্কৃত কবিগুলোর মত আমি যদি তাঁর দেহ এবং প্রসাধন এস্থলে দক্ষে দক্ষে বর্ণিতে যাই তবে

সর্বপ্রথমই আমাকে বৎসরাধিক কাল তাঁর প্রসাধন নির্মাণে যে-সব গুট রহস্যাবৃত রসায়নাদি সাহায্য করেছে তাদের নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে হবে। ঐতিহাসিক ঔপস্থাসিকগণ অবহেলে পার্মোমিটার দিয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের টেম্পারেচার অজুনকে দিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এযুগের বর্ণনাতে আমি ব্রাহ্ম নগর নিয়ে গুলেট করলে কেউ তো আমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একবার সামান্য একটু মোকা পেয়ে শহর-ইয়ার ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল, 'আপনার জন্মই আজ আমার এই লাঞ্ছনা। এরা ভাববে আমি মাড়োয়ারীদের মত আমার গয়নার দেখাক করতে এমেছি।' আমি বললাম 'কিন্তু ডাক্তার তো আপনার এই এ্যাকসিডেন্টাল গয়না পরা দেখে খুশী হয়েছেন। তাঁর বন্ধুর কাছে বউকে তো আর বিধবান বেশ নিয়ে যেতে পাবেন না।'

আমরা কেউই ডিক করি না শুনে মহাকালের পয়লা রাগিনীটই সামান্য কম-সুরা হয়ে শুরু হলো। দিল্লী নগরীর মনসুর দুঃসদ সাহেব বিড়বিড় করে যা বললেন তার মোটামুটি অর্থ, বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে তেরোশ বছরের প্রাচীন বিধ-বিধান একটু-আপটু, এদিক-ওদিক উনিশ-বিশ করতে হয়। বেগম মনসুর এক চৌক শেরি গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ডাক্তার তেরোশ বছরের পূর্ন কায়দার এখনো নমাজ পড়েন, উপোস করেন; তবু তিনি কোনো আপত্তি জানালেন না। ওদিকে এ বাবদে উদাসীন শহর-ইয়ারের মুখ দেখি লাল হয়ে উঠেছে।

ভারপর বিশেষ কোনো সূত্র ধরে বাক্যালাপ এগলো না। আমরা থাকে বলি আশকথা পাশকথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে মালুম হলো, মনসুর সাহেব একদা এই কলকাতার কারমাইকেল হস্টেলে বাসা বেঁধে বছর ছুত্তিন পড়াশুনো করেছিলেন এবং সে সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে দোস্তী হয়। আমার তাই মনে হচ্ছিল

শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হতো যদি ছুই ইয়ারে 'দোকলা-দোকলি' বসে ছুই ছুই কুছ কুছ করতেন—শহুর-ইয়ার আর আমার তো কথাই নেই, মাদাম মনসুর পর্বস্ত ছু ত্র—ওয়ান টু মেনি। অর্থাৎ সাকুলো থী টু মেনি।

মনসুর এবং তাঁর বীবি মাঝে মধ্যে যে ছু'একটি ইংরিজি কথা কইলেন সেগুলো শুদ্ধ এবং ভাল উচ্চারণে, অথচ কেন যে তাঁরা অধিকাংশ সময়ই উছ' চালিয়ে যেতে লাগলেন সেটা বুঝতে পারলুম না। ওঁরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ডাক্তারের যা উছ' জ্ঞান সেটা দিয়ে বহুৎ ব-তকলীফ্ ব-মুশকিল কাজ চালানো যায় কি না যায় সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, আমার ভাঙা-চোরা উছ' আমি সভাস্থলে পেশ না করে, যে কটি বাক্য বলেছি সে সবই ইংরিজিতে এবং শহুর-ইয়ার যে উছ'র প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীণ্য দেখিয়ে এ পর্বস্ত তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলুম তার সঙ্গে বোলপুর থেকে কলকাতা এক সঙ্গে আসার সময়। কি মুটে, কি চা-ওলা, কি ব্রেস্তোরাবয় কারো সঙ্গে সে ভুলেও বিশুদ্ধ বাঙলা ছাড়া অথ কোনো ভাষার সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এ স্থলেও সে ব্যত্যয় করে নি, তবে বাঙলা না বলে বলেছে ইংরিজি—অবশ্য মুখ খুলেছে সামান্য ছু'একবার মাত্র। এসব দেখে শুনেও দেবা দেবী ছু'জনা যে উছ' কপচাচ্ছিলেন তার থেকে যে কোনো লোকের মনে সন্দেহ জাগা নিতাস্ত খাম-খেয়ালী নয় যে, ঐরা যেন একান্তই 'উছ' আনজুমনের' মিশনারিরূপে এই 'বর্বর' বাঙলাদেশে 'বিসুদ্ধ' উছ' ফয়লাতে এসেছেন।

এ-অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার ইতিপূর্বেও হয়েছে। উত্তর-প্রদেশে তথা দিল্লীবাসিন্দা কলকাতার মুসলমানদের মাঝখানে বসে উছ তড়পাবার সময় ভাবখানা করেন যে ওনারাই একমাত্র 'খানদানী মনিয়ি', খাস বেহেশতে জিব্রাইল গয়রহ দেবদূতরা উছ'তেই বাৎ-চিং করেন—অবশ্য তাঁরা সকলেই বাল্যকালে মনুষ্যরূপ ধারণ করে

নির্দৈন বছর দশ দিল্লী-লক্ষ্মোয়ে উছটা রপ্ত করে যান। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীর উছ'ওলাদের এই হম্-বড়াইর জন্ত অবশ্য বেশ-কিছুটা দায়ী কলকাতার মুসলমানই। সে-বেচারী হিন্দু-প্রধান কলকাতায়—যেখানে উছ'সহ আগত মুসলমান কক্ষে পায় না—তার জাতভাইকে যতখানি পারে সৌজন্ত দেখাতে চায় এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার মনের কোণে আছে উছ'র প্রতি একটা সপ্রশংস মোহ। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য নিশ্চয়ই এ নয় যে, সে তার মাইকেল-রবি-কাজী নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। সে-রকম কোনো বাগবিতণ্ডা উপস্থিত হলে সে ওঁদের জন্ত জোর লড়াই দেয়। তবে লক্ষ্য করেছে, উছ'ওলারা এ রকম তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চায় না; তাঁদের ভিতর যঁারা চালাক তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বরঞ্চ কলকাতাই মুসলমান কিছু কিছু গালিব ইক্বাল পড়েছে, এঁরা টেগোরের নাম শুনেছেন—বাদবাকি ব্লাঙ্কে।

ছুঁভাগ্যক্রমে ডাক্তারের বন্ধু তাঁর উছ'র ঝাণ্ডা ব্যোমলোকের এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে হয়েস্ট করতে লাগলেন যে, আমার তো ভয় হলো ওটা না এভারেস্টের চূড়া ছাড়াই বেহেশতের 'লস্ট এণ্ড ফাউণ্ড' দফতরে গিয়ে পৌঁছয়! ডাক্তার নিরীহ মানুষ—ছ' ছ' করে যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। শহু-ইয়ারের মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না। আর আমি যে অনারোগ্য, গোরস্তানগমনোৎসাহী কঠিন ব্যাধিতে কাতর তারই নিষ্পেষণে 'নিশ্চুপ'—সে ব্যামোর নাম 'সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্স'। আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে এমনই শশব্যস্ত যে অগ্ৰভাষা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কি না সে চিন্তা আমার পুরু নিরেট খুলিটা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

কথায় কথায় মনসুর সাহেব বললেন, উছ'র প্রচার ও প্রসারের জন্ত কলকাতা মাদ্রাসায় ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তাবৎ কলকাতার মুসলমান ছেলেমেয়ে সেখানে গিয়ে উছ' শিখতে পারে।

আশ্চর্য! এতক্ষণ যে শহূ-ইয়ার বিলকুল চুপসে বসে আড়াই ফোঁটা নিষু-পানি চোষাতে সর্বচেষ্টা নিয়োজিত করে সময় কাটাচ্ছিল সে হঠাৎ বলে বললো, 'কলকাতা মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করে; কুরান, হদীস, ফিকাহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। সেগুলো এ টু জেড আরবীতে। তাই সেখানে আরবী ভাষা শেখানো হয় এবং নিতান্তই যখন সাহিত্য ব্যতিরেকে ভাষা শেখানো যায় না তাই কিছুটা আরবী সাহিত্যও শেখায়। ফার্সী শেখায় অতিশয় নগণ্য পরিমাণে এবং গভীর অনিচ্ছায়— তার কারণ ফার্সী সাতশ' বছর ধরে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ও বিদ্বজ্জনদের ভাষা ছিল বলে সেটা চট করে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে সব কাচ্চাচ্চাদের মাতৃভাষা উর্দু, তাদের হয়তো ষৎসামান্য উর্দুও শেখায়। কিন্তু মাদ্রাসার একমাত্র ও সর্বপ্রধান কর্ম হচ্ছে ইসলামশাস্ত্র চর্চা, ইসলামিক থিয়োলজি। সে হঠাৎ 'ব্যাপকভাবে'—এবং নিতান্ত মিনিমাম প্রয়োজনের বাড়া যে কোনো ভাবে উর্দু পড়াবার ব্যবস্থা করবে কেন?'

বিস্ময়ে আমি হতচেষ্টা! ঠাকুর্দার নাম স্মরণ করতে পারছিলাম।

কিন্তু মোক্ষম তাজ্জব মেনেছেন 'মৌলানা' মনসূর।

বাজারে যতখানি গান্ধীর্ষ সেদিন বেচা হচ্ছিল তার সাকুল্যে স্টক কিনে, সর্ব মুখে মেখে বললেন, 'উর্দুভাষা ও সাহিত্য এদেশে ইসলামের প্রতিভু!'

শহূ-ইয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'তাই নাকি? তা হলে বিবেচনা করি, প্রত্যেক মুসলিমের যেটা প্রথম কর্তব্য—অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম-তত্ত্ব-শিক্ষা সে সম্বন্ধে কি উর্দুতে ভূরি ভূরি কেতাবপত্র রয়েছে? কিন্তু আমি তো শুনেছি—অকণ্ঠ আমার সংবাদদাতা ভুল করে থাকতে পারেন—আপনারা কুরান শরীফের উর্দু অনুবাদ ছাপিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে। তারও ত্রিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু গিরীশবাবু বাঙলাতে কুরান অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন।'

তার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই মনসুর বললেন, 'আরবীর সঙ্গে উর্দু'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

আমি জানি শহূর্-ইয়ার আগের পয়েন্টে আরো অনেক-কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন 'ভিন্ন রণাঙ্গনে' চলে গেলেন তখন শহূর্-ইয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। বললেন, 'সে আবার কি করে হলো? আরবীভাষা হিব্রুর মত সেমেটিক; উর্দু ভাষা বাঙলারই মত আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা। সম্বন্ধটা নির্বিড়তর হলো কি করে?'

মনসুরের মুখ ক্রমেই লাল হতে আরো লাল হচ্ছে। ডাক্তার নীরব, কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ। মাদাম মনসুর পানপ্রসাদাৎ ইতিমধ্যেই ঈষৎ বে-এখতেয়ার। আমি চূপ। কারণ শহূর্-ইয়ার তার তলওয়ার চালাচ্ছে পাকা ওস্তাদের মত। তার মুখে রক্তিম উত্তেজনা নেই।

মনসুর বললেন, 'উর্দু' তার শব্দসম্পদ আহরণ করে আরবী থেকে।'

শহূর্-ইয়ার বললেন, 'So what? উর্দু' কেন, বাঙলার তুলনারও ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের ভাষা নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণ আরবী শব্দ এবং ওগুলো যে আরবীর মত সেমেটিক গোষ্ঠীর ভাষা নয় সেও তো জানা কথা। কিন্তু ইন্দোনেশিয়েরা যে রকম ইসলামী ঝাণ্ডা খাড়া করেছে, পেয়েছে সে-রকম এদেশের উর্দু'ওলারা? আমি তো শুনতে পাই, দিল্লী আশ্রা লঙ্কো এলাহাবাদের স্কুলে স্কুলে উর্দু' সরিয়ে হিন্দী শেখানো হচ্ছে। উর্দু'ওলারা কী লড়াই দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে? 'আকাশবাণী' স্বরাজের পর থেকে আর উর্দু'তে নিউজ বুলেটিন দেয় না, শুনছি শিগগীরই দেবে। তবে সেটা পণ্ডিতজীর চাপে। আপনাদের আন্দোলনের ফলে নয়।'

মনসুর ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বললেন, 'আমরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছি!'

এই প্রথম শহূর্-ইয়ারের কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের পরশ লাগলো।

বললো, 'তাই নাকি? আমি তো শুনেছি বাঙলার মুসলমান-
 যাদের অধিকাংশ এখন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে, এবং সংখ্যায়
 পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী তাদেরই ক্রোডট বেশী। তা উছ
 যদি এতই ইসলামী ভাষা হবে তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা উছকে
 তাদের অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা করছে না কেন? শুনেছি তাদের মাতৃভাষা
 বাঙলার জন্ম লড়তে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণ দেওয়াতে 'শহীদ'রূপে
 আজও পরিচিত হচ্ছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানেই বা উছ
 কোথায়? সিন্ধীরা বলে সিন্ধী ভাষা, বেলুচরা বেলুচী, পাঠানরা পশতু
 —রইল বাকি পাঞ্জাব। তারা তো বলে পাঞ্জাবী, শেখে উছ।
 কিন্তু ইতিমধ্যেই তো সেখানে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, পাঞ্জাবী
 কথ্যভাষা, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম করার জন্ম মেটাকে লিখিতরূপ দিয়ে
 অল্পতম রাষ্ট্রভাষার ইচ্ছা দেওয়া। এ-জাতীয় সম্মান পাঞ্জাবী কথ্য
 ভাষা তো আগেও পেয়েছে। গুরু নানকের 'গ্রন্থসাহেব' তো
 পাঞ্জাবী কথ্য ভাষায় রচিত। কিন্তু এসব বিবরণ থাক—আমি
 পশ্চিম পাকিস্তান সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নই। কিন্তু এ
 সম্পর্কে আমার একটি শেষ নিবেদন আছে। আপনি বলছেন,
 আপনারা, অর্থাৎ উছভাষারা পাকিস্তানে নির্মাণ করেছেন। উদ্ভম
 প্রস্তাব। আজকের দিনের পাকিস্তানীরা যে কয়েদ-ই-আজাম মরহুম
 মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবকে তাদের 'জাতির পিতা' বলে সর্বোচ্চ
 সম্মান দেয়, তাঁর মাতৃভাষা কি উছ ছিল?'

মনসুর চুপ করে রইলেন। তর্ক যে আরও চালাতে পারতেন
 না তা নয়। কারণ যুক্তির অভাবই যদি তর্কের সমাপ্তি ঘটাবার
 কারণ হতো, তবে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বুই ভাগ এই মুহূর্তেই মুখ
 বন্ধ করে গোরের নীরবতার আশ্রয় নিত।

ডাক্তার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মনসুর বললেন,
 'বাঙলা হিন্দু ভাষা—তার প্রভাব বাঙালী মুসলমানকে হিন্দু
 মনোবৃত্তিদাস করে দেয়।'

‘দাস’ কথাটা বোধ হয় শহর-ইয়ারকে বলদের সামনে লাল পতাকা দেখানোর মত হলো। স্পষ্ট দেখলুম, তার মুখে সামান্যতম কাঠিন্দ দেখা গেল। তার পরিমাণ এতই সামান্য যে শুধু আমিই সেটা লক্ষ্য করলুম। কারণ এতদিন ধরে তার নয়নে বদনে বহু ভাবের খেলা আমি দেখেছি। বেশীর ভাগ সময় তার মুখ শান্ত। ভদ্র পরিবারের বধুর মত কিন্তু সামান্যতম রসের সন্ধান পেলেই মুচকি হাসে কিংবা খলখলিয়ে। বিষয়, চিন্তিত, বিহ্বল আরো বহু ভাবের খেলা তার চোখে মুখে আমি দেখেছি, কিন্তু ঐ ভদ্র বধুর শান্তিমাখা মুখ ছাড়া সব চেয়ে বেশী দেখেছি তার রহস্য-ভরা আঁখি। কঠিনতা কখনো দেখি নি।

বললে, ‘বাঙলার শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গীত টেগোরের। সেগুলোতে হনুমানজী, রামচন্দ্রজী কেউই নেই। আছেন যিনি, তিনি সূফীদের অল্-হক্, অল্-জীমল—ট্রুথ এণ্ড বিউটি। আপনি যখন এদেশে বাঙালী হস্টেলে বাঙালী-মুসলমানদের ভিতর তিন বছর বাস করে বিস্তর বাঙলা শুনেছেন, তখন আশা করতে পারি এসব টেগোর-সং-এর কিছু কিছু সে যুগে আপনার কানে পৌঁচেছিল এবং তার কিঞ্চিৎ রস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের শুধিয়ে অস্তুত মোটামুটি অর্থটা জেনে নিয়েছিলেন।’

যেন গৌরীশঙ্করের চূড়ো থেকে গুরুগম্ভীর ঐশী বাণী নেমে এল :

‘না, বাঙলা শেখার কোনো জরুরং আমার ছিল না।’

শহর-ইয়ার হঠাৎ কি রকম যেন বদলে গিয়ে একেবারে ভিন্ন কণ্ঠে বললে, ‘সে তো ঠিকই করেছেন। এদেশে কত ইংরেজ বক্স্ওলা দশ বিশ বছর কাটিয়ে যায়, এক বর্ষ বাঙলা না শিখে। আপনারই বা কী জরুরং।’

‘বক্স্ওলা’ কথাটা আমি স্বরাজলাভের পর আদৌ শুনি নি। ইংরেজ চাকুরে সিভিলিয়ান ‘স্বব’রা চা-বাগিচার অশিক্ষিত—এমন কি বর্বর বললেও অত্যাঙ্কিত হয় না—সায়েরবদের এই বিদ্রপসূচক নাম

দিয়েছিল—চায়ের পেটি বা 'বক্স' নিয়ে তাদের কারবার করতে হয় বলে। মনসুর সাহেব হয়তো কথাটা পূর্বে কখনো শোনেন নি তাই অর্থটা ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'বক্সওলা কি?'

শহর-ইয়ার যেন প্রশ্নটা শুনতেই পায় নি এ রকম ভাব করে মিসিস মনসুরের দিকে ঝুঁকে দরদভরা কণ্ঠে কি যেন শুধোলো।

তর্ক খেমে গেছে কিন্তু তবু মনসুর খামতে চান না। তিনি উর্দু সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও প্রসাদগুণ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তার 'অধিকাংশই খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা কর্কশ কর্কশ ইঙ্গিত, 'তোমার বাঙলায় এ রকম আছে?' ঐ গোছ। কিন্তু শহর-ইয়ার সেই যে মুখ বন্ধ করেছিল আর একেবারের তরেও খুললো না। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরানীয়া বলেন 'তখন আলোচনার কার্পেট রোল করে তুলে নিয়ে খাড়া করে এক পায়ে রেখে দেওয়া হলো।' উপস্থিত তারও বাড়া কিছু যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। যেই শহর-ইয়ার সামান্যতম আভাস পেল যে দ্রব্যগুণেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক মনসুর আবার সেই কার্পেটটা গড়গড়িয়ে খুলতে চান, ধুরন্ধরী সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে যেন টাইট হয়ে গিয়ে বসলো সেই রোল করা কার্পেটটার উপর।

আল্লায় মালুম, মনসুর সাহেবের লোকচার কখন শেষ হবে। আমার প্রিয় বান্ধব ডাক্তার সাহেব আবার কারো কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে আপন কথা বলতে একেবারেই অসমর্থ। ওঁদিকে আমি যেন আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে একটা ছর্গন্ধ পেলুম যে ডাক্তারের ইচ্ছে আমাদের সকলকে বাইরে কোনো মোগলাই রেস্টোরাঁতে খাওয়াতে চান এবং এখানে আসবার সময় সেটা বলতে ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! তা হলেই হয়েছে! কী করি, কী করি! মনে পড়লো, ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাকে একদিন বলেছিলেন 'সাহিত্যিক হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন, যেমন ভাষার উপর দখল, কল্পনাশক্তি এবং আরো বহুবিধ কলাকৌশল তার মাত্র একটি তোর আছে—

নির্জলা মিথ্যে বলার নির্লজ্জ চতুরতা।' 'জয় গুরু, জয় গুরু! তোমার হিমা অপার! তোমাকে স্মরণ করা মাত্রই অজ্ঞান-তিমির-ক্ষয় দূরীভূত হয়ে গেল: সম্মুখে দেখি দিব্য জ্যোতি, সত্য জ্যোতি।

যেই মনসুর সাহেব দিতে গেছেন গেলাসে আরেকটি চুমুক অমনি আমি সবাইকে না শুনিয়ে আবার শুনিয়েও শহর-ইয়ারকে বললুম, আমি তা হলে উঠি। আপনি বাবুটিকে বলে এসেছেন তো কি ভাবে আমার পথিটা তৈরী করবে?' তার পর লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে মনসুর সাহেবকে বললুম, 'আপনার বন্ধু ডাক্তার সাহেবের আপনাকে তাই চিকিৎসার জন্তই আমার মফসল থেকে শহরে আসা। পাছে আপনাকে কুপথ্য করি তাই আমাকে প্রায় তালাবন্ধ করে রেখেছেন। আপনাকে বাড়িতে, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনার সঙ্গে আবার পরিচয় হওয়ায় ডাক্তার আনন্দ হলো, হেঁ হেঁ।' ডাক্তার গোবেচারী ক্যালক্যল করে আমার মুগের দিকে তাকালে। শহর-ইয়ার আমার কথা শেষ হওয়ার লক্ষ্যেই আমার মণ্ডলবটা তালো করেই বুঝে নিয়েছে—আমি বসে নেই, সেও এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছিল, কিন্তু বেচারী ময়েছেলে হয়েও না পারে অশিক্ষিত পটুত্বের অভিনয় করতে, না পারে নির্জলা মিছে কথা কইতে। এবারে আমি একটা পথ করে গিয়া মাত্রই সে চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে ঘাড় নাড়ালে যে তার পক্ষে এও হয় ওও হয়। ডাক্তার বিশেষ মনঃকুণ্ঠ হলে মনে লো না—কারো কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া তার ধাতেই নেই।

রিকম মহামানব সংসারে বড়ই বিরল।

বিস্তর শেকহাণ্ড, খুদা হাফিজ, ক্বী আমানিল্লাহ, বাঁ ভওয়াইয়াজ মিরার পর শহর-ইয়ার শুধু মনসুর সাহেবকে ছুটি অনুরোধ জানালে, মাদামের কলকাতায় এলে যেন তাঁদের ওখানে ওঠেন এবং আজ তাঁদের মত যেন ডাক্তারকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। মাদাম মনসুরকে শহর-ইয়ার এ-অনুরোধ আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে পৌঁছন মাত্রই শহুর্-ইয়ার গা
ধরলো, আর বেশ উচ্চকণ্ঠেই, অবশ্য এ সময় কেউ যদি আদপে
কাছে-পিঠে থাকে তবে সে সে-রকের বেয়ালা—

‘হাটের ধূলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ ।

‘তোমার সুরসুরধূনির ধারায় করাও আমায় স্নান ।’

আট

ইভার শুধোলে, 'কোথায় যাবো, আন্মা ?'

শহর-ইয়ার ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'বেহেশৎ কিংবা জখ—যেটা এ জায়গা থেকে বেশী দূরে।'

বেচারী ডাইভার বুঝতে পারে নি। আমি বললুম, 'উপস্থিত গ-পারে চলো। পরে দেখা যাবে।'

একটা জায়গায় ভিড় সামান্য কম। আমি বললুম, 'শহর-ইয়ার, গানে ঐ গাছতলায় একটু বসবেন ?'

বললে, 'নিশ্চয়ই বসব, একটুখানি তাজা হাওয়া বুকের ভিতর র নি। গ্রেট ঈস্টার্ন তবু পদে আছে, অগ্নি হোটেলগুলোতে যেন মার দম বন্ধ হয়ে আসে। গঙ্গার হাওয়া গঙ্গাজলের চেয়ে ঢের লো। তাই হিন্দুরা গঙ্গাস্নানের পরিবর্তে এখন গঙ্গার হাওয়া য়ে পাপমুক্ত হয়। এ হাওয়ার বহু গুণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বৃত্তি করলো,

'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !

গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধসমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'

রপর গান ধরলো, 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—

তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—'

গাং গান বন্ধ করে বললো, 'মিস্টার মনসুর কিন্তু লোক খারাপ নয়— বলেন আপনি ? আসলে কি জানেন, ওঁরা থাকেন এক ভুবনে, আমাদের বাস সম্পূর্ণ অগ্নি ভুবনে। বিপদ শুধু এই, ওঁরা আমাদের নভাট করতে চান।'

আমি বললুম, 'কনভাট করাটা কি দোষের ? ঐটেই তো লম্বানদের স্ট্রং পয়েন্ট। কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষয় ঠাইকে পড়তে হয়। কি করে অমুসলমানকে মুসলমান করা যায়।'

মনস্কর মিশনারীর দোষ বিশ্বমুদ্র লোককে উদ্ধতে কনভার্ট করা: চেষ্টাতে গলদ নয়—গলদ তার পদ্ধতিতে, মেথডে, মডুস্ অপেরাণ্ডিতে দস্ত নিয়ে প্রচার আরম্ভ করলে যাকে কনভার্ট করতে চাও, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, আমি যত ভালো উর্ছ'ই শিখি না কেন, ঐর সঙ্গে তে কখনো কাঁধ মেলাতে পারবো না, কারণ উর্ছ' ঐর মাতৃভাষা। অতএব বাকী জীবন ধরে ওঁর মুখের দস্তোদগীরণ আমাকে ময়েই যেতে হবে কী দরকার গায়ে পড়ে করুণার পাত্র হওয়ার। তার চেয়ে ধারি আমি আমার বাঙলা নিয়ে। ছ' পাঁচটা ভুল সে ভাষাতে করলে কীই বা এমন ছুশ্চিন্তা—পাড়া-প্রতিবেশীরাও করে। আমরা সবাই বরাবর। ঐ উর্ছ'র গোসাইও নিশ্চয় ছ' পাঁচটা ভুল কয়েন তাঁর চোস্তু উর্ছ'তে—মানুষ তো আর আল্লা নয়—কিন্তু সে ভুল তে আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো বি করে? কিন্তু এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করেন কেন? এ তে অতি সাধারণ. স্থূল দৈনন্দিন ঘটনা। দেখলেন না, আমি আলোচনা মোটেই যোগ দিলুম না।'

'সে তো স্পষ্ট দেখলুম। এবারে বলুন, কাইরোতে ইসলাম প্রচার-পদ্ধতি সুচারুরূপে শেখার পর ক'জন অমুসলমানকে মুসলমান করেছেন?'

আমি বললুম, 'প্রথম তো নিজেকেই সামলাই। আমার ময় গুনাহ্গার—পাপী মুসলমান এ-সংসারে খুব বেশী নেই। আগে তো একটা মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছই, তবে না প্রচার কার্য আরম্ভ করার হক্ জন্মাবে।'

শহুর-ইয়ারের চেহারা দেখে মনে হলো আমি যুক্তি দেখাতে তাকে আমার সঙ্গে একমত করতে পারি নি। সো ভী আচ্ছা শেষ বিচারের দিনে তিনি যদি সাক্ষা দেন যে আমি খুব খারাপ মুসলমান ছিলাম না—অস্তুতঃ আমি নিজের সম্বন্ধে যতটা ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম—সেও একটা ভরসার কথা।

বললুম, 'একটু সরে এসে এই গাছটার তলায় ঐ শেকড় ছোটের মাঝখানে বসুন। এখানে বসলে তদ্দণ্ডেই মেয়ে মাত্রেয়ই একটি বিশেষ শক্তি লাভ হয়। নির্ভয়ে নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলতে তখন তার আর কোনো বাধাবন্ধ থাকে না। পরের দিন বিকেলে আরেকটি ছেলের সঙ্গে তার লীলাখেলার এপয়েন্টমেন্ট—আজ সন্ধ্যায় এখানে বসলে সে অকুণ্ঠ ভাষায় নিদ্রন্দ্র বিবেক নিয়ে গদগদ হয়ে অল্প জনকে বলতে পারে, 'আই লাক্ ইউ, আই লাক্ ইউ।'

'“লাক্” কেন, “লাভই” তো উচ্চারণ। ভাষাটা তো আর জার্মান নয় যে 'ভি' 'এক্' হবে?'

'এটা সর্বাধুনিক, chic উচ্চারণ।'

'না। আমার মনে হয় তা নয়। মেয়েটা “আই লাক্ এট ইউ, আই লাক্ এট ইউ”। “এট”—টা উহ্য রেখেছিল, ভদ্রতার খাতিরে।' সঙ্গে সঙ্গে শহূ-ইয়ার হেসে ওঠাতে সাদা দাঁতগুলো ঝিলমিল করে উঠলো কিন্তু মুখের রঙটি সন্দরমহলের বংশানুক্রমিক ধবলের চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে বলে কণ্ঠাসটার খোলতাই জুতসই হলো না—মুখের রঙ কালো হলে যে রকম হতো।

শহূ-ইয়ার মুচকি হেসে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, একটা মেয়ের যদি ছুজন প্রেমিক থাকে, এবং সে-যদি ছুজনকেই পরিতৃপ্ত করতে পারে, তাতে সমাজেরই বা কি, আর আপনি শিক্ষিত লোক, আপনারই বা কি মরেল অবজেক্শন থাকতে পারে?'

আমি বললুম, 'সমাজের আপত্তি বা আমার মরেল অবজেক্শন এগুলো পরের কথা। আসলে কি জানেন, জিনিসটা ঠিক স্বাভাবিক-ভাবে চলতে পারে না। মেয়েটাকে সর্বক্ষণ লুকোচুরি খেলতে হয়, সর্বক্ষণ ভয়, ছুজনার এক জন কখন না অল্প জনের গন্ধ পেয়ে যায়—বিবাহিতা রমণী উপপতি রাখলে তাকে যে রকম অষ্টপ্রহর আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটাতে হয়। একে তো মেয়েটার স্বাভাবিক সুস্থ জীবন বরবাদ—তছপরি ব্যাপারটা খুব বেশীদিন গোপন থাকে না,

জানাজানি হয়ে যায়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি মেয়েটা এই দোটার স্ট্রেনসইতে না পেরে একজনকে বিদায় দেয় তখন তার এবং ছেলেটার বন্ধু মহলে সে 'জিল্ট' রূপে মশহুর হয়ে যায়, কারণ, তারা তো আর জানে না যে মেয়েটা ছুটো ভিন্ন লোকের সঙ্গে একই সময়ে লীলাখেলা চালাচ্ছিল এবং সে স্ট্রেনসইতে না পেরে একজনকে বিদেয় দিয়েছে। আর আসল তত্ত্ব জানাজানি হয়ে গেলে তো আরো চিন্তির। তখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাড়ার নটবররা তার গায়ে পড়ে 'প্রেম' নিবেদন করে। ভাবখানা এই, দুজন যখন ছিলই তখন তিনজনেই বা কি দোষ? আর সর্বশেষে বলি, মেয়েটার পক্ষে ছেলেটাকে বিদায় দেওয়ার 'জিলটিং' কর্মটি কি অতই সহজ! চিন্তা করুন, ছেলেটার মোহ যদি তখনো কেটে না গিয়ে থাকে তবে সে চোখের জল ফেলবে, প্রাচীন দিনের প্রণয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার শপথ কাড়বে! না, 'জিলটিং' কর্মটি শুধু যে 'জিলটেড্' হতভাগার পক্ষেই অপমানজনক তাই নয়, যে জিল্ট করে তার পক্ষেও পীড়াদায়ক!

শহর-ইয়ার বললে, 'এযুগের অবিবাহিতা তরুণী যুবতীদের চেয়ে আমার বয়স খুব বেশী নয়, তবু এদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই জানতে ইচ্ছে করে এদেশে আমাদের অল্প বয়সে শেখা একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ কি ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতবেগে জিলটিং নামক নয়া মালের জন্ম জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কিংবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে?'

আমার চিন্তে কোঁতুক রসের সঞ্চার হলো। বললুম, 'আমার বয়সটি কি নিতান্তই প্রেমে পড়-পড় তরুণদের বয়স, যে তাদের সঙ্গে আপনার চেয়ে আমার দহরম-মহরম শ' দুই লিটার বেশী! এবং আমি বস করি মকস্বলে!'

'কী জ্বালা! আপনার যে গণ্ডায় গণ্ডায় চ্যাংড়া চেলা রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস পুরুষমানুষ নিজের থেকে নিতান্ত না চাইলে

সহজে বুড়ে হয় না। সে কথা থাক্ আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন।’

‘দেখুন এ-প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক কেউ দিতে পারে না। সবাই শুধু আপন আপন একটা খসড়া গোছ, একচোখা ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আমার ধারণাটা প্রকাশ করার পূর্বে একটি অতি হৃদয় ভূমিকা দি। এক অতিশয় সহৃদয় বাঙালী সমস্ত জীবন জেলের বড়কর্তা রূপে কাজ করে পেনশন নেওয়ার পর-কি একটা ঘটনা উপলক্ষে বলেন, তাঁর জেলে একবার একজন গুণী পণ্ডিত আসেন যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব, এবং বিশেষ করে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব। দেশ-বিদেশের জেলে তিনি তাঁর অধ্যয়ন-রিসার্চ করেন সাজা-প্রাপ্ত অপরাধীদের নিয়ে এবং তাঁর একটি অতিশয় বিরল গুণ ছিল এই যে, যত হাড়-পাকা, মুখ-চাপা কয়েদীই হোক না কেন, তার বাক্য তাঁর আচরণ, এককথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সে তার হৃদয়ের গোপনতম কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারতো না। মাসখানেক কাজ করার পর তিনি আমাদের এই বাঙালী জেলারটিকে বলেন, ভারতবর্ষের একাধিক জেলে রিসার্চ করার পরও তিনি এ যাবৎ একটি মাত্র জাত-ক্রিমিনাল, অর্থাৎ যে নিরুদ্বেগে, বিবেক নামক প্রতিবন্ধকের নুইসেন্স সম্বন্ধে অষ্টপ্রহর সম্পূর্ণ অচেতন থেকে ক্রাইমের পর ক্রাইম করে যায়, জাস্ট ফর ইট্‌স্ ওন সেক্—এরকম প্রাণী এদেশে পান নি, তার মানে এদেশে জাত-ক্রিমিনাল নেই। আমারও মনে হয় এদেশে ‘জাত-জিল্ট্’ নেই। সুদ্ধমাত্র ফুলে ফুলে মধু পান করার জন্তু একটার পর একটা পুরুষ জিল্ট্ করে করে যৌবনটা কাটাচ্ছে এ রকম রমণী এদেশে বোধহয় বিরল। এই যে আপনি হিন্দু নারীর পতিব্রতা হওয়ার আদর্শের কথা একাধিক বার তুলেছেন, সেই সংস্কারটা এদেশের তরুণীর ভিতর আবির্ভূত হয়—যেই সে প্রথম প্রেমে পড়ে। আর আপনার যে উদাহরণ;—একটি তরুণী দুটো প্রেমিকের সঙ্গে একই

সময়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাও এদেশে হয় অশ্রু কারণে। আমার মনে হয়, একটু অনুসন্ধান করলেই ধরা পড়বে, বেচারী মনস্থির করতে পারছে না, ছুটোর কোন্টাকে বিয়ে করলে সে আখেরে সুখী হবে, এবং তাই কোনোটাই হাতছাড়া করতে পারছে না।

আপনার প্রশ্নের উত্তর খানিকটে তো দিলুম, কিন্তু আমার প্রশ্ন ‘জিল্টিং’ নামক অতি প্রাচীন অথচ নিত্যনবীন কর্মটির প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন? আমি নির্ভয়ে, নিঃসন্দেহে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি আপনি কখনই ‘জিল্টিং’ রহস্যের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারবেন না। আপনি হিন্দু হলে বলতুম, এ জন্মে না, জন্ম-জন্মান্তরেও না।’

‘কেন, আমি কি এতই ইডিয়ট?’

আমি বললুম, ‘তওবা! তওবা!! আপনি ইডিয়ট হতে যাবেন কেন? আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী—এ-কথা আমি কেন, আমার গুরুর গুরুও বলবেন। কিন্তু, কল্যাণী, এ তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার বস্তু নয়। এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার, এবং মনে রাখবেন, আপনি আমাকে অতি উত্তমরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়েছেন আপনার অনুভূতি, আপনার স্পর্শকাতরতা এর সব-কিছু গড়ে উঠেছে, আকার নিয়েছে, আর্দ্রতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, আপনি আপনার হৃদয়ের খাচু আহরণ করেন ঐ একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে ‘জিল্টিং’ নিয়ে গান কই? জিণ্টেড্ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা কি কল্পিনকালেও তাঁর হয়েছিল? শুধু প্রভাত মুখো কেন, ঠাকুরবাড়ির প্রাচীনতম বৃদ্ধবৃদ্ধা এবং মে-বাড়ির সঙ্গে বাল্যকাল থেকে সংশ্লিষ্ট জন কেউই তো কখনো সামান্যতম ইঙ্গিত দেন নি যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কাউকে ভালোবেসে জিণ্টেড্ হয়েছেন। তাঁর প্রেমের গানের মূল সুর মূল বক্তব্য কি? ‘আমি তোমাকে ভালো-

বেসেছিলুম, তুমিও আমাকে-বেসেছিলে। তার পর তুমি হঠাৎ
অকালে চলে গেলে। তাই

এখন আমার বেলা নাই আর
বহিব একাকী বিরহের ভার ?

কিংবা

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি।

এটা অবশ্যই তাঁর দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রিয়া অকালে অন্ম লোকে চলে
গেলেন। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তিনি রূপ দিয়েছেন শত শত গানে—
দশ বছর ধরে নয়, সমস্ত জীবন ধরে—কিন্তু মোতিলক এক: 'তুমি
চলে গেলে; আমি আর কতকাল ধরে তোমার বিরহ-ব্যথা সহিব?'

শহর-ইয়ার বললে, 'মাফ করবেন—হঠাৎ আমার মনে একটা
প্রশ্ন এল। আমার অনুভূতি আমার ইমোশান যেমন রবীন্দ্রনাথের
গান গড়ে দিয়েছে আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই নয়? আপনি তো
তাঁকে কাছের থেকে দেখেছেন, তাঁর বহু বহু গান আপনি এবং
আপনার সতীর্থরাই সর্বপ্রথম শুনেছেন।'

আমি বললুম, 'গুরু যেন অপরাধ না নেন! আমার অনুভূতি
জগৎ নির্মিত হয়েছে অন্ম বস্তু দিয়ে। গুরুর কাছ থেকে সিকি পরিমাণও
নিয়েছি কিনা সন্দেহ।'

শহর-ইয়ার বিস্মিত হয়ে শুধোলো, 'তবে কোথা থেকে?'

'বৈষ্ণব পদাবলী থেকে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশের সর্বত্রই যে মোতিলক নিয়ে
সব চেয়ে বেশী গান গাওয়া হয় সেটি রাধাকৃষ্ণের। এবং আরো
পরিষ্কার হয়, আরো সংকীর্ণ পরিসরে সেটা জাজ্জল্যমান হয় যদি বলি
আসলে মোতিলকটা শ্রীরাধার বিরহ। সেই বিরহের গান গাওয়া হয়
নিত্য নব রচা হয় বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে নানা সুরে। কথার
দিকে শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণার সর্বোত্তম অতুলনীয় প্রকাশ এই

আমাদের বীরভূমের চণ্ডীদাসে। ঐর পরে আসেন বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ইত্যাদি। মুসলমান কবিও বিশ্বর আছেন তবে একমাত্র সৈয়দ মতুজা ছাড়া আর কেউ খুব উচ্চস্তরে উঠতে পারেন নি— যদিও তাঁদের সহৃদয়তা, শ্রীরাধার প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি হিন্দু কবিদের চেয়ে কণামাত্র কম নয়।

আর সুরের দিক দিয়ে শ্রীরাধার বিরহসঙ্গীতের সর্বোত্তম অতুলনীয় বিকাশ ফটে উঠেছে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে, সুরে।

আমি ঐতিহাসিক নই, তাই বলতে পারবো না, কত শত বৎসর পরে কত হাজার বৈষ্ণব কবি তাঁদের আপন আপন বিরহবেদনার নিদারুণ অভিজ্ঞতা শ্রীরাধার কণ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ রেখে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নবীন কাব্য রচনা করে, নূতন নূতন নায়ক নায়িকা নির্মাণ করে, যেমন মনে করুন, নলদময়ন্তী কিংবা লায়লী মজনুন, তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে আপন আপন বিরহযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। তাবৎ বৈষ্ণব কবিদের বিরহবেদনা শ্রীরাধার বিরহবেদনা, আর যুগ যুগ ধরে শ্রীরাধার কণ্ঠে সঞ্চিত তাবৎ বিরহগাথা সর্ব বৈষ্ণব কবির গৌরবসম্পদ!

নিজেকে নিশ্চিন্ত করে, এমন কি আপন প্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত করে ছুজনারই নিষ্ঠুরতম বিরহজ্বালার অভিজ্ঞতা ব্রজসুন্দরীর কণ্ঠে সমর্পণ—এই যে প্রক্রিয়াটি এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। আপনার মনে আছে, বোলপুরে পারুল বনে যেতে যেতে এক সকালে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে আপনাকে শোনাই—কোনো টীকাটিপ্তনী না করে?—

‘ সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
‘ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেন্নি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁধি পড়েছিল মনে
বিরহ-তাপিত ?

অবশ্য আমারও ইচ্ছে করে গুরুকে সবিনয় জিজ্ঞেস করতে, তাঁর বেলা, যাঁর 'বিরহ-তাপিত' অশ্রু তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, যাঁর 'মুখ' যার 'আঁখি' হতে

‘—এত প্রেমকথা -

রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা

চুরি—’

করেছিলেন তিনিও, তাঁর প্রতি তিনি তাঁর কাব্যে সুবিচার করেছেন তো ?

ঠিক ঐ একই প্রক্রিয়াই ইয়োরোপের বহু বহু কবি 'ত্রিস্তান আর ইজলদের' প্রেমগাথায় আপন আপন নিজস্ব প্রেম, বিরহ, মিলন—অবশ্য মিলন অংশ সর্বকাব্যেই অতি ক্ষুদ্র অংশ পায়— অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলাদেশের বিরাট বৈষ্ণবগাথার তুলনায় ত্রিস্তানগাথা সূচ্যগ্র পরিমাণ।’

শহর-ইয়ার এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবারে শুধোলো, 'কই, আমি তো ত্রিস্তান ইজলদে কাহিনীর নাম পষন্তু শুনি নি।’

বড় বেদনার গাথা। আর ইয়োরোপীয় এ জাতীয় যত গাথা আছে তাদের মধ্যে আমি এটাকেই সর্বোচ্চ আসন দি। আপনি যে শোনেন নি সেটাও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই এ-সব গাথার প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে 'ফ্রেঞ্চ একাডেমি'—এবং জানেন তো পৃথিবীর আর কোনো একাডেমি এর এক শ যোজন কাছে আসতে পারে না— প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁদেরই এক সদস্যের স্বন্ধে গুরুভারটি দেন তিনি যেন ত্রিস্তান সম্বন্ধে যে কটি ব্যালাড পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে কালোপযোগী একখানা নবীন 'ত্রিস্তান' রচনা করেন। সে 'ত্রিস্তান' আমাকে মুগ্ধ করে, এবং তার বাঙলা অনুবাদ আমি আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে আসি। এবং যদি অনুমতি দেন, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই আরম্ভ করি। আপনার খুব খারাপ লাগবে না, কারণ আপনি আমি ছুঁনাই মুসলমান; ওদিকে রাধাকৃষ্ণের কাব্যরূপ রসস্বরূপ বাদ দিলে তাঁরা হিন্দুদের—বিশেষ করে গোড়ীয় বৈষ্ণবদের—উপাস্ত্র দেব-দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ শুধু ব্রন্দাবনের রসরাজ নন, তিনি গীতাকার রূপে বিষ্ণুর অবতার। আমি মানুষ হয়েছি আচার-নিষ্ঠ মুসলমান পরিবারে। অথচ যে গানটি আমার আট বৎসর বয়সে মনে অভূত এক নবীন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল সেটি

‘—দেখা হইল না রে শ্যাম,

আমার এই নতুন বয়সের কালে—”

এ বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত অংশটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মারি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটার কিঞ্চিৎ—অতি সামান্য—মূল্যও আছে।’

শহর-ইয়ার দৃঢ় অথচ সবিনয় মধুর কণ্ঠে বললেন, ‘আপনি দয়া করে কোনো বস্তু বাদ দেবেন না। কীর্তন গান রেকর্ডে, বেতার থেকে আমি শুনেছি কিন্তু ওর গভীরে আমি কখনো প্রবেশ করি নি।’

আমি বললুম, ‘তার কারণও আমি জানি। জানতে চাইলে পরে বুঝিয়ে বলবো।’

হ্যাঁ। আমি পানির দেশের লোক, চতুর্দিকে জল আর জল! সঙ্গে সঙ্গে ভোরে, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরেও ভাটিয়ালি গীত। নিশ্চয়ই প্রথম শুনেছি মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। সামান্যতম বোধশক্তি হওয়ার পর থেকেই শুনেছি কান পেতে এবং অতি শীঘ্রই সেটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যে রকম আমার দেশের দানাপানি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ঐ ‘দেখা হইল না রে শ্যাম’-এর আগেকার কোনো গানই আমার মনে নেই।

আমাদের পরিবার আচারনিষ্ঠ, তার ঐতিহ্যে কট্টর প্যুরিটান। গান-বাজনা আমাদের পরিবারে বরাহমাংসবৎ ঘৃণ্য। কিন্তু সে কোন্ নিয়তি আমাকে ঐ গানের দিক আকৃষ্ট করলো জানিনে। আট বছর

বয়সে 'নতুন বয়সের কালে' দেখা না হওয়ার ট্রাজেডি হৃদয়ঙ্গম করার কথা নয়। তবে আকর্ষণ করলো কি? জানিনে, সত্যি জানিনে।

তার পর বহু গান শুনতে শুনতে পরিচিত হলুম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। আমাদের ছুজনারই প্রিয় গান 'কেটেছে একেলা বিয়হের বেলা'-র 'নূতন ভুবন নূতন ছ্যালোকে' যেন অকস্মাৎ আমার মত দীন অকিঞ্চনজন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকার পেল। আপনারই মত যখন আমার হৃদয়ানুভূতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগন্ধবৈভাবে নির্মিত হচ্ছে তখন হঠাৎ পরিচয় হল চণ্ডীদাসের সঙ্গে। তার তাবৎ গানের সঙ্কলন ঘণ্টা তিনেকের ভিতর পড়ে শেষ করা যায়। আমার লেগেছিল পূর্ণ একটি বৎসর। ইতিমধ্যে জানতে পারলুম, চণ্ডীদাসের জন্মস্থল নাগুর, আমাদের বোলপুর থেকে মাত্র মাইল আষ্টেক দূরে। এক বন্ধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গেলুম সেখানে পয়দল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, জমিদার অনাদিবাবুর ছোট ভাই শোনালেন কীর্তন গান। তিনি আমাকে করমাইশ করতে বললে আমি চণ্ডীদাস থেকে বেছে বেছে আমার আদরের গানগুলো পেশ করলুম। মাত্র কয়েক বছর হলো শুনলুম, তিনি গত হয়েছেন; তাঁর সদর্গতি হোক!

তারপর বহু বার শুনেছি সন্ধ্যা আটটা দশটা থেকে ভোর অবধি কীর্তন গান। তার বর্ণনা আপনাকে আরেকদিন দেব। এদেশ থেকে বহু উত্তম উত্তম প্রথা প্রতিদিন লোপ পাচ্ছে; আমার গভীরতম শোক, দুর্নিবার হাহাকার—যার কোনো সাস্থনা নেই যে সমস্ত রাত ধরে কীর্তন গান গাওয়ার প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। আমার মতামতের কী মূল্য? তবু যাবার পূর্বে নিবেদন করে যাই এঁটেই ছিল বাঙলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঐতিহ্যগত সম্পদ—এর লক্ষ যোজন কাছে আর কোনো সম্পদ কোনো বৈভব আসতে পারে না।

বিবেকানন্দ 'কুমড়ো গড়াগড়ি' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন—কারণ ছবিটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

কীর্তনের আসরে ছেলে-বুড়ো রাধার বিরহবেদনা শুনে 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয়। আমি দিই নি কিন্তু ছুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে গেছে।

গুরু ক্রমা করবেন, আপনিও অপরাধ নেবেন না, শহুর-ইয়ার, কারণ আপনার অল্পভূতি-ভুবন গড়ে তুলেছে আমার গুরুর শতাধিক গান, কিন্তু যদি বলি, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বোত্তম সম্মেলনেও আমি কাউকে কাঁদতে দেখি নি, কুমড়ো গড়াগড়ির কথা বাদ দাও।

বাস্! আমি অল্প আর কোনো তুলনা করবো না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। ইতিমধ্যে বলে রাখি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্ববৈভবে অতুলনীয়। যে জর্মন-'লীডার' ইয়োরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রসঙ্গীত তার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, তার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী বিকাশ কাব্যলোকে তাবল্লোক ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু উর্ধ্বে।

কিন্তু প্রশ্ন, কীর্তন শুনে বালবৃদ্ধ (আমি যখন প্রথম শুনে ছ'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নার শব্দ চাপতে চেয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোল) 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয় কেন? আমি অবশ্যই এখানে আড়াই-খানা কীর্তনের রেকর্ড বা বেতারে আধঘণ্টা কীর্তন প্রোগ্রাম শোনার কথা ভাবছি—দ্বিতীয়টা তো বহুবিধ যন্ত্রের খচখচানি এবং অংশতঃ সেই কারণে কীর্তনীয়ার অবোধ্য শব্দোচ্চারণ সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্যকার কীর্তনের এক হাস্যাম্পদ ব্যঙ্গরূপে আধঘণ্টা ধরে মুখ ভ্যাংচায়। আজকের দিনে তাই শতগুণে শ্রেয়ঃ—নিভূতে নির্জনে চণ্ডীদাস, বিছাপতি, জ্ঞানদাসাদি সশ্রদ্ধ বারংবার পঠন—প্রহরের পর প্রহর ব্যাপী। সে সময়ে গানগুলি যে সুরবর্জিত হয়ে দীনদরিদ্ররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করছে সেটা আমার হৃদৈব কিন্তু তবু সেটাকেও নমস্কার—সেও লক্ষ্যগুণে শ্রেয়, প্রাপ্তকৃত ঐ অর্ধঘণ্টাব্যাপী নির্মম লাঞ্ছনার চেয়ে। সাহস নেই কলকাতা আকাশবাণীর সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি জনতিনেক কীর্তনীয়ী—মূল গায়ন উত্তম হওয়া চাই—এনে একটানা, অবিশ্রান্ত সুদ্ধমাত্র কীর্তন শোনাবার ?

বিরক্ত হয়ো না, শহুর-ইয়ার, এ-নিযে আমার ক্ষোভ কোনো
সাস্তনা মানে না, তাই তোমাকে বললুম।

আরেকটা কথা। জানো বোধ হয়, পাঁচমেশালী গানের মজলিসে
কারো যদি কীর্তন গাইবার প্রোগ্রাম থাকে—বেশীক্ষণ না, ধরো
আধঘণ্টাটুক—তবে সেটা আসে পুরো প্রোগ্রামের একবারে
সর্বশেষে। কেন জানো? ঐ উটকো কীর্তনটাও যদি মোটামুটি
রসের পর্যায়ে উঠে যায় তবে তার পর আর কেউ অন্য কোনো গান
জমাতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথও কীর্তন সুরের ম্যাজিক জানতেন—
কীর্তনের কথার তো কথাই নেই—তাই তিনি এ যুগে যে গান
সর্বপ্রথম রেকর্ডে দিলেন সেটি কীর্তন সুরে।

এ সবই বাছ। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, কীর্তনে আছে কি যে শ্রোতা
কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে?

আছে অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত প্রেম। শ্রীরাধার মুখ
দিয়ে সহস্র সহস্র কবি শত শত বৎসর ধরে যা বলিয়েছেন তার
সার্বাংশ দেওয়া কি সহজ, না আমার বাদ বাকি জীবনটাতে কুলোবে!

রাধা বেচারী বিবাহিতা কণ্ঠা। ওদিকে কৃষ্ণ অতি শিশু বয়েস
থেকেই করেছেন একাধিক অলৌকিক কর্ম—মিরাকুল—বৃন্দাবনের
সর্বত্র তাঁর যশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনে সুন্দরী কুমারী
গোপিনীরও অভাব নেই। সেই বালকৃষ্ণকে ভালোবাসে সর্বগোপিনী,
তাদের মাতা, পিতামহী, বৃন্দাবনের সর্ব নরনারী। যে কোনো
কুমারী কৃষ্ণের অনুরাগ পেলে জীবন ধন্য মনে করবে কিন্তু তিনি
স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মুগ্ধ করলেন, আকর্ষণ করলেন, সম্মোহিত করলেন,
আত্মহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করলেন বিবাহিতা শ্রীরাধাকে।
একদিকে তার আনন্দ গরবের অস্ত নেই, অন্যদিকে তার শাশুড়ী ননদী
করে তুললো তার জীবন বিষময়। অলজ্ব্য বাধাবিপ্ল অতিক্রম করে
পাগলিনী শ্রীরাধা ছুটে আসতেন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনামাত্রই।
শত হুঃখ শত যন্ত্রণার মাঝখানেও শ্রীরাধা আনন্দে আত্মহারা—

আর হবেনই না কেন ? শ্রীকৃষ্ণের মত প্রেমিক এই ভারতবর্ষে
জন্মেছে ক'টি !

তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্বত্যাগিনী রাধার প্রেম অকাতরে
অবহেলা করে—আমি বলি অপমানিত পদদলিত করে চলে গেলেন
মথুরায় ।

শহূর্-ইয়ার, তুমি মথুরা বৃন্দাবন দেখেছ ?'

'মোটরে দিল্লী থেকে আগ্রা যাওয়ার সময় দেখেছি । ও ছুটো
তো খুব কাছাকাছি । ছুটোর শেষপ্রান্ত তো প্রায় মিলে গেছে ।'

'ঠিক বলেছ । সেই মথুরা থেকে তিনি এক দিনের তরে, এক
মিনিটের তরে বৃন্দাবনে আসেন নি শ্রীরাধাকে দেখতে । উণ্টে
বৃন্দাবনের ঐ অতি পাশের মথুরায়, বলতে গেলে শ্রীরাধার কানের
পাশে তিনি ঢাকঢোল বাজিয়ে করতে লাগলেন একটার পর একটা
বিয়ে—ক্লিক্‌ক্লিক্‌, সত্যভামা, আরো কে কে আমি ভুলে গিয়েছি, মনে
রাখবার কোনো সদিচ্ছাও আমার কোনোকালে হয় নি ।

বুঝলে শহূর্-ইয়ার, একেই বলে টায় টায় জিপ্টেড্‌ লাভ্‌ । তামাম
বিশ্বসাহিত্য তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এই হতভাগিনী 'জিপ্টেড্‌' শ্রীরাধার
শত যোজন কাছে আসতে এমন রিক্তা হ্রতসর্বস্বা তুমি পাবে না ।

তাই আকারে, গাণ্ডীর্ষে মহিমায় হিমালয়ের মত বিরাট কলেবর
বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুর—লাইট-মোতিক—জিপ্টেড্‌ লাভ্‌, পদ-
দলিত প্রেম ।

সে সাহিত্যে ছুঃখিনী শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যে কত কবি কত
দিক দিয়ে দেখেছেন, কত ভাবে বর্ণনা করেছেন তার সামান্যতম অংশ
কেউ অন্ধের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারবে না । শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক
ঠিক কি বলেছেন বই না খুলে বলা যায় না তবে যা বলেছেন তার
সারাংশ এই, মদ দেখলে নেশা হয় না, স্তূর্কলেও না, চাখলেও না,
এমন কি সর্বাঙ্গে মাখলেও না ।' মদ গিলতে হয় ।

'পদাবলীরস আকর্ষণ গিলতে হয় ।'

নয়

আজ রববার। সপ্তাহে মাত্র এই একটি দিন ডাক্তার আর শহর-ইয়ার একে অণ্ডকে নিরবচ্ছিন্নরূপে পায়। এ দিনটায় আমি দু ত্রো—ওয়ান টু মেনি—হতে চাইনে। তাই ব্রেকফাস্টে পৰ্বস্ত গেলুম না। খাই তো কুল্লে ছু কাপ চা—সে কর্মটি শুয়ে শুয়ে দিব্য করা যায়। মোগলাই কঠে বেয়ারাকে চা আনতে হুকুম দিলুম। কিন্তু উপটা বুঝলি রাম। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলেন ‘কপোত-কপোতী’। ডাক্তারের মুখে পুরো উদ্বেগ। চুকেই নার্ভাস কঠে দ্রুতগতিতে বলতে লাগলেন, ‘আপনার কি হয়েছে ? শরীর খারাপ ? জ্বর ? ব্যাথাট্যাখা ?’ শহর-ইয়ার খাটের পৈখানে কাঠের বাজু ধরে শুধু তাকিয়ে আছে। তার মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি ভালো করে কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে আমার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ‘আমি প্রথম দিনই স্থির করেছিলুম, সুযোগমত আপনার শরীরটা একটু দেখে নেব। এই বেলা সেটা করা যাক। আজ রববার, বেশ আহিস্তা আহিস্তা রফ্তা রফ্তা।’ আমি দ্রুতগতিতে বোঝাতে চেপ্তা করলুম, আমার স্বাস্থ্যটা পুরুষ্ট পাঁঠার মত, হজম করতে পারি ভেজালতম তেল, নিদ্রা ভিজেল ইডিয়টের চেয়েও গভীরতর—ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল রোঁদের পুলিশের চেয়েও। ডাক্তার কোনো প্রকারের আপত্তি না জানিয়ে, প্রশান্ত নিঃশব্দ হাসি মারফত প্রসন্নতা প্রকাশ করে আমার দেহটি বদখলে এনে তাঁর ইচ্ছামত উণ্টে পাণ্টে দেখতে লাগলেন, যেন ঘড়েল ক্যাশিয়ার হাজার টাকার নোটের কোনো না কোনো জ্বালের চিহ্ন খুঁজে বের করবেই করবে—কারণ ইতিমধ্যে, স্বামীর আদেশ হওয়ার পূর্বেই শহর-ইয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র, স্টিতস্কোপ এবং আরো কিছু আমার অচেনা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার একাধিকবার বললেন, 'আমি ডাক্তারী ভুলে গিয়েছি সে-কথা তো আপনাকে বলেছি। এটা নিছক, প্রাথমিক আনাড়ি পরীক্ষা। পরে আমার এক বন্ধু এসে পাকাভাবে দেখে যাবেন।'

আমি বললুম, 'আমি কি হিন্দুসমাজের অরক্ষণীয় যে আমাকে কাঁচা দেখা পাকা দেখা সব জুলুমই সহিতে হবে?'

ডাক্তার খুশী মুখে বললেন, 'ভালোই হল, ঐ কনে-দেখার কথাটা উঠলো। আপনার কাছে আমার একটা সর্বিনয় আরজ আছে। কিন্তু আপনার যদি কণামাত্র আপত্তি থাকে তবে আপনি দয়া করে অসঙ্কেচে আপনার অসম্মতি জানিয়ে দেবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি নিরাশ হব না।'

আমি বললুম, 'অত তকল্লুক করেন কেন? বলুন না খুলে।'

খোঁড়াদের চলার মত ইনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কথা বললেন। 'মানে, অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে এই; আমার অতি দূর সম্পর্কের একটি ভাগ্নী আছে। বাপ মা নেই—অরক্ষণীয় বলা যেতে পারে। আপনাদের অঞ্চলে বিয়ের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা কি পদ্ধতিতে হয় আমার জানা নেই। এ অঞ্চলে কিন্তু কনে পক্ষ কখনোই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় না—সে বড় শরমের কথা। হিন্দুদের মত প্রোকেশনাল ঘটকও আমাদের নেই। তাই চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে কনের মামার ভায়রা-ভাইয়ের ভগ্নীপতি, পারলে তার চেয়েও দূর সম্পর্কের কেউ তার কোনো বন্ধুকে—আত্মীয়কে নয়—বরের ভগ্নীপতির মেসো মশায়ের বেয়াইয়ের কোনো বন্ধুকে যেন ইঙ্গিত দেয় এই বিয়েটা সম্বন্ধে। তারপর স্টেপ বাই স্টেপ সেটা এগোয়। সেগুলো না হয় নাই বললুম। এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আজ সকালে বরের এক নিকট আত্মীয় এখানে আসছেন—ভজ্রলোক

আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন—কথাবার্তা আরেকটুখানি পাকাপাকি করার জন্ত। আপনি তো জানেন, এসব ছুনিয়াদারী বাবদে আমি একটি আস্ত গাধা। তাই আপনি যদি সেখানে—’

আমি বললুম, ‘আমি মানন্দে উপস্থিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমি এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিমানী। আলোচনার সময় যদি আমার কখনো মনে হয়, বরপক্ষ আমাদের কনেকে যেন নিতান্ত মেহেরবানী করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কিংবা—থাক, অর্থাৎ বাংলা কথায়, কনে কিংবা তার আর্থিক অবস্থা অথবা তার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো প্রকারের সামান্যতম কটাক্ষ যদি বরপক্ষ করে তবে লেগে যাবে ফৌজদারী। আমি খুব ভালো করেই জানি, সেক্ষেত্রে আমার সভাস্থল পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ আলোচনা চালু রাখার জন্তে তো অগ্নি মুকুব্বিরাও রয়েছে, কিন্তু আমি পারি না, আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি ও আমার ব্রহ্মরজ্জ দিয়ে যেন ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। অতএব বড়ই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, আলোচনায় আমার যোগদান করাটা কি আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?’

আমার কথা শুনে হুজুর্নাই এমন হাসি লাগালেন যে তার আর শেষই হয় না। ডাক্তার তার বউকে সঙ্গে সঙ্গে কি যে বলছেন সেটা আমার ঠাইর হলো না। পরে শুনলুম বলছেন, ‘ঠিক আমার আপন মামুর মত, ছবল যেন আমার আপন মামু এ কথাগুলো কইলেন! তুমি তাকে দেখো নি শহুর্-ইয়ার—তিনি চলে যান আমি যখন ম্যাট্রিকে। কী দস্ত, কী দেমাক ছিল ভদ্রলোকের! কিন্তু ঐ একমাত্র বিয়ের আলাপের সময়। অগ্নি সময় মাটির মানুষ বললেও কমিয়ে বলা হয়। আর তাঁর দোস্তী ছিল কাদের সঙ্গে, জানো? ছুনিয়ায় যত মুটেমজুর, গাড়োয়ান বিড়িওলার সঙ্গে। তিনি গত হলে পর আমরা তো বেশ জাঁকজমক করে তাঁর ফাতিহা (শ্রাদ্ধ) করলুম, আর বিশ্বাস করবে না, শহুর্-ইয়ার, আরেকটা আলাদা করলো তাঁর

টাঙাওলা বিড়িওলা দোসুৱা—তু'পয়সা, চার পয়সা করে চাঁদা তুলে তুলে।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই অত্যন্ত খানদানী ঘরের শরীফ আদমী ছিলেন।'

ডাক্তার বললেন, 'দি বেস্ট না হলেও ওয়ান অব্ দি ভেরি বেস্ট ইন্ মুর্শিদাবাদ। কিন্তু আপনি আঁচলেন কি করে।'

'উচ্চতম স্তরের লোক ভিন্ন অণ্ড কেউ নিম্নতম স্তরের সঙ্গে মেশবার হিম্মৎ কলিজায় ধরে না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আপনি, স্মার, কি এখনো উর্নবিংশ শতাব্দীতে বাস করেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উশ্টো। আমি বিংশ শতাব্দীও পেরিয়ে গিয়েছি। যে-কোনো প্রকারেই হোক মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে এই মান্কাতার আমলের কুসংস্কার আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ-নিয়ে আলোচনা পরে হবে। ওনারা আসবেন কখন?'

'দেৱী নেই, এনি মিনিট।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি জেনে নিই। কনের মা'র মহুর্ (স্ত্রীধন) কত ছিল?'

ডাক্তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'তাই তো। ওদের আবার কোন নেই যে শুধোবো।'

শহুর্-ইয়ার বললে, 'দশ হাজার।'

'সঙ্গে সেকুরিটি হিসেবে জমি-জমা, কলকাতার কোনো স্থাবর সম্পত্তি?'

'না।'

'মুহম্মদী চার শর্ত ছাড়া অণ্ড কোনো শর্ত ছিল যেটা বর ভাঙলে মেয়ে তালাক চাইতে পারবে?'

'না।'

'কনের কোনো ভাই বোন আছে?'

‘একটি দিদি ছিল। বিয়ের অল্প দিন পরেই মারা যায়।’
‘কাবিন্-নামায় (ম্যারেজ কন্ট্রাক্টে) ওর জীধন (মহু) কত
ছিল?’

‘হাজার পনরো।’

‘ওরা কত গয়না দিয়েছিল?’

‘হাজার তিনেকের।’

‘আর আমরা?’

‘ঐ হাজার তিনেক। তবে জেহজের খাটতোষক, ড্রেসিং টেবিল,
পেতলের কলসীটলসী নিয়ে হাজার পাঁচেক হবে।’

শহু-ইয়ারই সব কটা উত্তর দিলে।

ডাক্তার সত্যই একটা নিষ্কর্মা খোদার খাশী। ফ্যালফ্যাল করে
শুধু আমাদের কথাবার্তা শোনে আর তাকানোর ভাব থেকে অতি
স্পষ্ট বোঝা যায়, এ সব প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য তার মস্তকে আদৌ
প্রবেশ করে নি।

শহু-ইয়ারকে শুধালুম, ‘বরের বাড়ির মেয়েরা হরেদরে কত জীধন
পেয়েছে এবং বরেরা আপন আপন ছল্‌হিনকে (কনেকে) কত টাকার
গয়নাগাঁটি দিয়েছে সেটা বোধহয় জানেন না এবং আমাদের সূচতুর
ডাক্তারও সে খবর গোপনে গোপনে সংগ্রহ করেন নি। না?’

আমার অনুমান সত্য।

ডাক্তার মেয়েটি কি কি পাস দিয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে
কিনা এসব খবর দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি বললুম, ‘ওসব জেনে
কি হবে? তার জোরে জীধন বাড়াবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরপক্ষ
তাদের অস্ত্রাস্ত্র ছেলের বিয়েতে কাবিন্-নামায় কনে পক্ষের প্যাঁচের
টাইটে কি কি দিয়েছে সেটা জানতে পারলে, বেটার্‌ স্টিল ওদের
‘ছ’চারখানা কাবিন্-নামার কপি যদি গোপনে গোপনে জোগাড়
করে রাখতেন তবে সেগুলো হতো আমার এ্যাটম বম্। এখন যা
অবস্থা, মনে হচ্ছে, গাদা বন্দুকটি পর্যন্ত হাতে নেই।’

‘প্রাইজ-ইডিয়ট আর কারে কয় ! ডাক্তার বলে কি না, বরপক্ষকে শুধোলেই তো সব জানা যাবে।

আমার কান্না পাবার উপক্রম। বললুম, ‘ওরা জলজ্যান্ত মিথ্যে খবর দেবে। আর আমিও কনে পক্ষের সুবিধের জন্তে যে ধাণ্ডারিং মিথ্যে বলবো না, সে প্রতিজ্ঞাও করছিনে।’

শহূর্-ইয়ারকে শুধালুম, ‘আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন?’

‘না।’

‘একসেলেণ্ট! কিন্তু আপনি কোথাও পালাবেন না। কোনো খবরের দরকার হলে আপনার কাছে কোনো অছিলায় চলে আসব।’

‘আমি ওঁদের জন্তে খাবার-দাবার তৈরী করার তদারকীতে থাকবো।’

বেয়ারা খবর দিল ওঁরা এসেছেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন। আমি পা বাড়াতেই শহূর্-ইয়ার ছুঁছুঁ মুচকি হাসি হেসে বললে, ‘আপনাকে যে কত রূপেই না দেখব! এখন দেখছি ঘটক রূপে। এও এক নব রূপ।’ গুনগুন করে গান ধরলো—

‘তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

ডাক্তার মহা সাড়ম্বরে বর পক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি যে কনে পক্ষের হয়ে এই আলোচনায় যোগ দিতে রাজী হয়েছি তার জন্তে তিনি এবং তাঁর পরিবার নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছেন। কনে পক্ষের দু’জনও তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম তাঁদের গোপ্তীতে অজানা নয়।

ডাক্তার বললেন, ‘ইনি আছেন বলে আমার আর কোনো ছশ্চিন্তা নেই যে, আমরা অতি সহজেই সব বিষয়েই একমত হয়ে যেতে পারবো।’

আমি এ-জাতীয় অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম—অজ্ঞজন যাকে বলে বিবাহের শর্তগুলি স্থির করার জন্তে বর ও কনে পক্ষের মধ্যে আলোচনা

—শেষবারের মত দেখেছি দেশে । তার পর ছ’একটি বিয়ে-শাদীতে
আনুষ্ঠানিকভাবে পেট ভরে খেয়ে এসেছি—বাস্ ।

আমি সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার শেষ অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রামে
আমার অদৃশ্য তলওয়ারটাতে শান দিতে লাগলুম ।

কিন্তু হা কপাল ! সব বেকার, সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল !

এ জাতীয় আলোচনা সব সময়ই আরম্ভ হয় মহর্ বা জীধনের
পরিমাণ নিয়ে । কনের দিদির জীধন পনেরো হাজার ছিল তারই
স্মরণে গুনগুন করলুম, ‘কুড়ি হাজার ।’

আমি ছিলাম তৈরী যে তাঁরা মূহু হাস্য করে অতিশয় ভদ্রতা
সহকারে দশ হাজার দিয়ে দর কষাকষি আরম্ভ করবেন । ইয়া আল্লা !
কোথায় কি । ছ’জনাই অতি প্রসন্ন বদনে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে
নিলেন ! আমি তো সাত হাত পানিমে’ !

মূহুকণ্ঠে বললুম, ‘আপনারা তো সবই জানেন, কনের বাড়ির
হালও জানেন ; গয়নাগাঁটি আমরা আর কি দেব আপনারাই
বরণ একটা আন্দাজ দিন ।’

ফের কাটলো বম্-শেল ! ছ’জনাই সাত তাড়াতাড়ি বললেন,
‘একি বলছেন, সাহেব । না, না, না । আপনারা যা খুশ্ দিলে
দেবেন আমাদের পক্ষে সেইটেই গণিমৎ (বৈভব, সৌভাগ্য) ।’

তার পর ওঁরা নিজের থেকে যা বললেন তা শুনে, বিশেষ করে
‘খাটি ইয়ারস উয়োরের’ স্মরণে, আমি আমার কান ছটোকে বিশ্বাস
করতে পারলুম না । ওঁরা কনেকে কি গয়নাগাঁটি দেবেন সে প্রশ্ন
ইতিউতি করে আমি শুধোবার পূর্বেই তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন,
‘মাফ করবেন, আর আমাদের পক্ষ থেকে তো বলার কিছু নেই ।
আপনারা জানেন ছল্‌হার (বরের) ভাইবোন নেই । কাজেই
ছল্‌হিনই শাশুড়ীর সব-কিছু পাবেন এ তো জানা কথা, আর আমরাও
সেই কথাই দিচ্ছি । তার দাম—’ ভদ্রলোক সঙ্গীকে শুধোলেন,
‘কত হবে ভায়া ?’ সঙ্গী বললেন, ‘হালে যাচাই করা হয়েছিল ।

কুড়ি হাজারের কম না। তিন পুরুষের পুরনো গয়না, নূতন করে গড়াতে হবে।’

‘কুড়ি হাজার’—বলে কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বললুম, ‘অমন কম্বিটি করতে যাবেন না। আল্লার মেহেরবানীতে ভালোয় ভালোয় আকুৎ-রসুমাৎ (পরিপূর্ণ শাদী) হয়ে যাক তখন না হয় ছল্‌হিন্ তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করবেন। কি বলেন ডাক্তার? আর আপনারা?’

দুজনেই সানন্দে সায় দিয়ে, একজন বললেন, ‘আমার মেয়ে বলছিল, পুরনো ফ্যাশন নাকি আবার হাল ফ্যাশন হচ্ছে! এখন ভেঙে গড়ালে পরে হয়তো ছল্‌হিন্‌ই—’ কথাটা তিনি আর শেষ করলেন না।

ইতিমধ্যে নাশ্তা আসতে আরম্ভ করেছে। সে আসা আর শেষ হয় না। নাশ্তা না বলে এটাকে হুক্ক-মাফিক ব্যানকুয়েট বলা উচিত। বরপক্ষ ক্রমাগত আমাদের শুনিয়ে একে অণ্ডকে বলে চলেছেন, ‘হবে না কেন? চিরকালই হয়ে আসছে এরকম। ঐয়ার ওয়ালেদের (পিতার) আমলে আমি কতবার খেয়েছি এ রকম। আমার দাদাকে (ঠাকুদা) কত শত বার বলতে শুনেছি, ঐয়ার ঠাকুদার শাদীর দাওয়াৎ! তিন রকমের খানা তাইয়ার হয়েছিল। তিন বাবুর্চীর একজন এসেছিল পাটনা থেকে, অণ্ডজন দিল্লী থেকে আর তিসরা হায়দ্রাবাদ নিজামের খাস বাবুর্চী-খানা থেকে। আর—’ চললো তো চললো—তার যেন শেষ নেই।

নাশ্তার বাসন-বর্তন খাওয়াদাওয়ার পর যখন সরিয়ে নেওয়া হলো তখন আমি অতিশয় মোলায়েম সুরে বললুম, ‘আমার একটি আর্জ্ আছে; যদি অভয় দেন—’

উভয়ে সমস্বরে বললেন, ‘আপনি আর্জ্‌ না, হুকুম করুন।’

আমি বললুম, ‘আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা বোধ হয় আদালতে টেকে না। কুরান শরীফের কানুন মতাবেক যে কোনো মুসলমান

চারিটি বীবী একই সময়ে রাখতে পারে। এখন আমরা যদি কাবিন্-নামায় ছল্‌হার কাছে শর্ত নিই অর্থাৎ আপনারা যদি মেহেরবানী করে সে শর্ত কবুল করেন যে তিনি ছল্‌হিনের বিনা অনুমতিতে দুসরী শাদী করবেন না, তবে আইনত সেটা বোধ হয় আলট্রা ভাইরেস্। আদালত খুব সম্ভব বলবে, “কুরান শরীক মুসলিমকে যে হুক্ক দিয়েছেন, মানুষ একে অস্ত্রের কাছ থেকে শর্ত আদায় করে সে হুক্ক খর্ব করতে পারে না।” আমি এতক্ষণ ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম।’

কন্যাপক্ষ বললেন, ‘আমরা খুশীর সঙ্গে সে শর্ত দেব। সে শর্ত আপনাদের তরফ থেকে নিতে তো কোনো দোষ নেই। তার মূল্য শেষ পর্যন্ত যদি না থাকে তো নেই। এখন নিতে আপত্তি কি?’

সমস্ত বাক্যালাপটা আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকছিল। কোথায় গেল সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লড়াই? আলোচনার নামে চিৎকার, রাগারাগি, নাশ্‌তা স্পর্শ না করে বরপক্ষের সভাত্যাগ; এমন কি বিয়ের রাত্রেও—উভয় পক্ষ ততদিনে বিয়ের প্রস্তুতির জন্তু হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন—কাবিন্-নামা লেখার সময় সামান্য একটা শর্ত নিয়ে বচসা, তারপর মারামারি, সর্বশেষে বিয়ে ভঙুল করে বরপক্ষ বাড়ি যাবার পথে অণু কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ পর্ব সমাধান করে মুখ রক্ষা করলো—এ ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়েছে।

আর আজ দেখি তার উল্টো! আমি যা শর্ত চাই সেটাতেই তাঁরা রাজী! যেন সমস্ত কলকাতা শহরে আর কোনো বিবাহযোগ্য্য কুমারী নেই! এই ত্রিশ বছরে ছনিয়াটা কি আগাপাস্তলা বদলে গেল?

এ অবস্থায় আর খাঁই বাড়ানো চামারের আচরণ হবে। শুধু বললুম, ‘আর বাকী যেসব ছোটোখাটো শর্ত আছে, যেমন আমাদের মেয়ে যদি—আল্লা না করুক—খশুরবাড়ির সঙ্গে মনোমালিগ হেতু বাপের বাড়িতে এসে কিছুকাল বা দীর্ঘকাল বাস করে তবে সে

শ্বশুরবাড়ি থেকে কত টাকা মাসোহারা পাবে, আপনারা যে জীখন দেবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তার জিন্দাদার কে কে হবেন, এ সবের জন্ত আর চিন্তা করতে হবে না। বিয়ের পূর্বে আমাদের উকীলের সঙ্গে আপনাদের উকীল বসে এ-সব কর্মালিটিগুলো ছরুস্ত করে নেবেন। আজ আমি এতই খুশী যে বিনা তর্কে বিনা বাধায় বড় বড় শর্তগুলো সম্বন্ধে একমত হতে পেরেছি যে অন্ত আর কোনো ছোটো শর্ত স্পর্শ করতে চাইনে।’

সবাই সমস্বরে তখন আমাকে অমুরোধ করলেন আমি যেন আল্লার কাছে শুকুরিয়া জানিয়ে একটি মনাজাত (প্রার্থনা) করি। এসব মোল্লাদের (পুরুৎদের) কাজ,—তারা ছ’পয়সা পায়ও—এসব আমাদের (অর্থাৎ ‘স্মৃতিরত্নদের’) কাজ নয়। তবু অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা সমাপ্ত করলুম।

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব ছেলেবেলায় এ বাড়ির দু'তিন জন অতি বৃদ্ধ মুরুবিবর কোলে বসে তাঁদের আদর পেয়েছি, আর মনে আছে, আমাকে আদর করতে করতে হঠাৎ তাঁরা কেঁদে ফেলতেন। আমি তখন এই বিরাট বাড়ির বিরাট গোষ্ঠীর একমাত্র সন্তান। আপনি যে-সব প্রশ্ন শুধোলেন, এর অধিকাংশের উত্তর এই মুরুবিবরা নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু আমি তখন এতই অবোধ শিশু যে আমাকে তাঁরা প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনীই বলেন নি।'

একটি অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু এই বৃদ্ধেরা একটা গভীর পরিতৃপ্তি সঙ্গে নিয়েই ওপারে গেছেন। ঐ নিতান্ত শিশু বয়সেই আমি ওঁদের নামাজের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, বসে, সজ্জা দিয়ে তাঁদের অনুকরণ করতুম, তাঁদের কোলে বসে মসজিদে যেতুম, আর বাড়িতে শিনী বিলোবার সময় সদর দরজায় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আমাকে তাঁরা তখন একটা খুব উঁচু কুর্সীতে বসিয়ে জমায়েত গরীব-ছুখী, নায়েব-গোমস্তা সবাইকে বলতেন, 'ইনিই বাড়ির মালিক; ঐর লুকুমমত চললে আমাদের দোওয়া তোমাদের উপর থাকবে।' আর সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন, সৈয়দ সাহেব, আমার আপন ঠাকুদার বড় ভাইসাহেব, যিনি তখন বাড়ি চালাতেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন আমার পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'ভাইয়া, শোনো। 'মির্জাপুর (উনি অবশ্য মীরজাকর-ই বলতেন) অঞ্চলে আজ আরেকটা বাড়ি কেনা হলো। ঠিক আছে তো?' কিংবা ঐ ধরনের ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু-একটা। আজ ঐ ছবিটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন হাসি পায়। 'ঠাকুদা খবরটা দেবার সময় ভাবখানা করতেন, যেন তিনি আমার নায়েব, কিছু একটা করে এসে

হুজুরের পাক্কা সম্মতি চাইছেন! এরকম একাধিক ছবি আমার চোখের সামনে এখনো আবছা-আবছা ভাসে।

ছ'মাসের ভিতর তিন ঠাকুদাকেই গোরস্তানে রেখে এলুম। আমার তখনকার শিশু-মনের অবস্থা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো না।

ঐ যে পুরো একটা উইং জুড়ে রোজ সন্ধ্যায় সাজানো গোছানো ঘরে আলো জ্বলে তাঁরা ঐখানে বাস করতেন, তাঁদের আপন আপন শ্বশুরবাড়ির কিংবা ঐ ধরনের কিছু কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে। বহু বৎসর পরে আমাদের প্রাচীন দিনের নায়েব সাহেব আমাকে বলেন, 'ঐ বুড়া ঠাকুদারা তাঁদের মৃত্যুর বছরখানেক আগে কলকাতার অগ্রত পুষ্টিদের জন্তু ভালো ব্যবস্থা করে দেন, ঠাকুদারা নাকি চান নি যে তাঁরা এ বাড়িতে পরবর্তী কালে আমার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেন।'

আমি শুধালুম, 'এই নায়েব নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। ভিনি আপনাকে প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনী বলেন নি? পাড়ার আর পাঁচ বুড়ো?'

'কি করে বোঝাই, ডাক্তার সাহেব, বাপ মা, আমার আপন ঠাকুদা নিয়ে চারজন ঠাকুদা—আমার আপন ঠাকুদা আর পাঁচ জন চাচা মারা যান আমার জন্মের পূর্বে—ঐদের সবাইকে হারিয়ে ছ' বছর বয়েস থেকে আমি একা—এই বিশাল বাড়িতে একা। শুধু নায়েব সাহেবের ক্ষুদ্র পরিবার এবং তাঁর এক বিধবা পুত্রবধু—ইনিই আমাকে মানুষ করেন আপন ছেলের মত করে। কিন্তু আমার এমনই কিস্মৎ, ঐরাও সবাই চলেন গেলেন ওপারে—ততদিনে আমি মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। বাকি রইলেন, শুধু আমার ঐ মা-টি। তাঁকেও হারালুম এমন এক সময় যে আমি রাতে হাউ হাউ করে কেঁদেছি। এই মা আমার আত্মগোপন করে শহর-ইয়ারকে গোপনে দেখে এসে আমাকে বললেন, 'জুল্ফিকার, আমি নিজে হুল্হিন দেখে তোমার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। এইবারে তুমি রাজী

‘লেই আমি পাকা খবর পাঠাই।’ আমি জানতুম, ঐ নিঃসন্তান
 দ্বার ঐ একটি মাত্র শেষ শখ। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রক্ত
 স্পর্ক নেই, সুদূরতম আত্মীয়তাও নেই, অথচ তিনি আমাকে দিনে
 দিনে মানুষ করে তুলেছেন সামান্যতম প্রতিদানের চিন্তা পর্যন্ত না
 করে,—ঘোর নেমক-হারামী হতো ঐর শেষ আশা পূর্ণ না করলে।
 আমার বিয়ে তো করতেই হবে একদিন—বংশরক্ষা করার জন্তে, অথচ
 কোনো কারণ থাক্ আর নাইবা থাক্। বিয়ে না করলে আমার
 পিতৃপুরুষ পরলোক থেকে আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, এ-কুসংস্কার
 আমার নেই; কিন্তু তাঁরা যতদিন এ-লোকে ছিলেন ততদিন আমিই,
 একমাত্র আমিই যে তাঁদের শেষ আশা, আমিই তাঁদের বংশরক্ষা
 করবো—সে-আশা যে এ বাড়ির বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতি
 মুহূর্তে আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাকে প্রাণবায়ু দিচ্ছে।
 এক মুহূর্ত চিন্তা না করে ‘সম্মতি’ দিলুম।’

আমি শুধালুম, ‘ইতিমধ্যে আপনি প্রেমট্রেমে পড়েন নি ?
 লকাতার ডাক্তারি শিক্ষা বিভাগ পাছে আমার বিরুদ্ধে মানহানির
 ন্যায়কন্দমা করে তাই সভয়ে বলছি, অণুদের তুলনায় প্রেমট্রেম করার
 ধিবে আপনাদেরই তো বেশী। আর আপনার চেহারা, ধনদৌলত—’
 হেসে বললেন, ‘প্রেমট্রেম হয় নি, তবে মাঝে মাঝে যে চি^{“ড}
 াঞ্চলা হয় নি একথা অস্বীকার করলে গুনাহ্ হবে। তবে, ^{স্বার}
 ানেন, আমি যে মুসলমান সে-বিষয়ে আমি সচেতন এবং তাই নিয়ে
 আমার গর্ববোধ আছে। ওদিকে হিন্দুরা নিজেদের মুসলমানের
 গাইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন। সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রত্যেক
 গাতই—একস্ট্রিম এবনরমেল কণ্ডিশন না হলে—নিজেকে অণু
 গাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অবশ্য এসব বাবদে সম্পূর্ণ উদাসীন
 হাজনও কিছু কিছু সব সময়ই পাওয়া যায়। আমার সহপাঠী
 হকর্মা প্রায় সবাই হিন্দু, কিছু কিছু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, যে ছ’এক
 জন মুসলমান তাঁরা থাকেন হস্টেলে। কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে

অন্তরঙ্গত! হয়—এখনো আছে—এবং তাঁরা অত্যন্ত সজ্জন বলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বোনদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেন। সেখানে প্রেম করে হিন্দু পরিবারে বিপর্যয় কাণ্ড বাধাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না—তছপরি কোনো হিন্দুতরঙ্গী যে আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেটাও আমার গোচরে আসে নি।’

আমি বললুম, ‘অত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রেম হয় না। তারপর কি হলো, বলুন।’

ডাক্তার বললেন, ‘পাকা হক্ কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে এখন পুরনো কথায় কিরে যাই। বিয়ের সম্মতি পেয়ে আমার মা তো আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। বাড়ির লোকজন পাড়াপড়শী সবাইকে বার বার শোনান—যা দিনকাল পড়েছে, আপন গর্ভের সন্তান মায়ের মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয় না। আর আমার জুল্ফিকার একবার একটা প্রশ্ন পর্ষস্ত জিজ্ঞেস করলো না, ছল্হিন্ কোথাকার, লেখাপড়ি করেছে কি না, দেখতে কি রকম। বললে, মা, তুমি যখন পছন্দ করেছ, তখন নিশ্চয়ই ভালো হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলে।’

তারপর বুড়ির দিনগুলো কাটলো বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

চাচা আমাদের বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে তিনি হার্টফেল করে বয়োয় নিলেন।’

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকার পর বললেন, ‘হ্যাঁ, ঐ প্রাচীন যুগের নায়েব সাহেবের কথা হচ্ছিল যিনি যথের মত এ গোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি জীবনের শেষ দিন পর্ষস্ত আগলিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি, কারণ আমার দিক থেকে তিনি কখনো কণামাত্র কোঁতুহল দেখতে পান নি। আর তিনিই বা এসব কথা আমার স্মরণে এনে কি আনন্দ পাবেন? ঠাকুন্দাদের বয়েসি নায়েব সাহেব আমার ঠাকুন্দার বাবাকেও তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন, তাঁর জন্ম হলে নাকি আকবরী মোহর দিয়ে

তিনি তাঁর মুখ দেখেছিলেন। কারণ তাঁর বাপ ছিলেন আমার ঠাকুদার ঠাকুদার নায়েব। এবং সেই ঠাকুদার ঠাকুদার আব্বা বানান এই বাড়িটা। তিনি তাঁর ভাই বেরাদর ভাতিজা ভাগিনা, আপন এবং ভাই-ভাতিজাদের শালা-শালাজ জ্বাতিগোষ্ঠী পুশ্টি, মসজিদের ইমাম সায়েব, মোয়াজ্জিন (যে আজান দেয়), পাশের মকতবের গোটা চারেক মৌলবী—মকতবটা বহুকাল উঠে গেছে—বিষয়-আশয় দেখবার ছ'পাঁচজন কর্মচারী, ডজনখানেক মাদ্রাসার গরীব ছাত্র নিয়ে এ বাড়িতে থাকতেন। এইটুকু ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছি।

কিন্তু মোদ্দা কথা এই: ঠাকুদাদের গোর দেবার সময় আমার অতীত এবং এ-বাড়ির অতীতকেও আমি যেন আমার অজ্ঞানতে সঙ্গে সঙ্গে গোর দিলুম। বুদ্ধিবুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীতের প্রতি কৌতূহল, আকর্ষণ ছোটোই যেন আরো নিভে যেতে লাগল, বরঞ্চ উর্পেট অতীতের প্রতি যেন আমার একটা রোষ জন্মাল। মনে হলো সে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছে। আমাকেও তো সে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতো। আমি কি তার যক্ষ যে এ বাড়ি ভূতের মত আগলাবো ?

আমার মনে হয়, বুড়া নায়েব এবং পাড়ার পাঁচবুড়ো আমার চোখেমুখে অতীতের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দেখতে পেতেন এবং তাই স্বেচ্ছায় ঐ পাক ধ্যাটাতেন না।

আর বলতে গেলে তাঁরা বলবেনই বা কি? সেই ১৮২৫-এর গমগমে বাড়ি কি করে একজনাতে এসে ঠেকলো। একজন একজন করে সঙ্কলের 'বংশলোপ পেল—এ ছাড়া আর কি? আপনিই বলুন, সে-সব শুনতে কার ইচ্ছে যায় ?

তবে হ্যাঁ, কারো যদি ইচ্ছে যায় পুরো ইতিহাসটা গড়ে তোলাবার, তবে সে সেটা করতে পারে—কিন্তু বিস্তর তকলীফ বরদাশত করার পর। নিচের তলায় 'এল্' উইণ্ডের শেষ ছুখানা ঘরে আছে, যাকে

বলতে পারেন আমাদের পারিবারিক আর্থিক অর্থাৎ মহাক্ষেত্র-খানা। ১৭৮০ বা ৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যেমন যেমন দলীল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ, কর্মচারীদের রিপোর্ট, মোকদ্দমাসংক্রান্ত কাগজ এবং আরো শত রকমের ভিন্ন ভিন্ন কাগজপত্র, টুকিটাকি প্র্যাকটিকাল কারবার-ব্যবসায়ের জঞ্জাল বেকার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রেখে দেওয়া হয় ঐ ছুখানা ঘরে। বেশ যত্নের সঙ্গেই রাখা হয়েছে, এবং পুরুষানুক্রমে নায়েবরাও সেগুলোর যত্ন নেন। শহর-ইয়ারও মাস তিনেক অস্তর অস্তর সেগুলোর তদারক করে। আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, আমার কিস্তি মাথা পরিমাণ দিল্-চস্পী এ-সব কাগজপত্রের প্রতি নেই।’

আমি চুপ করে ভাবলুম এবং ডাক্তারকে মোটেই কোনো দোষ দিতে পারলুম না। যে অতীত তাঁর গোপ্তীর সব-কিছু নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে তাকে আবার যত্নআত্তি করে পুঁথির পাতায় লেখার কি প্রয়োজন? এবং এর সঙ্গে আরেকটা তত্ত্ব বিজড়িত আছে। পরিবারের অতীত ইতিহাস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে তাদের বেশীর ভাগই কেমন যেন পূর্ব ইতিহাসের স্মরণে বেশ-কিছুটা দস্তী হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের ডাক্তার তো ককীর, সূফীর বিনয় আচরণ ধরেন, সংসারে থেকে, গৃহীক্ৰুপে।

একটু ‘প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি দেখিয়ে শুধালুম, ‘এই যে শূন্য অঙ্ককার একতলা, দোতলার একটা পুরো উইং, তেতলা—এগুলোর একটা ব্যবস্থা করেন না কেন?’

‘কি ব্যবস্থা? ভাড়া দেওয়া ছাড়া আর গতি কি? কলকাতায় আমার যে-সব বাড়ি ভাড়ায় খাটছে তার আমদানীই আমাদের ছ’জনার পক্ষে যথেষ্টেরও ঢের ঢের বেশী। পরিবার যে অনতিবিলম্বে বৃহত্তর হবে তার সম্ভাবনাও তো দেখছি।’

এর পর ডাক্তার কি বলেছিলেন সেটা আমি সম্পূর্ণ মিস করলুম, কারণ আমার মনে তখন অদম্য ইচ্ছা যে তাঁকে শুধোই : দশ বছর

লা তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এখনো কোনো বংশধর না আসার কারণ
 ? তিনি স্বয়ং ডাক্তার, তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে
 রেন, প্রয়োজন হলে বিদেশে যেতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছেটা অতি কষ্টে
 ন করলুম। আমি ভীক; যদি কোনো অপ্রিয় সংবাদ শুনতে হয়।

আবার কান পেতে শুনলুম, বলছেন, ‘অতি বিশ্বস্ত আমাদেরই
 চীন নায়েব বংশের ছেলে এখন নায়েব আছেন, কর্মচারীরাও
 ধস্ত, তবু আমার জান পানি পানি। নায়েবকে আমি সর্ব ডিসিশন
 বার ভার কমপক্ষে সাতান্নবার বলেছি, বিরক্ত হয়ে কাগজ লিখে
 কে তার বাড়িতে পাঠিয়েছি। কোনো ফল হয় নি। সে কাজ করে
 য় তার আব্বার কাছ থেকে ঐতিহ্যগত যে পদ্ধতিতে কাজ
 খেছে। দুদিন অন্তর অন্তর এ-বাড়িতে এসে সভায় নয়নে উঁকিঝুঁকি
 রে—হুজুরকে কখন বিরক্ত না করে দুটো ডিশিশন ফাইনেলাইজ
 র নেওয়া যায়। এই উঁকিঝুঁকিটা আমাকে বিরক্ত করে আরো
 ঙ্গী। আমি কি বাঘ, তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব! যদিও তার
 প বেঁচেছিলেন, আমি ছিলুম সুখে। সপ্তাহে একদিন এসে
 মিনিট ধরে গড়গড় করে যা কিছু করেছেন সেগুলো বলে নিয়ে
 ধাতেন, “ঠিক আছে তো, মিয়া?” অনেকটা আমার সেই
 হুদার রিপোর্ট দেওয়ার মত। অবশ্য প্রায় দুটি বছর সর্ব আপত্তি,
 তিবাদ, চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বলতে গেলে প্রায় আমার
 নে ধরে সব কটা বাড়ি বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, সব
 জ শিখিয়েছেন। ঐ সব বাড়ি আর তাদের ভাড়াটে আমার
 ঙ হুনিয়ার দোজখ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখন যদি একতলা আর তিনতলাটা ভাড়া দি তবে সেটা খাল
 টে ধরে কুমির আনা নয়, সেটা হবে ক্লাইভ এনে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনা
 ঙ। সিরাজ্-উদ-দৌলার মত আমার মুণ্ডুটি যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা যে একেবারেই ভাবি নি তা নয়,
 ত্ত আমার সময় কোথায় ?’

এগারো

আল্লাতারা যাকে খুশী তোলেন, যাকে খুশী নামান—এ সত্য।
পাপীতাপী আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

ডাক্তারের ভাগীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তার অবতরণিকাঃ
যে কৃতিত্ব সব-কিছু ছরুস্ত-সহী করেছিলুম তাই নিয়ে বেশ একা
আত্মপ্রসাদ—এমন কি দস্ত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অমুভঃ
করছিলুম। অবশ্য বরপক্ষ যদি একটুখানি লড়াই দিত তা হলে
তাদের ঘায়েল করে কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদ হতো পরিতৃপ্তি ভরা। ত
ওরা যদি লড়াই না দেয়, তবে আমি তো আর ডনকুইকসটের মত
উইগুমিল আক্রমণ করতে পারিনে!

কিন্তু শুয়ে শুয়ে সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করার পরও যে স্তঃ
পাচ্ছিলুম, সেটা অস্বীকার করবো না।

এমন সময় মুর্চক মুর্চক হেসে শহর-ইয়ার খাটের পৈখাটে
দাঁড়াল।

বিজয়ী সেনাপতি যে রকম পদাতিকের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিষ্ক্ষেঃ
করেন, আমিও ঠিক তেমনি শহর-ইয়ারকে যেন মেহেরবানী মন্জুঃ
করে বললুম, 'বসতে পারেন।'

তারপরই ফাটলো আমার চাউস বেলুনটা!

শহর-ইয়ার হাসি মুখে বললে, 'বলুন তো, আমরা কতবাঃ
আলোচনা করেছি—মুসলমান মেয়েদের পর্দার আড়াল খেবে
বেরনো নিয়ে। পাল্লায় তুলেছি একদিকে সুবিধেগুলো, অন্য় দিবে
অসুবিধাগুলো এবং যেহেতু আমরা উভয়ই শেষ রক্তি তক্ ইমানদাঃ
সদাগর তাই কখনো আপনি বাটখারার পর বাটখারা চাপিয়ে
গেছেন একদিকে আর আমি অন্য় পাল্লায় চাপিয়ে গেছি মালের পঃ
মাল। তারপর হয়তো আপনি চাপিয়েছেন মাল আর আঃ

টখারা । তার অর্থ, আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে বিপক্ষে যা যা যা
কি আমরা বের করেছি কেউ কোনোটা লুকিয়ে রাখি নি । নয় কি ?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই । এ নিয়ে তো আমরা কেউ কোনো
।কারের সন্দেহ এষাবত প্রকাশ করি নি । আপনার মনে কি
ফানো সন্দেহের উদয় হচ্ছে !'

শহূ-ইয়ার জিভ কেটে বললে, 'উপরে আলা ; সন্দেহের
।বকাশ নেই ।

আমি শুধু এসেছিলুম আরেকটি অতি সত্ত্ব আবিষ্কৃত যুক্তি নিয়ে
যটা মুসলমান মেয়েদের অন্দর-ত্যাগের স্বপক্ষে যায় । আপনি তো
সদিন আমাদের ভাগ্নীর জন্ত অবিশ্বাস্ত অঙ্কের স্ত্রীধন, প্রচুর গয়না,
গ্রমন কি শেষ পর্যন্ত আইনে টেকে কি না টেকে এমন একটি শর্তও
গাণীর সুবিধার জন্ত আপনার সুললিত রসনা সঞ্চারণ করে বিস্তর
দাঁলত জয় করে—রূপকার্থে বলছি—লোহার সিন্দুকে তুলে
।থলেন । আপনার ডাক্তার সে 'কেরদানী দেখে অঁচৈতন্ত ।
পাছে আপনার গাজ মোটা হয় তাই তাঁর সবিস্তর প্রশস্তিগীতি আর
গাইবো না । তবে একটি বাক্য আপনাকে শোনাই । তিনি
বললেন, "এরকম মধুর, ললিত বিদগ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মানুষ যে
নিষ্ঠুর কাবুলীওলার মত তার প্রাপ্যের অগুনতি গুণ বেশী চাইতে
পারে—এ আমি স্বকর্ণে না গুনলে কক্থনো বিশ্বাস করতুম না ।"
তা সে যাক্ । এইবারে আসল তত্ত্বটি অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন ।

আমাদের ভাগ্নী তো তাঁর প্রাচীনপন্থী চাচার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া
করে যেতে আরম্ভ করলো কলেজে—অবশ্যই 'কালো তাঁবু' নামক
বোরকা সর্বাঙ্গে লেপ্টে নয় । মেয়েটি যে বেহেশতের হরীর মত
খাপসুরত, তা নয়—তবে সুস্ত্রী, স্বাস্থ্যবতী আর চলাফেরায়, কথাবার্তা
বলায় হায়া-শরম আছে । লেখা-পড়ায় খুবই ভালো, প্লেস পাবার
সম্ভাবনাও কিছুটা আছে, এবং গোঁড়া চাচাটিকে না জানিয়ে
হিন্দু বান্ধবীদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল ইসলাম ও অতুল-

প্রসাদের গানও বেশ খানিকটে আয়ত্ত করে ফেলল। গলাটি মিষ্টি তাই গানের ভুলচুকগুলো ওরই তলায় চাপা পড়ে যায়। চাচা অবশ্য এসব কীর্তিকলাপের কিছুই জানেন না, শুধু মাঝে মাঝে দেরিতে বাড়ি ফিরলে একটুআধটু চোটপাট করেন। তাও খুব বেশি না, কারণ তিনি কখনো কলেজে পড়েন নি, তছপরি কোনো মানুষ-তাই কলেজের কায়দা-কেতা, এমনিতে কখন, কলেজ ছুটি ফ্রান্‌কশন থাকলেই বা কখন, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর।

কিন্তু বাদবাকি ছনিয়াটা তো আর বেথেয়াল নয়। একটা এ. এ. ক্লাসের ছেলে তাকে লক্ষ্য করছিল বছর দুই ধরে। কারণ ভাগ্নী যে-বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে গান শিখত ছেলেটি থাকে তার সামনে বাড়িতেই। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল ভাগ্নীর মিষ্টি গলাটি শুনে, তারপর সামান্য অহুঁসন্ধান করে তার সম্বন্ধে বাদবাকি খবর যোগা করলো। বিবেচনা করি ছোকরা আকাশ-ছোঁয়া লক্ষ্য মেরেছিল যখন জানতে পারলো মেয়েটি তারই মত মুসলমান। ইতিমধ্যে আবার এম. এ. পাস করে কোনো একটা কলেজের লেকচারার হয়ে গিয়েছে। তাকে তখন ঠেকায় কে ?

ভাগ্নীর নাম ঠিকানা, তার সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত তার চাচা যে ভাবীকে বয়ান করে বললে, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও—অবশ্য সোজাসুজি না, কনে পক্ষের এক দূর আত্মীয়ের কাছে। আলাপচারিতা বেশ খানিকটে এগিয়ে যাওয়ার পর স্থির হলো, অমুক দিন বরপাশ থেকে অমুক অমুক মুকুব্বী মহর্ ইত্যাদি স্থির করবার জন্তু আমাদের বাড়িতে আসবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ভাগ্নীর চাচা খবর নিয়ে জেনেছেন ছেলেটি সত্যিই অত্যন্তম দুর্লভার পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের এখানে এসে আলোচনা করার আগের দিন সেই দুর্ভাগ্যলোক—খাঁদের সঙ্গে পরে আপনি কথাবার্তা কইলেন—দুর্লভ বাপ মা এবং অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসে আলোচনা করে জেনে নিলেন, মহর্, গয়নাগাটি, কালতো শর্ত যদি আসে

চাই ইত্যাদি তাবৎ আইটেমে তাঁরা কতখানি ম্যাকসিমামে উঠতে পারেন। এবং আকছারই এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তার ব্যত্যয়ও হলো না। রাত ছুটো না তিনটে অবধি দকে দকে আলোচনা করার সময় বিস্তর মতভেদ, প্রচুর তর্কাতর্কি ততোধিক মনোমালিন্য হলো। ছল্‌হার চাচার অনেকগুলো ছেলে! তাঁর বক্তব্য—এবং সে-বক্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—যে, তোমরা যদি আজ দরাজদিলে, মুক্তহস্তে বরপক্ষের দাবীদাওয়া মেনে নাও তবে আমার ছেলেগুলোর বিয়েতেও ছল্‌হিন পক্ষ এই বিয়ের নজির দেখিয়ে এরই অল্পপাতে দাবী করে বসবে প্রচণ্ড মহর, অষ্ট-অলঙ্কারের বদলে অষ্টগুণা এবং খুদায় মালুম আর কি কি। অতএব সর্ববাবদে ম্যাকসিমামটা আরো নিচে নামাও, কলকাতায় ছল্‌হিনের অভাব নেই, তাঁরই পরিচিতদের ভিতরে এস্তার ডেনা-কাটা ছুরীপরী রয়েছে।

সবাই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাঁর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। অর্থনৈতিক চাপেই হোক বা সামাজিক যে কোনো কারণেই হোক, এখন মুসলমান মেয়ের অবস্থা প্রায় হিন্দু মেয়েরই মত। তাদেরই মত এখন বরপক্ষই জোরদার পক্ষ। ছল্‌হার চাচা তাঁর এতগুলো ছেলে নিয়ে তো রীতিমত ম্যারেজ মার্কেট কর্নার করবেন—এবং ঐ ধরনের আরো কত কী।

তা সে যা-ই হোক, রাত প্রায় ছুটো না তিনটের সময় রক্ষারফি হয়ে দকে দকে ম্যাকসিমামগুলো পিন্‌ডাউন করা হলো।

এ সভাতে ছল্‌হার খাকার কথা নয়। সে ছিলও না। কিন্তু সামনের ঘরে তার চাচাতো ভাবীর সঙ্গে বসে আলোচনার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে গুম্‌হয়ে বসে রইল।

পরদিন অতি ভোরে ভাবীর মারফত সে তার আক্বাকে খবর পাঠালে, ছল্‌হিন্‌পক্ষের সর্ব দাবীদাওয়া যেন তাঁদের চাহিদা-মাক্কিক মেনে নেওয়া হয়। ছল্‌হা পক্ষের দর কষাকষির দরুন যদি শাদী ত্তেস্তে যায় তবে সে স্কলারশিপ নিয়ে নাক বরাবর বিলেত চলে যাবে

এবং কস্মিন কালেও এদেশে কিরবে না। পক্ষান্তরে শাদী যদি হয়ে যায় তবে সে চাচাতো ভাইদের পরিবারের পছন্দমত জায়গায় তাদের শাদীর জিম্মাদারী এই বেলাই আপন স্কন্ধে নিচ্ছে।

প্রথমটায় তো লেগে গেল হৈহৈ রৈরৈ। কিন্তু বাপ-মা জানতেন, ছেলেটা ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে এবং চাচাও জানতেন তার কথার নড়চড় হয় না। ভাইদের বিয়ে সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটা রাখবেই। অতএব শেষটায় সেই দুই ভদ্রলোককে সর্ববাবদে আকাশ-ছোঁয়া ম্যাকসিমামের সর্ব এখতেয়ার দেওয়া হলো।

অবশ্য আপনার কেবলদানি কিছু কম না।’

আমি চটে গিয়ে বললুম, ‘বাস্, বাস্ হয়েছে।’

শহর-ইয়ার আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ‘আহা! আপনি কেন বিরক্ত হচ্ছেন? আপনি না থাকলে আপনার ডাক্তার সাহস করে পাঁচ হাজারেরও মহুর্ চাইতে পারতেন না। আর বরপক্ষ যে সুবোধ বালকদ্বয়ের গ্রায় আপনার সব তলব মেনে নেবে, এ তত্ত্বটা না জেনেই তো আপনি কনের জন্তু বেস্ট টার্মস গুছিয়ে নিলেন! আচ্ছা, আমি কি বলি আর কি কই সে আপনি বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু শুনে রাখুন; ডাক্তারের ভাগ্নীবাড়িতে আপনার খ্যাতি রটেছে যে আপনি এমনই ত্রিকালজ্ঞ পীর সাহেব যে বরপক্ষের উপর এক ঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই সাক্ষুংরো অভিশ্রম পরিপাটি রূপে মান্নুম করে নিয়েছিলেন যে ওঁরা আপনার তলব মাত্র আপনার খেদমতে পেশ করার জন্তু সঙ্গে ফ্লাস্কে করে বাঘের ছধ নিয়ে এসেছিল।’

বললুম, ‘আপ্যায়িত হলুম এবং আজ সন্ধের গাড়িতেই আমি বোলপুর চললুম।’

শহর-ইয়ার সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বললে, ‘কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। আমি কোন্ কথা দিয়ে আমার ব্যান আরম্ভ করেছিলুম মনে আছে?—মুসলমান মেয়ে অন্দরমহল

ত্যাগ করলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা। এইবারে দেখুন, গাঙ্গুলার সাহেবের ভায়ী যদি জনানা ত্যাগ করে কলেজ যাওয়া আরম্ভ না করতো তবে কি এরকম একটি উৎকৃষ্ট বরের নজরে পড়তো, এবং এরকম সম্মানে তার বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারতো? ও যদি স্যাট্রিকের পর চাচার সঙ্গে কসাদ করে না বেরিয়ে পড়ে অন্দরমহলে এসে বসে দিন কাটাতো তবে কি তার চাচা মাথা খুঁড়েও এ-রকম একটি বর জোটাতে পারতেন?’

আমি বললুম, ‘প্রামাণ্যের সঙ্গে সেই কবে যে আমার যোগসূত্র ছিল হয়ে গিয়েছে সেটা স্মরণেই আসছে না। এদিকে আবার কলকাতা আর রাঢ়ের মুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয় নি। তাই জানতে ইচ্ছে করে, আপনাদের ভিতরও মেয়ের জন্ম বর যোগাড় করা কি একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে?’

‘আমাদের আত্মীয়-স্বজন তো নেই বললেই হয়; তবু যেটুকু খবর কানে আসে তার থেকে মনে হয়, কলকাতার মুসলমান সমাজের প্যাটার্ন ক্রমেই হিন্দু প্যাটার্নের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান যুবকও চায়, তার স্ত্রী যেন শিক্ষিতা হয়, গানটান জানলে তো আরো ভালো, এবং সে নিজে যদি লেখাপড়ায় নাম করে থাকে তবে হয়তো মনে মনে এ-আশাও পোষণ করে যে স্বস্তির তাকে বিলেত পাঠাবে। তবে যতদূর জানি, এদের খাঁইগুলো এখনো রুঢ় কর্কশরূপে সমাজে প্রকাশ করা হয় না।’

আমি বললুম, ‘সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু সমাজ ও তার প্যাটার্ন বদলে বদলে আমাদের কাছে চলে আসছে। আমার ছেলেবেলায় হিন্দুর পণপ্রথা যতখানি নির্দয় ছিল আজ তো নিশ্চয়ই ততখানি নয়। আর ‘লভ্ ম্যারেজের’ সংখ্যা যতই বাড়বে, পণপ্রথা ততই বাতিল হতে থাকবে।’

শহর-ইয়ার বললে, ‘আমার কিন্তু ভারি কৌতূহল হয়, এই যে হিন্দুরা ডিভোর্স, মনোগেমি, বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার এসব

আইন চালু করলো তার ফল আখেরে হিন্দু সমাজকে কি ভাবে পরিবর্তন করবে ?’

‘গ্রামাঞ্চলে কিচ্ছুই হবে না। মনোগেমি ছাড়া আর ছুটো আইন তো মুসলমানদের ছিলই। তবু আমাদের সমাজে ডিভোর্স হতো ক’টা ? বাপের সম্পত্তির হিশ্বে নিয়ে ক’টা মেয়ে ভাইদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়েছে ? আর মনোগেমি আইন না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক’টা মুসলমান ভদ্রলোক ছুটো বউ পুষেছে ? হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হয়েছে প্রায় একশ বছর আগে। ভদ্র হিন্দু সমাজে তার ফলে প্রতি বৎসর ক’টা বিধবা-বিবাহ হয় ? না দ্বিদি, এদেশের অদৃশ্য, অলিখিত আইন—মেয়েরা যেন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তা সে মুসলমানই হোক, আর হিন্দুই হোক।’

শহর-ইয়ার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।’

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, ‘কিন্তু যা বললুম, তার সঙ্গে আমার আরেকটা কথা যোগ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ খেবে যাবে। সেটা সোজা বাংলায় এই, বলি তো অনেক কথা, কি যখনই চিন্তা করি তখনই দেখি, আমাদের সমাজ যে কোন্ দিবে চলেছে তার কোনো-কিচ্ছুই অনুমান করতে পারছি না।’

শহর-ইয়ার আমার সর্বশেষ মন্তব্যটি বোধহয় শুনতে পায় নি দেখি, দৃষ্টি যেন দেয়ালের ভিতর দিয়ে দূর দূরাস্তর চলে গিয়েছে হঠাৎ বললে, ‘এদেশের মেয়েরা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামাগ্রতা প্রতিবাদ জানাবে কি করে ? তার জন্য তো আপনার ঐ শ্রীরাধাই দায়ী। বৈষ্ণব কবিরাই তো তাঁকে শত শত গানে সহিষ্ণুতা সাক্ষাৎ মূর্তিমতী প্রতিমারূপে নির্মাণ করে তুলেছেন। কৃষ্ণ তাঁ প্রতি যে অবিচার করে চলে গেলেন তাই নিয়ে তাঁর রোদনক্রন্দন হাহাকার আছে শতশত গানে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংব বিদ্রোহ, অভিসম্পাত না হয় বাদই দিলুম, আছে কি কোনোখানে’

উন্টে তিনি তো বসে রইলেন গালে হাত দিয়ে ঠাকুরের প্রতীক্ষায় ।
যদি তিনি কোনো দিন ফিরে আসেন ! এই শ্রীরাধাই তো হলেন
আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিনীর আদর্শ !'

শহর-ইয়ার গরম । অবশ্য মাত্রাধিক নয় ।

আমি বললুম, 'সুন্দরী, আপনি এখন যা বললেন তার উত্তরে
আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ খীসিস ঝাড়তে হয় । অতিশয় সংক্ষেপে
উত্তর দি ।

ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবদের অন্ধকার যুগে—
জাহিলীয়ায়—অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হয়েছিল । বলা বাহুল্য
সে কাব্যে ইসলামের একেশ্বরবাদ তো নেইই, যা আছে সে-সব জিনিস
কেউ বিশ্বাস করলে তাকে আর মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে না,
অথচ এসব কাব্য পড়েন শিক্ষিত আরব মাত্রই—তা সে তিনি ধার্মিক
মৌলানাই হোন, আর সাদামাটা কাব্য-রসিকই হোন—কিন্তু বিশুদ্ধ
কাব্যরূপে, অতি অবশ্যই তার থেকে ধর্মানুপ্রেরণা পাবার জন্ম নয় ।
তাই আমার তাজ্জব লাগে, যখন এদেশের গোঁড়ারা আপত্তি তোলেন
কোনো মুসলমান বালক বাঙলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্ম
রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য পড়লে । মধ্যযুগের একাধিক
মুসলিম কবি বাগী-বন্দনা দিয়ে তাঁদের কাব্য রচনার গোড়াপত্তন
করেছেন । অথচ কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, এঁদের
প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মূল সরল নীতি বাঙলার
মাধ্যমে প্রচার করা । আরেকটা উদাহরণ নিন । পরধর্ম বাবদে
খৃষ্টান মিশনারিরা যে অত্যধিক সহিষ্ণু এ-কথা তাঁদের পরম শত্রুরাও
বলবে না । অথচ এঁদের অধিকাংশই গ্রীক শেখার সময়—ঐ ভাষাটি
না শিখে নিউ টেস্টামেন্ট মূলে পড়ার উপায় নেই—বিস্তর
দেবদেবীতে ভক্তি প্রাক-খৃষ্ট গ্রীক সাহিত্য গভীরতম শ্রদ্ধার সঙ্গে
পড়েন । হাতের কাছে আরেকটা উদাহরণ নিন । ইরাণে ইসলাম
আগমনের পূর্বে যেসব রাজা, বীর, প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী

লোকমুখে প্রচলিত ছিল, সেগুলো নিয়ে মুসলমান কিরদোসী লিখলেন তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা'—সে কাব্য পড়েন না কোন্ মৌলানা ?

আপনি হয়তো বলবেন, পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গ বিশেষ ; অতএব সে-সাহিত্য থেকে হিন্দু তার জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন। উত্তম প্রস্তাব। আপনি ভাবছেন বাঙলার হিন্দু রমণী স্ত্রীরাধার কাছ থেকে তার সহিষ্ণুতা শিখেছে। কিন্তু কই, সে তো তারই অনুকরণে আপন স্বামী ত্যাগ করে অস্থ পুরুষে হৃদয় দান করে না। এদেশের কোনো মেয়েরই প্রশংসা করতে হলে আমরা সর্বপ্রথমই বলি, 'আহা, কী সতী লক্ষ্মী মেয়েটি !'

অবশ্য এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব যোগ না করলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনেকেই রূপক রূপে গ্রহণ করেন। রাধা মানবাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ পরমাত্মার। কৃষ্ণমিলনের জন্ম রাধার হাহাকার আর পরমাত্মার কামনায় মানবাত্মার হাহাকার একই ক্রন্দন।

স্বকীদের ভিতরেও ঐ জিনিসটি আছে। আপনি পাঁচজন মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর অন্তত চারজন বলবেন, হাকিজ যেখানে মদ্যপানের উল্লেখ করছেন সে মদ্য মদ্য নয়। সে মদ্য আল্লাহর প্রতি মহবৎ—ভগবদ্‌প্রেম। যে সাকী মদ্য বিতরণ করেন তিনি মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু। তিনি শিষ্যকে মদ্যপানে আসক্ত করান—গূঢ়ার্থে আল্লাহর প্রেমে অচৈতন্য হতে, সেই চরম সত্তা পরমাত্মায় আপনা সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে শিক্ষা দেন।

পার্শ্বিক প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে নিয়ে যাবার জন্ম খৃষ্টান এবং ইহুদি মিস্টিক—ব্রহ্মবাদী—ভক্তও ঐ প্রতীকের শরণাপন্ন হন।

কিন্তু আপনি আমি—আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা কাব্য পড়ি কাব্য-রসের জন্ম। আর কোনোদিন যদি আপনার ধর্মাসুরাগ নিবিড়তর হয় তবে আপনার ভাবনা কি ? আপনার ঘরেই তো দেখলুম ইমাম গজালীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বাঙলা অনুবাদে।'

বারো

পরিপূর্ণ সুখশান্তির উপর 'অকস্মাৎ কী ভাবে বজ্রপাত হয়—এই আমার বিকটতম অভিজ্ঞতা।

ইতিমধ্যে আমি অভিমন্যুকে হার মানিয়ে, শহুর্-ইয়ার ও ডাক্তার নির্মিত চক্রবৃহৎ ভেদ করে মোকামে ফিরে এসেছি।

আবার সেই খাড়াবড়ি-উচ্ছেতে যখন অধরোষ্ঠ পরিপূর্ণ বিতক্ত তখন হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলুম, ডাক্তার পরিবার আমাকে যেন 'কুট' করেছে। আমি পর পর ছ'খানা চিঠি লিখলুম শহুর্-ইয়ারকে। কোনো উত্তর পেলুম না। এ যে নিদারুণ অবিশ্বাস্ত! তখন লিখলুম ডাক্তারকে। অবিশ্বাস্তের তারতম্য হয়? হয়। এ যেন আরো অবিশ্বাস্ত! এ যেন সেই প্রাচীন যুগের টেলিফোনে 'নো রিপ্লাই, মিস্?'

আমি কী হীন নীচ! যাক্গে চুলোয়। বলে যেই বারান্দায় বেরিয়েছি, দেখি, দূর থেকে মাঠ ঠেঙিয়ে আসছে ডাক্তার। আর তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যাচ্ছে আমার আলসেশিয়ন 'মাষ্টার' তার রিজার্ভ স্পীডও ছেড়ে দিয়ে।

আমি বারান্দা ছেড়ে যেই রোদ্দুরে নামতে যাচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলুম, দূর থেকে ডাক্তার হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আমি যেন অযথা এই কড়া রোদ্দুরে না নামি।

ডাক্তার পৌঁছল। লগেজ দুয়ের কথা, হাতে একটি এটাচি পর্ষস্ত নেই।

এ-বাড়ির কর্তা দিলবরজান—কুক্-শেক্-মেজরভমো—দুই মিনিটের ভিতর বালতি করে জল, সাবান গামছা ধুঁহুল, ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখলো। ডাক্তার তার আপন-জন। মনে নেই, কখন কোন্ বারে সে দিলবরের কোন্ এক মাসীকে বাঁচিয়ে ছায়।

ডাক্তারের চুল উস্কাখুস্কা। হাত ছোটো অল্প অল্প কাঁপছে।
কপালে ঘামের ফোঁটা।

শুধু দেহের দিক দিয়ে, এ ধরনের অপ্রমত্ত, শাস্তসমাহিতচিত্ত লোকও যে রাতারাতি হঠাৎ মৃগী রুগীর মত চেহারা ধারণ করতে পারে, এ যেন সূক্ষী-সাধুর অকস্মাৎ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে নীরব আর্তনাদ!

আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে তাঁকে কুশল প্রশ্নও শুধোতে পারলুম না। কিংবা হয়তো আমার মগ্নচৈতন্য তার অতল থেকে কোনো প্রকারে প্রতিক্রিয়া আমার চৈতন্যলোকে পাঠাতে সম্মত হলো না। আর কুশল প্রশ্ন শুধোবই বা কি? যা দেখছি সে তো জড়ভরতও লক্ষ্য করতো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আল্লু যেন হঠাৎ আমাকে আদেশ দিলেন। দিলবরজ্ঞানকে বললুম, 'এখানে না। ওঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে চান করিয়ে, তাজা জামা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।'

যে ডাক্তার কারো কোনো প্রকারের সাহায্য নিতে সদাই কুণ্ঠিত, বিব্রত—বিদ্রোহী পর্যন্ত বলা চলে—সেই ডাক্তার কলের পুতুলের মত দিলবরের পিছনে পিছনে চলে গেল।

আমি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে শুধালুম—'কি করে শুধালুম জানিনে—'শহর-ইয়ার?'

যেন পৃথিবীর অন্তপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, ভালো আছে। না, ভুল বললুম। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে ঐ সংবাদটুকু দিলে।

তাহলে কি হয়েছে?

এরপর তাকে খাওয়াবার চেষ্টা, শোওয়াবার চেষ্টা, কথা বলাবার চেষ্টা—এসব নিষ্ফল প্রচেষ্টার পীড়াদায়ক বর্ণনা দিয়ে কে কাকে পীড়া দিতে চায়।

কোথা থেকে মানুষ কখন কি অনুপ্রেরণা পায় কে জানে? দিলবরকে বললুম, 'শাও, রিকশা নিয়ে এসো। আমরা কলকাতা

াচ্ছি। আর ডাক্তারের কোট পাতলুন আমার স্মৃটকেসেই ভরে পাও।’ এ লোকটাকে আবার কাপড় ছাড়ানো—সে তো হবে মালট্রামডার্ন সোসাইটি লেডির রুগ্ন বাচ্চাকে সায়েবী কায়দায় বকর পাঁচবার কাপড় বদলানো।

আমি অন্ধভাবে বুঝতে পেরেছি, এখানে ডাক্তারকে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই। যা হবার হবে কলকাতায়। ডাক্তারের জীবন বলতে বোঝায় তার দুটি খাস প্রশাস—তার শহুর্-ইয়ার আর তার রিসার্চ। এবং যেহেতু শহুর্-ইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি যতএব নিশ্চয়ই সে-ই। তবে যে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে জানালে সে ঠিক আছে—ও, না, সে তো আমার অনুমান।

সঙ্গে নিলুম ইমাম গজ্জালীর কিমিয়া আর হুজবেরীর কশ্ফ-গল্-মহজুব।

ব্রিকশাতে উঠে ইচ্ছে করেই আরম্ভ করলুম, বকর বকর। কিন্তু সেটা মোটেই সহজ কর্ম হয় নি। আর সহজ কঠিন যাই হোক, ফল হলো সম্পূর্ণ বেকার। এ যেন ধূঁয়োর সঙ্গে কুয়াশায় লড়াই। এমন কি তাতে করে ধূঁয়াশাও তৈরি হলো না।

ডাক্তার আচারনিষ্ঠ মুসলিম। তাই আরম্ভ করলুম ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যেন কিছুটা আত্মচিন্তা কিছুটা বক্তৃতা। একটা বিশেষ মতলব নিয়ে।

বললুম, ‘আপনি তো ইমাম গজ্জালীর ভক্ত। তাঁর জীবনটাও ভারী অদ্ভুত। তিনি ছিলেন বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির—যে আমলে কি না, হয়তো এক চীন ছাড়া অণু কোথাও ঐ ‘বিশ্ব-বিদ্যালয়ের’ জুড়ি ছিল না—আমি অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাপীঠের সমন্বয়কে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে ধরছি না। একে তো সর্বজনমাণ্য রেঙ্কটর, তদুপরি শাজীরূপে তিনি মুসলিম জগতে সর্বপ্রখ্যাত। রাজদত্ত অভ্যাস্তম পোশাক পরিধান করে বেতেন রাজদরবারেও।

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল গেল, এ সব তাবৎ কর্ম অর্থহীন—

বর্বরশু শক্তিক্ষয়—ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিস, অল্ ইজ ভ্যানিটি, বাইবেলের ভাষায়। সেই রাত্রেই মাত্র একখানা কবুল নিয়ে বাগদাদ থেকে অন্তর্ধান। পৌঁছলেন গিয়ে সিরিয়ার দমশকশে— আশ্রয় নিলেন মসজিদে, ছদ্মনামে। সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন উচ্চস্তরের পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে একদিন শাস্ত্রালোচনা হতে হতে সেই পণ্ডিত বললেন, ‘এ আবার আপনি কি বলছেন। স্বয়ং ইমাম গজ্জালীর মত সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেছেন ঠিক তার বিপরীত বাক্যটি!’

গজ্জালী ভাবলেন, আর এ-স্থলে থাকানয়। কোন্ দিন এরা জেনে যাবে আমার প্রকৃত পরিচয়। আর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে আমার ধ্যানধারণার সর্ব অবসর।

সেই রাত্রেই অন্তর্ধান করলেন বয়তুল মুকদ্দস—জেরুজালেমের— দিকে। সেখান থেকে গেলেন ইহুদি, আরব, খৃষ্টান তিন কুলের পূর্ব-পুরুষ হজরৎ ইব্রাহিমের পুণ্য সমাধি দর্শন করে অশেষ পুণ্য লাভার্থে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যে রকম পুণ্যতীর্থে দেবতাকে কোনো-কিছু প্রিয় খাও বা অগ্নি-কিছু দান করে, ঠিক সেই রকম ইব্রাহিমের মোকামে মুসলমানরা একটা বা একাধিক শপথ নেয়। ইমাম নিলেন তিনটি। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ‘এ জীবনে আমি, কোনো বিতর্কমূলক বাক্য (কন্ট্রভার্সিয়াল) উত্থাপন করবো না।’

এখানে এসে আমি চুপ করে গেলুম। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় কূট উদ্দেশ্য নিয়ে।

জয় হোক ভারতীয় রেলের! শতম্ জীব, সহস্রং জীব—ভারতীয় রেলের কর্মকর্তাগণ!

বোলপুর স্টেশন আমাকে ছ’খানা কার্ট’ক্লাস টিকিট বেচলে।

দার্জিলিং মেল পৌঁছল—এই অতি সামান্য নশুবৎ—ছ’ঘণ্টা লেটে, যাকে বলে ‘বিলম্বিত গাড়ীয়াঁদের’ একটি হয়ে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কার্ট’ক্লাস সব-ক’টা কামরা যে দার্জিলিং থেকেই

প্রতি আউনস্‌ ভর্তি সে খবর না জেনে—খুব সম্ভব জেনেই—বোলপুর স্টেশন টিকিট বেচেছে। দার্জিলিঙের ক'গুণা মেয়ে-ইস্কুলের ছুটি হয়েছে জানিনে—নীলে নীলে উর্দিপরা মেয়েরা কাঁঠাল বোঝাই করে ফেলেছে সব ক'টা কামরা।

সে দুঃস্বপ্ন আজ আর আমার নেই—কি করে কোন্ কামরায় উঠেছিলুম। খুব সম্ভব ক্যাটল্‌ ট্রাকে, কিংবা হয়তো এঞ্জিনের কারনেসে। একদিক দিয়ে ভালোই হল। সেই সঙ্কটময় অভিযানে হুজনা দুই কোণে ছিটকে পড়েছি। ডাক্তারের মনটাকে পুনরায় সজীব করার গুরুত্বার থেকে রেহাই পেলুম বটে, কিন্তু আমার মনটা ক্রমেই নির্জীব হতে লাগলো।

দিলবরকে বলেছিলুম কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল করতে। ডাক্তারদের সেই প্রাচীন দিনের গাড়িটা এত দিনে আমার বড় প্যারা হয়ে গিয়েছিল। সেও স্টেশনে আসে নি। দুঃখের দিনে নির্জীব প্রাণীও প্রিয়জনকে ত্যাগ করে বলেই কবি হাহাকার করেছেন—

তন্ত্র দস্তীমে কোন্ কিসকা সাধ দেতা হৈ

কি তারিকী মেঁ সায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইন্সামে।

দুর্দিনে বলো, কোথা সে সৃজন হেথা তব সাথী হয় ?

আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয় ॥

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। যে পুরো সম্পূর্ণ কাঁকা উইংটি ঠাকুরদাদের স্বরণে ডাক্তারের আদেশানুযায়ী চিরন্তন দেয়ালি উৎসব করতো সেটিও অন্ধকার। আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। স্পষ্ট বোঝা গেল বেয়ারাই সেটা গোছগাছ করেছে। শহর-ইয়ার কোথায় ? কে জানে ? আমি শুধালুম না। ডাক্তার বললেন, তিনি থাকেন না। ট্রেনের ভিড়ে সন্ধ্যার নামাজ পড়তে পারেন নি। এখন এয়ার নামাজ পড়ে ঘুমুবেন। কিন্তু শহর-ইয়ার কোথায়, যার পরম পরিভূষি ছিল স্বহস্তে তাঁর নামাজের ব্যবস্থা করে দেবার ?

আমি স্থির করলুম, ডাক্তার যতক্ষণ না নিজের থেকে কথা পাড়ে আমি কিছু শুধোবো না।

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি। এমন সময় আমার প্যারা বেয়ারা—শহর-ইয়ারেরও—ঘরে ঢুকলো। অল্প সময় তার মুখে হাসিই লেগে থাকতো, আজ সে যন্ত্রের মত তার নৈমিত্তিক কর্তব্যগুলো করে যেতে লাগলো।

আমি খুব ভালো করেই জানি গৃহস্থের পারিবারিক ব্যাপার কারকুন-কর্মচারী সহচর-সেবকদের শুধোতে নেই, তবু বড় ছুঁখে মনে পড়লো শহর-ইয়ার দিলবরজানকে আমার আচার-অভ্যাস সম্বন্ধে একদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধিয়েছিল, যাতে করে আমি তাদের কলকাতার বাড়িতে এলে আমার কোনো অসুবিধা না হয়।

তবু দ্বিধাভরা মনে জমীল শেখকে শুধালুম, ‘আমাদের ট্রাঙ্ক-কল সময়মত পৌঁছয় নি?’

‘জী হাঁ, সে তো সন্ধ্যা সাতটার সময়ই। আমিই ধরেছিলুম।’
‘তবে?’

প্রশ্নটার তাৎপর্য ঠিক বুঝেছে। বললে, ‘মা জী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তো ছুপুর বেলাই গাড়ি নিয়ে তাঁর পীর সাহেবের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আমি—’

শহর-ইয়ারের পীর! বলে কি! হাবার মত শুধালুম, ‘পীর!’

জমীল ঘাড় কবিরিয়ে যেন অতি অনিচ্ছায় অত্যন্ত আফসোস করে আন্তে আন্তে বললে, ‘সেখানেই তো প্রায় সমস্ত দিন কাটান।’ তারপর যতদূর সম্ভব আদব-ইনসানিয়ৎ বাঁচিয়ে, ‘সালাম হুজুর, গরীবের বেয়াদবী মাফ করবেন’ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আল্লার কসম খেয়ে বলছি, জমীল যদি বলতো, শহর-ইয়ার আত্মহত্যা করেছে তা হলেও আমি এরকম বড়বক্ বনে যেতুম না। শহর-ইয়ার পীর ধরেছে! এ যে বাতুলের বাতুলতার চেয়েও অবিখ্যাস্ত।

ধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান কে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাক্ষ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা ও তো আমি শহর-ইয়ারের কথাবার্তা চালচলনে কখনও দেখি নি। নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্ তার জান্, তার সবকিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাস্বার উপর নয়—ঈশ্রনাথের গানের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। খানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো স্তম্ভের কোনো একটার পলস্তুরা পর্যন্ত নয়।

স্বার এই রমণীর মণি মমতার খনি— সে তো কিছু পাগলা রদের ইম্বেসাইল নয় যে চায়ের কাপে জল ভরে, পেল্লিলের গায় সূতো-বঁড়শি লাগিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করবে! গুরু বুঝি তা লে চায়ের কাপ্, আর শহর-ইয়ারের ভক্তি সেই পেল্লিলের বঁড়শি! এই দিয়ে সে ধরবে ভগবদ্-প্রেম, নজাৎ-মোক্!

তাও বুঝতাম যদি তার বাউলদের দেহতত্ত্ব গীতে, লালন কীরের রহস্যবাদ-মারিকতী জনপদসঙ্গীতের প্রতি মমতা থাকতো! এমন কি এই যে রবীশ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত, বাউল-গান—তার প্রতিও শহর-ইয়ারের বিশেষ কোনো মোহ নেই—সে-কথাও তো সে আমাকে স্পষ্ট বলেছে!

খাটে শুয়ে, বই হাতে নিয়ে পড়ছি, পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকছে না; ভাবছি শুধু শহর-ইয়ারের কথা, যাকে আল্লা মেহেরবানী করে আমার কাছে এনে দিলেন, যে আমার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া!

রাত তখন এগারোটা। শহর-ইয়ার ঘরে ঢুকলো।

তাকে কিভাবে দেখব, সে নিয়ে আমার মনে ভোলপাড় হচ্ছিল। তখন থেকে শুনতে পেয়েছি, সে 'গুরু লাভ' করেছে।

যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। শুধু পূর্বকার মত যখন

খাটের পৈথানে এসে খাড়া কাঠের টুকরো ধরে দাঁড়ালো ত:
স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, চোখ ছুটোর উপর যেন অতি হাল্কা ঝ
ছু'খানা ফিলমের মত কি রকম যেন কুয়াশা কুয়াশার ঃ
আবরণ। এ জিনিসটে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কা
কুয়াশাভাব থাকা সত্ত্বেও তাতে রয়েছে কেমন যেন একটা বিভ্র
ত্বোতি।

পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে শহর-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌ
একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গা
দূর থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঝ
ষেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দেড়তলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলম
রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান—তার আরো কত ঃ
আহারশয্যাসনভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আম
পরিচয় হয়েছে। 'দিনে দিনে সে আমার কাছে স্নন্দরের চেয়ে স্নদ
মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে।

আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিন
হবে! এ যদি একেবারে নূতন মানুষ হতো তবে তো কো
ভাবনাই ছিল না। নূতন মানুষের সঙ্গে তো আমাদের জীবন
পরিচয় হয়। কোনো পুরনো মানুষকে আবার নূতন করে চেন
সামান্য লেখক হিসাবে বলতে পারি: নূতন লেখা তো ছ'দিন অ
অন্তরই লিখতে হয়, কিন্তু কোনো একটা লেখা যদি হারিয়ে
এবং সেইটেই আবার নূতন করে লিখতে হয়, তখন যা যন্ত্র
ভিতর দিয়ে যেতে হয় সে-তত্ত্বটা শুধোন গিয়ে—আমাকে না
খ্যাতিনামা লেখকদের।

এর চেয়েও সোজা উদাহরণ দি। আপনি রইলেন পড়ে দে
বন্ধু বিলেত থেকে ফিরলেন পাঁচ বছর পরে। তার সঙ্গে ফের ঃ
জমাতে গিয়ে খান নি'মার?

আশ্চর্য! এখনো শুধোলে না, আমার কোনো অশু'বিধা হয়

খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়েছে—কিছুই না। না, আমি শর্চ হই নি। আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পেরেছি।

আমি স্থির করেছি আমি কোনো ফরিয়াদ করবো না—চিঠির দ্বারা দিলে না কেন, আপন হাতে প্রত্যেকটি জিনিস বেছে বেছে—যত কিছু কলকাতা থেকে সঙ্গে এনে—আমার বাড়ির দেড়তলাতে তোমার বাড়ি বানাতে সেটা এরকম ছেঁড়া চটিজুতোর মত বলে না কয়ে হঠাৎ এরকম উৎখাত করে দিলে কেন ; না না, ছু শুধোবো না। আমি ভাবখানা করবো, সে হঠাৎ যেন কোনো তিমখানা বা নাইটইস্কুলে এমনই মেতে গিয়েছিল যে আমার স্বত্বাধার করতে পারে নি। সমস্তটা সহজভাবেই গ্রহণ করবো। কিন্তু হায়, সহজ হওয়া কি এতই সহজ ? সহজিয়া ধর্মের মূল মন্ত্র হ'ল 'সহজ হবি, সহজ হবি'—সেটা যদি অতই সহজ হবে তবে বিশ্বসংসারে এবং ধার্মিক অধার্মিক সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ঐ ধর্মই গ্রহণ করলো কেন ?

ওদিকে হৃদয় ভরে আছে অভিমানের বেদনায়।

এ-রমণীর সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক প্রণয়ের হতো তবে তার স্নেহের অবহেলা আমার হৃদয়ে অশ্রু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। প্রথম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্র-গ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও রূপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে বাড়ে এবং চতুর্দশীতে এসে নামে। পূর্ণমাতে পৌঁছায় না। তাই তার গ্রহণ নেই ক্ষয়ও নেই, ঋপক্ষও নেই। তবে আমাদের বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ঝাড়া !

কিন্তু অতশত চিন্তা করার পূর্বেই প্রাচীন দিনের অভ্যাস মত খেয়ে বেরিয়ে গেল, 'কি পড়ছো, আজকাল ?' ঐটেই ছিল আমাদের প্রিয় অবতরণিকা—যা দিয়ে 'মুখবন্ধ' নয়, মুখ খোলা হতো।

বললুম, 'বসো।'

কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে খাটের বাজুতে বসলো।

এই মেয়েই না একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পদসেবা করতে চেয়েছিল !

তবে কি পীরের মানা—গুরুর বারণ—পরপুরুষস্পর্শ বিষয় বর্জনীয় ?

নিকুচি, নিকুচি । পীরের গুপ্তি আর গুরুর দঙ্গল !

‘অভিমানের বদলেতে নেব তোমার মালা’ এ-সব মরমিয়া মা আমার তরে নয় । আমার হলো রাগ । এই নিষ্পাপ শিশুটিকে যে শেখালে এইসব কাল্পনিক পাপ ? কে সে পীর ? তাকে একবার দেখে নিতে হবে । কিন্তু পীরের নিকুচি যতই করি না কেন, আমায় ঠাকুরদা থেকে উর্ধ্বতম ক’পুরুষ যে পীর ছিলেন সে তত্ত্ব অত্মাপি বিলক্ষণ অবগত আছে তরফ্ পরগনার কিছু কিছু চাষাছুষো, মোল্লানুনশী । এরা বংশান্ত্রক্রেমে আমাদের পরিবারের শিষ্য । কিন্তু আমার পিতা এবং আমার অগ্রজেরা পীর হতে রাজী হলেন না বলে এদের অধিকাংশই অন্ত পীরের আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু গুরুভক্তি শুধু গুরুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-ভক্তি গুরুর বংশধরগণকেও নিঃস্বর্তি দেয় না ; তাই এদের কয়েকটি পরিবার অন্ত পীর বরণ না করে ছ’তিন পুরুষ ধরে অবিশ্বাস্ত্র ধৈর্ষ ধরে বসে আছে, আমার দাদাদের বা আমার বেটা-নাতি যদি সদয় হয়ে কোনো এক দিন এদের বেটা-নাতিদের শাগির্দ-(সাকরেদ) রূপে গ্রহণ করেন । ইতিমধ্যে যে-পীর বাঙলাদেশে এসে আমাদের বংশ স্থাপনা করেন তাঁর দর্গাতে এই সব প্রতীক্ষমাণ সাকরেদরা শিনী চড়াচ্ছে, ফুল সাজাচ্ছে, মানত মানছে ।

মাত্র এই ছ’পুরুষ—আমার পিতা আর আমরা তিন ভাই—পীর হতে রাজী হই নি । তাই বলে চোদ্দপুরুষ যে-সব ধ্যানধারণা করেছে, সাকরেদদের দীক্ষা দিয়েছে, ধর্মপথে চালিয়েছে সেটা কি ছ’পুরুষেই আমার রক্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? হাঁসকে ছ’পুরুষ খাঁচায় বন্ধ রাখার পর তৃতীয় পুরুষের বাচ্চাদের জলে ছেড়ে দিলে কি তারা সাঁতার না কাটতে পেরে পাতর-বাটির মত জলে ডুবে মরবে ।

এই তো মাত্র ছ'তিন বৎসর পূর্বে শাস্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার উপর হামলা করে অনুরোধ—আদেশও বলতে পারেন—করলেন, পৌষমেলা ও সমাবর্তন উৎসবের প্রাক্কালে যে সাংস্কৃতিক উপাসনা করা হয় তাতে আচার্যের আসন গ্রহণ করতে। আমি সাতিশয় সবিনয় সবিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম। ঠুঁদের বলি নি কিন্তু আমি মনে মনে জানি এসব কর্ম করে পুরুত-মোল্লারা পেটের অন্ন জোটায়—অবশ্য এ-স্থলে এঁরা আমাকে একটি কানাকড়িও দেবেন না, সে-কথা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলাম। আবার এ তথ্যও তো জানি যে, বিপদে-আপদে কাছেপিঠে নিতাস্তই কোনো মোল্লা-মুনশী ছিল না বলে আমার পিতৃপুরুষ এ-সব ক্রিয়াকর্ম কালেকশ্বিনে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমাধান করেছেন। পূর্বেই বলেছি, তবুও আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের আখেরী মোক্ষম বজ্রবাণ ছেড়ে বললেন, আমারই উপর ভরসা করে তাঁরা অণু কোনো ব্যবস্থা করেন নি; এই শেষ মুহূর্তে অণু ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সন্দেহপিচেশ মন অমুমান করলো, অণু কোনো ডাঙর চাঁকৈ হয়তো কর্তারা কাবু করে রেখেছিলেন এবং তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে খবর পাঠিয়ে কস্তাদের সমূহ বিপদে ফেলেছেন। বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়। তাই এসেছেন অপমের কাছে। অবশ্য এনরা শয়তান নন, আশ্মো মাছি নই। আমি শুধু রিলেটিভিটি সিম্প্রফাইড থু প্রভার্ব বোঝাবার জন্ত এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করলুম।

তখন অবশ্য আমি তিন কবুল পড়ে মুসলমান যে-রকম বিয়ে করে সে-রকম ধারা আমার সম্মতি দিলুম।

এটা আমার 'পীরত্ব' প্রমাণ করার জন্ত শহর-ইয়ারকে বলবোই বলবো। সে কোন্ দস্তভরে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছে যে তার পীরই ইহলোক পরলোকের একমাত্র পীর! আমি সপ্রমাণ করে ছাড়বো, বেলাভূমিতে তাঁর পীরই একমাত্র মুড়ি নন, আরো 'বিস্তরে বিস্তর'

আছে, এবং আমি তো রীতিমত একটা বোল্ডার—এ্যাকবড়া পাথরের চাঁই।

অবশ্য সেও ধুরন্ধরী। সে যদি শুধায়, শাস্তিনিকেতনে আচার্যের কর্ম আমি কি ভাবে সমাধান করলুম তখন আমি কিচ্ছুটি না বলে সাক্ষী মানবো কলকাতার একখানি অতি প্রখ্যাত দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়কে। তিনি সে-উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

গতানুগতিক সাধারণ অবস্থায় আমি আত্মচিন্তার জন্ম এতখানি ফুরসৎ পেতুম না। ইতিমধ্যে শহর-ইয়ারের সফেন বৃদ্বুদিত চিত্ত কথায় কথায় বকবকানিতে ফেটে পড়তো। কিংবা তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে ফেলত—তার অভ্যাস অমুযায়ী প্রত্যেকটি অসমাপ্ত রেখে।

এমন কি, এদানির সে কি পড়ছে, আমার সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরও এ-ভাবে সে দেয় নি।

আমি বললুম, ‘জানো, শহর-ইয়ার, আমার চতুর্দশ পুরুষ কিংবা ততোধিক ছিলেন পীর—সূফী?’

এতক্ষণ অবধি শহর-ইয়ার ছিল আপন মনের গভীর গহনে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন। “পীর,” “সূফী” এ-দুটি শব্দ তার কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো। তার নিশ্চিন্ত, কুয়াশা-মাথা চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দিনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটলো যেন হোঁচট খেতে খেতে।

শুধোলো, ‘সে—সে—সে কি? আপনি—আপনি—আপনি তো আমাকে কখনো বলেন নি। কি বললেন?—সূফী?’

আমি তনুহুর্তেই বুঝে গেলুম, শহর-ইয়ারের পীর তাকে সূফী-মার্গে দীক্ষিত করেছেন। কিংবা চেষ্টা করছেন।

আমি কিন্তু অত সহজে ধরা দেব না। তুমি কি আমার কাছ যে, বাঁশী শুনেই উদ্যম হয়ে ছুটবো!

আমি প্রাচীন দিনের চটুলতা আনবার ভান করে বললুম, ‘তা,

আমি তো কখনো বলি নি—তুমিও শুধোও নি—আমি প্রথম
শোবনে ক'বার প্রেমে পড়েছিলুম, তুমি তো কখনো শুধোও নি—'

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করে মনে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলুম।
শহর-ইয়ারের গুরু তাকে অজগরের মত আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরতে
পারেন নি। নইলে অশ্রু গুরু অশ্রু সূক্ষী সম্বন্ধে সে কণামাত্র কোঁতুল
দেখাতো না। বরঞ্চ এ-স্থলে কুকচিরা মাত্রই অশ্রু গুরুর কথা
উঠলেই তাকে নস্যাৎ করবার জন্ম উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রাচীন
দিনের আগুবাধ্য মনে এল—অশ্রুর পিতার নিন্দাবাদ না করেও
আপন পিতার প্রশংসা করা যায়।

ওদিকে দেখি, শহর-ইয়ার আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছে। আর এই সর্বপ্রথম দেখলুম, আমার 'রসিকতা' প্রতিক্রিয়া
স্বরূপ তার সদা শাস্ত্র ভালের এক প্রাস্তে, আঁখিকোণে যেন
সামান্যতম অসহিষ্ণুতার ক্রকুঞ্চন পরশ লাগিয়ে চলে গেল।

আর দুঃখ হলো এই দেখে যে, যে-শহর-ইয়ার আমার ভোঁতা
রসিকতাতেও একটুখানি সদয় স্মিতহাস্ত করতো—'হু' একবার বলেওছে,
"এটা কিন্তু জুতসই হলো না"—সে আজ রসিকতার পুকুরে (মানছি,
ঘোলা জলের ঐদোপুকুরে) যেন সাক্ষাৎ পরমহংসিনী হয়ে গিয়েছেন !

এ-অভিজ্ঞতা আমার বহুকালের। যে-কোনো-কিছুতেই মানুষ
মজে গিয়ে সিরিয়স হলেই সবচেয়ে সর্বপ্রথম তার লোপ পায়
রসবোধ। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ প্রেমের বেলা। রসে টইটমুর
পাড়ার সুকুমার যখন প্রথম প্রেমে পড়ে—ইংরিজিতে যাকে বলে
'কাক লভ'—তখন তাকে যদি আপনি কোনো-কিছু না জেনেওনে
নিতান্ত হার্মলেসলি শুধোন 'কি হে মুখখানা এত শুকনো কেন ?'
সে তখন সেই কাঠিয়াওয়াদি চাষার মত তেড়ে বলবে, 'শুখ-শুখকে
লকড়ি বন্ জাউংগা—তেরা ক্যা শালা।'

ধর্মরাজ্যে আমাদের অখণ্ডসৌভাগ্যবতী খাজিস্তে-বামু মুসন্নৎ
বেগম শহর-ইয়ার—আল্লা তাঁর শান-শওকৎ লুৎক-নজাকৎ হাজার

চন্দ্র বুদ্ধি করুন !—কোন গৌরীশঙ্করের শীর্ষদেশে তথাগতা হয়েছেন সে জানেন তাঁর অধুনালঙ্ক পীর সাহেব ; আমার কিন্তু এ তত্ত্ব বিলক্ষণ মালুম হচ্ছে, বীবীজান তাঁর স্বামী এস্তেক বাড়ির খানসামা-বাবুর্চি এবং আর পাঁচজনের লবেজান করে এনেছেন তো বটেই, আমার সঙ্গে তাঁর যে রসে রসে ভরা রসের মিতালী দিনে দিনে গড়ে উঠছিল সেই শিশু নীপতরুটি অধুনা অবহেলার খর তপনে বিবর্ণ পাণ্ডুর ; আসন্ন কালবৈশাখীতে ধূলিদলিতা এবং শ্রাবণে হবে কদমমর্দিতা ।

শাস্তকণ্ঠে বললুম, 'তুমিই তো আমাকে একাধিকবার বলেছ— এখন মনে হচ্ছে, তাতে হয়তো সামান্য বিষাদের সুর মাখানো ছিল—যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তোমার বুকে তুকান তোলে না । অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই স্নানার সঙ্গে নিজেকে ধস্ত মেনেছ যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম প্রকৃতির গান তোমার অস্থিমজ্জা তোমার অনিন্দ্যমোহন চিন্ময় ভুবন নির্মাণ করেছে ।

রবীন্দ্রনাথের সেই ধর্মসঙ্গীত এবারে একটু কান পেতে শোনো তো ।

আমাদের পরিবারে একাধিক সাধক সূক্ষীমার্গ অবলম্বন করেছিলেন । এ-পন্থার শেষ পথচারিণী ছিল আমার ছোট বোন সৈয়েদা হবীবুল্লাহ, সে এখন ও-পারে । আমার এক ভাগ্নী ঢাকাতে বাংলার অধ্যাপনা করে । সে তার সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছে । আমার এই বোনটি আবার ছিল সিলেটের 'পীরানী' । প্রতি ভোরে তার বাড়ির সামনে জমে যেত মেয়েছেলেদের ভিড় । তারা এসেছে বোনের দোওয়া নিতে কাচ্চাবাচ্চাদের অসুখ সারানোর জন্ত, বন্ধ্যারা এসেছে মা হবার জন্ত, আরো কত কী ! আমার বোন তাজিব-কবজ পানি-পড়া কিছুটি দিত না । এক এক জন করে মেয়েরা ঘরে ঢুকতো আর সে শুধু আশীর্বাদ করতো । বহুকাল ধরে, কেন জানিনে, সে শয্যাগ্রহণ করেছিল । শুয়ে শুয়ে গুনগুন করে

গান গাইত। সূফীতন্ত্রের মারিকতী গান। এবং নিজেই সুর দিয়ে অনেকগুলো গান রচনা করেছিল। ঢাকা বেতার মাঝে মাঝে সেগুলো শোনা যায়। তার একটা গীতিসঙ্কলন আমার আকাশ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি বলছিলাম—

শহর-ইয়ার প্রাচীন দিনের দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'না। আপনার বোনের কথা বলুন।'

আমি দৃঢ়তর কণ্ঠে বললাম, 'না।' আমিও এখন তপ্ত গরম। তুমি যদি গুরু নিয়ে মেতে উঠে আপন-জন, বেগানা-জন সর্বজনকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারো, তবে আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তারও বেশী অবহেলা করতে পারি।

বললাম, 'তুমি প্রশ্ন শুধিয়েছিলে, আমাদের পরিবারের সূফীদের সম্বন্ধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু বললাম। নইলে কোথায় 'রবীন্দ্রনাথের' বিশ্বজনমাণ্য ধর্মসঙ্গীত—আক্টার অল, গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীতই তো তাঁকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দেয়—তার কোথায় আমার ছোট বোনের মারিকতী সূফীগীতি?'

আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ খানিকটে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছি। বীবীকে যে তাঁর আকস্মিক ধর্মোন্মত্তার কল্পপের খোল থেকে (তওবা! তওবা!! কাছিম আমাদের কাছে হারাম—পাপবিদ্ধ অপবিত্র—না হলেও মকরুহ, অর্থাৎ বর্জনীয়) বের করতে পেরেছি সেটাও তো কিছু হেলাফেলার ফেলনা নয়।

যদিও আমি নম্রা শাস্ত্রা সূফী-কণ্ঠার অগ্রজ তবু তুর্ক-সিপাহীর মোগলাই কণ্ঠে আদেশ দিলুম, 'ঐ রেকর্ডটা বাজাও তো—

“তাই তোমার আনন্দ আমার পর

তুমি তাই এসেছ নীচে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হত যে মিছে” ॥’

শহর-ইয়ার রেকর্ডটি লাগালো। এতদিন অশ্রু গানের বেলা

মাঝে মাঝে সে যে-রকম গুনগুন করতো, এ-গানে সে সেটা করলে না। ধর্মসঙ্গীত তার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারলুম না।

গান শেষ হলে বললুম, ‘জানো শহর-ইয়ার, এ-গানেরই একটা লোকায়ত রূপ আছে :—

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমের ভিখারী।

দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি ॥

কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড কোথায় সিংহাসন।

পাতকীর চরণতলে লুটায় আসন ॥’

শহর-ইয়ার কোনো কিছু বলার পূর্বেই আমি আদেশ দিলুম, ‘অনেক রাত হয়েছে ; ঘুমুতে যাও।’

আসলে শহর-ইয়ার এখন ধর্মপথে স্বপনচারিণী। পরিপূর্ণ স্মৃশুণ্ড অবস্থায় কোনো কোনো মুজ্জিতাধি নারী পুরুষ দৃঢ়পদক্ষেপে ভয় নির্ভয়াতীত অবস্থায় ভ্রমণ করে সংকীর্ণতম আলিমার উপর দিয়ে—কোন বিধাতা বা অপদেবতার অদৃশ্য করাঙ্গুলি সঙ্কেতে কে জানে ? এই স্বপনচারীর হাল তখন বড়ই নাজুক এবং সঙ্কটময়। অকস্মাৎ কেউ তখন তার নাম ধরে ডেকে উঠলে বা তার গাত্রস্পর্শ করলে সে তার সম্মোহিত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই মুহূর্তেই কোনো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে ওঠাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

শহর-ইয়ার এখন যে ক্ষুরশ্ব ধারা সূফীরহস্তের কেশ-পরিমাণ সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে এই নব অভিযানে বেরিয়েছে—অর্ধসম্মোহিত অর্ধসচেতনাবস্থায়—তাকে এখন আকস্মিক তর্ক-মুদগর দ্বারা সচকিত জাগরণে কিরিয়ে আনা কি আদৌ সমীচীন হবে ?—যত্বপি সেটা আদপেই সম্ভবে।

কিন্তু প্রশ্ন, তাকে জাগাতে যাবো কেন ? নিতান্ত জড়বাদী চার্বাকপন্থী ভিন্ন এ দায়িত্ব নেবে কোন্ সবজাস্তা প্যাকস্বর ! হয়তো সে সত্য পথেই চলেছে। তত্বপরি আমার জানা আছে, খৃষ্টান, মুসলিম,

জৈন-বৌদ্ধ, হিন্দু ভক্তি-তত্ত্বের বহু তথাগত মহাত্মা বলে গেছেন, এ-মার্গে পদার্পণ করার প্রথম অবস্থায়—অবতরণিকায়—প্রায় প্রত্যেক সত্য সাধকই অল্পাধিককাল মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটায়। সামান্য মানবীর প্রেমমুগ্ধ দাস্তেও নাকি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দিক্-ভ্রাস্তের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। আর এ নারী তো মুগ্ধা সবচেয়ে 'সর্বনেশে' প্রেমে।

কিংবা এ-নারী কি এখন দ্বিতীয় মন্ডলে—খৃষ্টান মিস্টিকরা যাকে বলে মেনশন ? এখানে নাকি আসে এ্যারিডিটি—উষরতা, অমূর্বরতা। জগদ্বল্লভ নাকি ভক্তকে গোড়ার দিকেই এক ঝলক 'দর্শন' দিয়ে মিলিয়ে যান। শ্রীরাধা তাঁর বল্লভ রসরাজের সঙ্গশুখ কতকাল পেয়েছিলেন সেটা পরবর্তীকালে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর—তিনি নিজেই বলতে পারতেন না। সিলেটের একাধিক গ্রাম্যগীতিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার মরম তাঁর স্মরণে বলে আমি তাঁকে পেয়েছি ঐটুকু সময়ের তরে বিছাল্লতার পৃথীতলে পৌঁছতে যতখানি সময় লাগে।' তারপরই আরম্ভ হয় আকুলি-বিকুলি।

বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন এবং সাধককে একবার ক্ষণতরে 'দর্শন' দিয়ে জগদ্বল্লভের অস্তুর্ধান—সম্পূর্ণ একই ঘটনা।

তখন সেই উষরকালে সর্বপ্রেমিকই প্রোমিকাই আর 'গৃহবাসিনী' হয়ে থাকতে চায় না, তার 'কোন্ প্রয়োজন রজত কাঞ্চন', সে তখন 'গেরুয়া বসন অঙ্গেতে' ধরে তার স্নেহময়ী মাতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে।

শহুর-ইয়ার যে আত্মজন প্রিয়জনকে অবহেলা করেছে সেটা তো সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুীদের জগ্গ, ক্যাথলিক নান্-দের জগ্গ যে রকম সংঘ মনাস্টির আছে, মুসলমান রমগীর জগ্গ সে-রকম কিছু একটা থাকলে এতদিনে হয়তো সে সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিত। জীবন কাটাতো ধ্যানধারণায়, উপবাস-কৃচ্ছসাধনে, জনসেবায়—

সেবা ?

আমি যে এতক্ষণ শহুর-ইয়ারের সমর্থনে যুক্তিতর্ক দিয়ে মহলের পর মহল গড়ে তুলছিলুম সেই চিন্ময় এমারৎ এক লহমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে ধূলিদলিত—মাত্র একটি শব্দের অনধিকার প্রবেশে। ‘সেবা’ !

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নবীন সাধকের প্রতি সূক্ষী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হুজবেরীর প্রত্যাদেশ :--

সাধনার প্রথম বৎসর মানুষের সেবা করবে,

দ্বিতীয় বৎসরে আল্লার সেবা করবে,

তৃতীয় বৎসরে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হবে।

ডাক্তার, আর্ম, বার্ডির এত যে খেদমৎগার সুবো-শাম শহুর-ইয়ারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, তাকে সত্যকার মা জেনে আশ্মা বলে ডাকে—আমরা কি মানুষ নই ? সাধনার প্রথম বৎসরে তো মানুষের সেবা করারই প্রত্যাদেশ।

একদা শহুর-ইয়ারকে বলেছিলুম, তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর বেশভূষা হবে তোমার স্বামীর জন্ত। আর আজ যদি তুমি সর্বসুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করো, তবে তার সর্বপ্রথম সর্বোত্তম সেবা পাবে তোমার স্বামী।

ভেরো

খুব বেশীক্ষণ আত্মচিন্তা করি নি। দেহের ক্লাস্তি তো ছিলই, তত্বপরি ডাক্তারের বিপাক-বিহ্বলতা, শহর-ইয়ারের দূরত্ব-দূরত্ব ভাব আমার মনকেও অসাড় করে তুলেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম অল্পক্ষণের মধ্যেই। হজরত পয়গম্বর নাকি বলেছেন—যদিও তাঁর বাক্যটি কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে আমি স্বচক্ষে দেখি নি—‘মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ।’ কিন্তু মূর্খের নিদ্রা কোন পর্ষায়ে পড়ে সে-সম্বন্ধে কোনো আশ্রুতবাক্য আমি এ-তাবৎ শুনি নি, শাস্ত্রেও দেখি নি। আমি মূর্খ। জাগ্রতাবস্থায় আমার পাপাত্মা সৃষ্টিকর্তাকে গ্লান করবে না। তাই বোধহয় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর নামগান শুনিয়ে দেন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সম্পূর্ণ সচেতন হলাম।

শুনতে পেলুম, বেশ কিছুটা দূর থেকে অতি মধুর কণ্ঠে জপগীতি :

ইয়া লতীফুল্ / তুর্ক্বি না।

নাহম্ম'বিদক্ / কুল্লি না ॥

আরবী ভাষার দোহা।

হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও।

(কারণ) আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।

আমার মনে ধোঁকা লাগল, শহর-ইয়ার কি এ দোহাটির গভীরে পৌঁছে পুরোপুরি মর্মার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ?

যে আল্লাকে এ-স্থলে আহ্বান করা হচ্ছে তিনি ‘লতীফ’। শব্দটি সুন্দর এবং করুণাময় দুই অর্থই ধরে। অর্থাৎ একই শব্দে তাঁকে ‘শিবম্’ ও ‘সুন্দরম্’ বলা হচ্ছে। এখানে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে ‘উল্‌তুফ’।

এয় একটি অর্থ সরল—‘তুমি করুণাময় হও’ (‘বি’ ‘না’—আমাদের

প্রতি) কিন্তু অশ্রু অর্থ—‘তোমার সৌৰ্বন্দ আমাদের প্রতি বিকিরণ
করো’ কিংবা / এবং ‘আমাদেরকেও সুন্দর করে তোলো।’

আল্লার বহু গুণ বোঝাবার জন্তু মানুষ তাঁকে বহু নাম দিয়েছে।
কিন্তু সূফীদের কাছে তিনি ‘হক্ক’, অর্থাৎ ‘সত্যম্’। প্রখ্যাত সূফী
মনসূর অল্-হল্লাজ ‘আনাল্ হক্ক’, অর্থাৎ ‘আমিই সত্য’ ‘আমিই
ব্রহ্ম’ প্রচার করার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে, যখন
তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কঠিত হয় তখন প্রতি খণ্ড থেকে
রব ওঠে ‘আনাল্ হক্ক, আনাল্ হক্ক!’

শহূর্-ইয়ার ‘সত্যের’ সন্ধানে বেরিয়েছে, না সুন্দরের সন্ধানে ?

তার ললিত কণ্ঠের করুণ জপের (‘জিকূর্’) :

—সূর

লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর।

.....আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,

আছে তাহে নবতম আরম্ভের মঙ্গল বারতা।’

কিন্তু আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলুম শহূর্-ইয়ারের কণ্ঠস্বর
তাদের শোবার ঘর থেকে আসছে না। তবে কি সে স্বামীসঙ্গ
ত্যাগ করেছে! ইসলামের আইন-অনুযায়ী সে তো তা পারে না,
তার স্বামীও পারে না।

কিন্তু অমিই বা ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছি কেন ?

হয়তো ত্রিযামাযামিনীব্যাপী তার জিকূর্ স্বামীর নিদ্রাকে ব্যাঘাত
করবে বলে সে অশ্রু কামরায় আশ্রয় নিয়েছে।

অবসন্ন মনে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। রাত্রির
ফলকাতার আকাশ যেন নিগুণ ব্রহ্ম। কোনোরকম পরিবর্তন তার
হয় না। সদাই একই, কেমন যেন হিম্মানীর গ্লানি-মাখা পাণ্ডুর
সূর। শুনেছি, যুদ্ধের সময় নাকি ব্র্যাক-আউটের কল্যাণে
ফলকাতার ‘মডার্ন’ কবিয়া জীবনে প্রথম চন্দ্রমা দেখতে পান, এবং
ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন।

এটা কাল সকালেই শহর-ইয়ারকে বলতে হবে। সে আকছারই গবিতা' নিয়ে টকঝাল ফোঁড়ন কাটে—ওদিকে এসব আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও। একদিন বিষাদমাথা সুরে আমাকে বলেছিল, 'আমি যে-এ-সব কবিতাতে রস পাইনে তার জ্ঞা কি আমার দুঃখ হয় না? আমি এরই মধ্যে এত বুড়িয়ে গেলুম কি করে যে নবীনদের সুর আমার প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না?'

তখন হঠাৎ মনে ব্যথা জাগলো, সে-সব উষা-রসের নিশা তো তার আর নেই।

এ-সব ব্যথার উপশমের জ্ঞা বিধাতা সৃষ্ট করেছেন নিজা।

বেলাতে ঘুম ভাঙল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে, বাবা।' এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাক্তার চলে গেছেন কর্মস্থলে এবং শহর-ইয়ার গেছেন তার পীরের আস্তানায়। কে যেতে চায় ঐ নিরানন্দ ডাইনিংরুমে? আর এই তো প্রথম আমরা তিনজন এক সঙ্গে মুখোমুখী হব। কি হবে গিয়ে ঐ আড়ষ্ট মুক সমাজে। আমি তো আর বাগদেবী নই যে, মুককে বাচাল করে তুলবো!

কিন্তু শাস্ত কোথায়? কৌটিল্য যে বলেছেন, উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রাবল্লবে যে সঙ্গ দেয় সেই ব্যক্তিই বান্ধব—তার কি?

ব্যসন মানে অত্যধিক আসক্তিজনিত বিপত্তি। শহর-ইয়ারের এই অত্যধিক ধর্মান্ধিত্ব এক প্রকারের ব্যসন। কিন্তু এটাই বা দার্দ্রস্থায়ী হবে কে বলতে পারে? অবশেষে সে হয়তো তার ভারসাম্য ফিরে পাবে এবং সর্বশেষে সে শব্দার্থে ডাক্তারের সহধর্মিণী হবে। ভুল বললুম, এতদিন ধরে ডাক্তার তো ভেবেছে, সে যে ক্রিয়াকর্ম করে যাচ্ছে সেখানেই তার ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি—সেই শুদ্ধ আচার-নুষ্ঠানের বিশীর্ণ তরুণে বরঞ্চ শহর-ইয়ার তখন সিঞ্চন করবে সূক্ষী-সপ্তদের প্রেম-উৎস থেকে আহ্বিত নব মন্দাকিনীধারা। ধর্মবাবদে কৌতূহলা অথচ সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে ধ্যানধারণা

সাধনা-উপাসনার প্রয়োজন সে-খাতায় সম্পূর্ণ রিক্ত এই যে অধম—
সেও উপকৃত হবে।

‘গুড মনিং, গুড মনিং, গুড মনিং’ হেঁকে খানা-কামরায় ঢুকলুম।

ডাক্তারকে অপেক্ষাকৃত ‘প্রফুল্লতর’ দেখাচ্ছে। তবে কি এই
খোদার-সিধে লোকটা ঐ ছরাশা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, আমি
আসার দরুন তার সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! মুর্খ, মুর্খ,
মুর্খ! আমি কি টেলিফোনের 194 যে, ‘হোয়েন ইন্ ট্রবল’-এ নম্বর
রিং করলেই সর্ব ঝামেলা ফৈসালা হয়ে যাবে, না আমি পীরপ্যাকস্বর-
গুরুগোসাঁইয়ের খঁ্যাট?—যতপি শহুর-ইয়ারের নবলরু গরিমা—
রোওয়াব্‌টাকে কথঞ্চিং ঘায়েল করার জন্তু কাল রাত্রে আমি মুখে
মুখে হাইজাম্প লঙজাম্প মেরেছি বিস্তর—শহুর-ইয়ারের ‘জিকুরের
সেই লতীক্’ তাঁর ‘লুৎক্’ (দাক্ষিণ্য) বর্ষণ করে বর্বরতম আমার
এ মদদর্প যেন ক্ষমা করে দেন।

ডাক্তারকে শুধালুম, ‘কই, আজ যে এস্তা ল্যাটে? তবে কি
খে-সব কঙ্কাল নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা সরকারী ধর্মঘট করেছে,
না রবিঠাকুরের ‘কঙ্কালের’ মত মোলায়েম মোলায়েম গল্প বলার
জন্তু ‘মহিলা-মহলের’ প্যাটার্নে ‘কঙ্কাল-মহল’ প্রতিষ্ঠিত করার জন্তু
তাবৎ কঙ্কাল বেতার থেকে দাঁড়ায়ে পেয়েছে?’

অনুমান করলুম, ডাক্তার সজ্ঞানে কর্মস্থলে যেতে বিলম্ব করছে।
বউকে যতখানি পারে ঠেকিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বললেন, ‘তা আর বিচিত্র কি? শহুর-ইয়ারই কিছু
দিন পূর্বে বলছিল বেতারের হাঁড়িতে যা চাল বাড়ন্ত, আমার
কঙ্কালের না ডাক পড়ে?’

শহুর-ইয়ার-তখন ডাক্তারের লাঞ্ছের জন্তু স্থালাডে যে মায়োনেজ
দেবে তার জন্তু ডিমের কুসুম, সরষের তেল আর নেবু নিয়ে বসেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম, ‘তবেই দেখ, ইয়ার, শুধু
যে “গ্রেট মাইন্ড্‌জ্‌ থিনক্‌ এলাইক্‌” তাই নয়, দৈবাৎ কখনো-

খনো কোনো 'নীলমণিচন্দ্রমায়' তোমার মত গ্রেট মাইন্ড্ আর
 গ্রামার মত 'স্মল মাইন্ড্'ও একই রকম চিন্তা করে। আর তুমি
 য বেতীর তথা কঙ্কালতন্ত্র ডাক্তারকে বলেছ সেটি আমি একটি
 যন্ত্রচিত্রেও দেখেছি। গত যুদ্ধে 'হিটলারের যখন তাবৎ সৈন্য খতম,
 তখন আমাদেরই ডাক্তারের মত এক ডাক্তার বার্লিনের জাহুঘরে
 গিয়ে একটা কঙ্কালের পঁজরার উপর স্টিতস্কোপ রেখে পাশের
 রংকট আপিসারকে বলছেন, "হ্যাঁ, ফিট্ কর্ দি আর্মি!"'

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, মায়োনেজ
 তৈরি হয় অলিভ অয়েল আর সিরকা দিয়ে।'

শহূ-ইয়ার আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, 'ঠিকই শুনেছেন,
 কিন্তু অনেকেই তো মায়োনেজের ধকু বাড়াবার জন্ম ফিকে অলিভ
 অয়েলে ঝাঁঝালো মাসটার্ড পাউডার দেয়। ও-ছটোতে মিশে তা
 হলে তো সর্ষের তেলেই দাঁড়াবে। আর ইয়োন্নোপে টক নেবু নেই
 বলেই তো শুনেছি, তারা ভিনিগার ব্যবহার করে। নেবু অনেক তাজা।'

ইতিমধ্যে জমীল এসে শুধোলো, কি খাব ?

উদাত্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্রাদার, আমি তো ব্রেকফাস্ট খাইনে।
 কষ্ট কাল রাত্রে খানাতে ঠিক রুচি ছিল না বলে মেকদারে
 একটু কমতি পড়ে গিয়েছিল। ..দাও কিছু একটা।' শেষ কথা
 যি বললুম ঈষৎ অবহেলা ভরে।

খামার মতলব, শহূ-ইয়ারকে ইঞ্জিতে অতি মোলায়েম একটি
 খাঁচা দেওয়া। ভাবখানা এই, 'তুমি সামনে বসে ভালো করে
 খাবার জন্ম চোটপাট করবে, রসালাপের মধুসিঞ্চন করবে, তবে
 তো আমার জিভে জল, পেটে জারক রসের ছয়লাপ জাগবে। নইলে
 আমার কি আর অল্প অল্প জ্বোটে না?'

এবারে শহূ-ইয়ার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। সে-
 দিটিতে আমি যেন দেখতে পেলুম, কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা
 নৈরাশ্য

তবে কি সে বলতে চায়, সে খেয়ালখুশীতে আমাকে অবহেলা করে নি ; আমাকে, তার স্বামীকে সেবা করার মত শক্তি তার আর নেই ।

তারপর ধীরে ধীরে জমীলের কাছে গিয়ে বললে, ‘আমি খাবার তৈরি করছি, তুমি কমলালেবুর রস ঠিক করো ।’

আমার আপসোস হলো । কী দরকার ছিল আমার এ-অভিমান দেখাবার । আমি না স্থির করেছিলাম, আমি অভিমান করবো না । আমি, অগা, কি করে জানবো এ-মেয়ের বুকের ভিতর কি তুফান উঠেছে ? আমি কি করে বুঝবো ওর মনের কথা ? আপন মা-ই কি সব সময় বুঝতে পারে, তার সন্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষার দন্দ ? আমার তরুণ বয়সে দেখেছি, একাধিক সুশিক্ষিতা মাতা পুত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামতে বাধা দিয়েছেন । হয়তো সন্তানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ কারাবাসের দুঃখ যন্ত্রণা মাতাকে ত্রাসাতুর করে তুলেছিল । যাই হোক যাই থাক, মা তো তখন বুঝতে পারে নি, ছেলে বিভীষিকা দেখছে, সে যদি তার আদর্শ ত্যাগ করে কারাগারের বাইরে থেকে যায় তবে সেই মুক্ত পৃথিবী তখন তার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে বৃহত্তর, বৃহত্তম কারাগার !

শহূর্-ইয়ার আমার কে, যে, আমি তার হৃদয়মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দন্দ আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবো ? মুসলমান সমাজের ভিতর আমাদের ছ’জনার মধ্যে যে সম্পর্ক দিন দিন ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল, সে রকম সম্পর্ক আমাদের সমাজে কিছুদিন পূর্বেও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, এখনো সাতিশয় বিরল । খুদ আরব দেশ, ইরান-তুরান-আফগানিস্তান এমন কি এদেশের হারিয়ানা মধ্যপ্রদেশও তো এ-সব বাবদে বাঙালী মুসলমান সমাজের চের চের পিছনে ও-সব দেশে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে হদীস খুঁজতে যাওয়া বিলকুল বেকার । বরঞ্চ শহূর্-ইয়ার ও আমার উভয়ের অনুভূতিক্ষেত্রে যিনি আবাল্য রসসিঞ্চন করেছেন, সেই রবাল্পনাথকে শুধোই । তিনি এই

সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করে করে পৌঁচেছিলেন কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' আখ্যানে। সেখানে 'পত্রলেখা' নামী 'তরুণী' 'কুমারী' 'যুবরাজ' চন্দ্রাপীড়ের 'পত্নী' নয়, 'প্রণয়িনীও' নয়, 'কিংকরীও' নয়, 'পুরুষের সহচরী'।

কিন্তু শহর-ইয়ার আমার সহচরী কেন, নর্মসহচরীও তো নয়।

তত্পরি সে 'বিবাহিতা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা; আমিও একদারনিষ্ঠ।

কবিগুরুর তীক্ষ্ণদৃষ্টির খরতর শর কিন্তু আমাদের এই 'নাজুক' বা ডেলিক্ট সম্পর্কের অন্তত একটি সূক্ষ্মতম কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে। 'পত্রলেখা' সেখানে (চন্দ্রাপীড়ের সান্নিধ্যে; আসিয়া যে অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনো প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট।'

পরিস্থিতিতে অবশ্য পার্থক্য আছে। পত্রলেখা ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের তাশুলকরঙ্গবাহিনী পরিচারিকা; চন্দ্রাপীড় যুবরাজ। যুবরাজকে তো সাবধানে পা ফেলতে হয় না। কিন্তু শহর-ইয়ার ও আমার সম্পর্ক তো 'বরাবরের'।

তাই শহর-ইয়ারের 'স্থানটি তাহার পক্ষে' যেমন 'বড় সংকীর্ণ' আমারও 'একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট'।

তার প্রতি আমার সহানুভূতি, তার প্রতি আমার ভালোবাসা, তার অন্তরের দ্বন্দ্ব তাকে সহায়তা করা—এসবই যেন 'একটু এদিকে ওদিকে পা না ফেলে'! তা হলেই সংকট।

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ডাক্তার আসন ছেড়ে উঠে বললে, 'তা হলে আসি; আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, অর্ধসমাপ্ত ব্রেকফাস্ট টেবিলে রেখে। বললুম, 'আমাকেও একটুখানি বাইরে যেতে হবে। আপনি আমাকে ড্রপ করতে পারবেন?'

উভয়েই আশ্চর্য। কারণ আমি এ-বাড়ি থেকে মাত্র একবার
বেরিয়েছিলুম—তাও ওদেরই সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় ! কিন্তু আপনি ব্রেকফাস্ট শেষ
করুন।'

আমি তাঁচ্ছল্য ভরা কণ্ঠে বললুম, 'ওঃ ! ব্রেকফাস্ট ! সে বালাই
যা আমি কালেকশ্বিনে খাই, সে তো বুড়ি ছোয়ার মত।'

এটা নিছক শহর-ইয়ারকে খুশী করার জন্তু। সে যেন না ভাবে
যে, সত্যসত্যই কাল রাত্রে আমি অভুক্ত ছিলাম।

'ওষুধ কিছুটা ধরলো ; শহর-ইয়ার আমার দিকে যেন একটুখানি
কৃষ্ণনয়নে তাকালো। মেয়েটি সর্বার্থে অতুলনীয়া।

ওরা কিছু শুধোয় নি। আমি নিজের থেকেই বললুম, 'চললুম
অভিসারে। আমার সিঁথির সিঁছরের সন্ধানে।'

ডাক্তার তো বিস্ময়বিহ্বল, 'সিঁথির সিঁছর ? সে আবার কি ?
শহর-ইয়ারও তদ্বৎ।

একগাল হেসে বললুম, 'আমার পাবলিশার গো, আমার
পাবলিশার। উনি আছেন বলেই তো ছ'পয়সা পাই, মাছ-মাংস
খাই। সিঁথির সিঁছর না তো কি ?' ওদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষ
না করেই বললুম, 'আমার কিরতে দেরি হবে। আমার পাবলিশার
রীতিমত খানদানী মনিষ্টি। সায়েবনুবোদের মত পয়লা নম্বর
হোটলে লাঞ্চ খান। বিজনেস টক্ মক্ যা-কিছু সেসব হোটলে
'বার'-এ—পিন্জিন্ (পিংক্ জিন্) গেলাসের থার্মোমিটার সাইজে
ডাঁটাটি ঘোরাতে ঘোরাতে।...আমার গাড়ির দরকার নেই।'

আমার ইচ্ছা, শহর-ইয়ারের এদানিংকার প্রোগ্রাম ডিস্টার্ব ন
করা। মুরশিদ-মঞ্জিলে খাবার জন্তু তার যদি নিত্যনিত্য পারিবারিক
গাড়ির প্রয়োজন হয় তবে তাই হোক। আমি রাত না করে
কিরবো না।

আমি আশা করেছিলুম, সে বুঝে যাবে এটা আমার কোনে

অভিমানজাত প্রত্যাখ্যান নয় কিছুটা প্রসন্ন নয়নে আমার দিকে মুহূর্তেক তাকাবে।

রহস্যময়ী এ নারী। শুধু বললে, 'আমারও তো গাড়ির দরকার নেই।'

আমার খুশী হওয়ার কথা, কারণ এ-যুগে মায় ড্রাইভার চোপ্পর দিনের জন্ত মোটরপ্রাপ্তি যেন চৌরঙ্গীতে সৌন্দর্যবনের কেঁদো বাঘ-সওয়ার গাজী পীরের ইয়ার দক্ষিণ-রায়ে দক্ষিণ্যপ্রাপ্তি! কিন্তু আমার উন্টে হলো গোশ্শা। ওঃ! তুমি বৃষ্টি ধরে নিয়েছো, যানাভাবে দ্বিপ্রহর রোদ্রে, ঘর্মাক্ত কলেবরে যত বেশী ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে গুরু পদপ্রাপ্তে পৌঁছবে সেই অল্পপাতে তোমার মুরশিদসেবার পুণ্যধ্বজা মনুমেন্ট ছাড়িয়ে আল্লাতালার কুর্সিপানে ধাওয়া করবে! 'তকলীফ বরদাস্ত কর্নাতেই সওয়াব্' 'কুচ্ছ সাধনেই পুণ্য'—অর্ধসিদ্ধ বৈরাগ্যবিলাসীদের মুখে এ জাতীয় জনপদমূলভ নীতিবাক্য শুনে শুনে এক কামিল সূফী বিরাক্তভরে বক্রোক্তি করেছিলেন, 'তবে চড়ো না গে' প্রতি ভোরে হিমালয়ের চুড়ো, সেখানে পড়ো গে' ফজরের নামাজ! বেহেশতের বেবাক ফেরেস্তা সেই ছদো ছদো পুণ্যের খতেন রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন। আর চুড়ো চড়ার বেপথে যদি টেসে যাও তবে তা তো হাজার দফে বেহতর্। তখন তুমি পাবে শহীদের উচ্চাসন। পূর্বকৃত সর্বপাপভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সরাসরি চলে যাবে বেহেশতে!

না গো, শহর-ইয়ার, তোমার পুণ্যপন্থা আমি অত সহজে নিষ্কণ্টক করে দেব না। ছুপূরে বাড়িতে খাবও না। তোমার প্রোগ্রাম-প্ল্যান আমি এতই নর্মাল সহজ করে দেব যে তুমি কুচ্ছ সাধন করার রক্তটি পর্বস্ত খুঁজে পাবে না। আমি সতী বেহুলার চেয়ে ঢের বেশী চালাক।

উপস্থিত আমি শ্রেফ একটিবারের তরে তোমার মুরশিদ-বিরিঞ্চ-বাবার মুখারিবন্দরুচিটির দর্শন লাভ করে যে পুণ্যসঞ্চয় হবে সেইটে

মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব স্বর্গের পোস্টাফিসে—হোথায় সীট
রিজার্ভেশনের জন্য ইনসিওরেন্সের পয়লা কিস্তি !

আহা, শহুর্-ইয়ার, তুমি দর্শন পেয়ে গেলে, তুমি ভাগ্যবতী :—

‘অত্মপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায় ।

মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥’

এবং ততোধিক বিশ্বয় মানতে হয় যে আবাল্য ধর্মশাস্ত্র, এমন কি
ধর্মসঙ্গীতও উপেক্ষা করে কোন্ মন্ত্রবলে কোন্ পুণ্যফলে নিরকুশ
অবাবহিত পদ্ধতিতে আজ অকস্মাৎ হৃদয়ঙ্গম করে ফেললে,

‘যতপি আমার গুরু বেশ্যাবাড়ি যায় ।

তখাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥’

চৌদ্ধ

সর্বপ্রকারের বাদ-প্রতিবাদ অথও উপেক্ষা করে গেলুম শোবার ঘরে ।
চীনাংশুক-অঙ্গবাসটি স্কন্ধোপরি লম্বমান করে দৃঢ়পদক্ষেপে দৃকপাত
না করে সোপান অবরোহণান্তে রাজসিক পদ্ধতিতে আরোহণ করলুম
সেই মাদ্ধাতাতাতযুৎনাশ্ব সমসাময়িক স্বতশ্চলশকটে ।

ডাক্তার সভয় সবিনয় কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, 'গাড়িটা রাখুন না
সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে । আমি ভারি খুশী হব । আর জানেন
তো কলকাতায় যানবাহনের হাল ।'

আমি স্থির কণ্ঠে বললুম, 'আপনাকে কোনো বাবদেই "না"
বলতে আমার বড় বাধে । কিন্তু ক্ষণতরে বিবেচনা করুন, আমি
বেরিয়েছি চতুর্ভুজের দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ অর্থের সন্ধানে ; পক্ষান্তরে
শহর-ইয়ার বেরুবেন চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ স্নোফ্লোর সন্ধানে । কার
সেবাতে এস্থলে নিয়োজিত হবে এই শকট ?' তারপর মুহূহাস্য করে
বললুম, 'অপরাধ নেবেন না, শকটটিও মুম্বু তথা মুম্বু—তারও তো
ভূত-ভবিষ্যৎ আছে । সেই বা যাবে না কেন রাজেন্দ্রাণী সঙ্গমে
দেবদর্শনে ?'

ডাক্তার নিম্ন-সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এ গাড়ি আমি অতি
অবশ্যই ক্ষেপক্ৰমে বিক্রি করবো না । তাকে তার আপন গারাজ্চ্যুতাও
করবো না । এবং নিশ্চয়ই রাখবো নিত্য রানিং অর্ডারে, আপনার
ভাষায় স্বতশ্চলাবস্থায় ।'

আমি প্রসন্ন-বদনে বললুম, 'আর আপনার নাতি সেটি চড়ে
'ভিন্টেজ কার' রেসে নামবে ।'

বলতে পারবো না, হয়তো আমার দৃষ্টিভ্রম—কিন্তু আমার ষেন
মনে হলো ডাক্তার অশ্রুদিকে অতি সামান্য মুখ ফেরালেন ।

আমি সে-কুহেলি কাটাবার জন্ত শুধালুম, 'ডাক্তার, আপনার মনে আছে, গত বর্ষারস্ত্রে আপনারা যখন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন তখন একদিন অপরাহ্নে ওঠে প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়, তারপর মুদগরধারে শিলাবৃষ্টিপাত এবং সর্বশেষে রূপালী ঝালঝের মত রিমঝিম বরষন? শহর-ইয়ার বৃষ্টিতে ভিজবে বলে একা চলে যায় আদিত্যপুরের দিকে ?

আমরা হুজনাতে তখন বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনা করি। শেষের দিকে আপনি ইসলাম সম্বন্ধে ভালো ভালো রেফারেন্স বইয়ের একটি ফিরিস্তি আমার কাছে চান। সে-নির্ঘণ্ট শেষ করার পূর্বেই শহর-ইয়ার বাড়ি ফেরে।—তাই তখন দশ খণ্ডে অসমাপ্ত একখানি অতুলনীয় গ্রন্থের কথা আমার আর বলা হয়ে ওঠে নি।

বইখানির—বরঞ্চ বলা উচিত "ইসলামবিশ্বকোষ"—এর নাম "আম্মালি দেল্ ইসলাম" অর্থাৎ অ্যানালস্ অব্ ইসলাম,—ইতালীয় ভাষায় লেখা। কিন্তু তার পূর্বে এই অজ্ঞাতশত্রু বিশ্বকোষের একক স্রষ্টার পরিচয় কিছুটা দিই। ঐর নাম প্রিন্স্—ডিউকও বলা হয়—লেগুনে (অর্থাৎ সিংহ) কাএতানি। ইতালীর তিনটি পরিবারের যদি নাম করতে হয়, যাঁদের সঙ্গে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহলে কাএতানি পরিবারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে এ-পরিবারের যশ প্রতিপত্তি আরম্ভ হয় যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ-পরিবারেরই একজন বনিকাতিযুস নাম নিয়ে তদানীন্তন খৃষ্ট-জগতের পোপ নির্বাচিত হন। ইনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও কূটনীতিতে চাণক্য! ওদিকে যুদ্ধবিছায়ও পারদর্শী। ডেনমার্কের রাজাকে তিনি পদানত করেন এবং ফ্রান্সের সম্রাটকেও প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কিন্তু এসব তথ্য বলার কোনো প্রয়োজন নেই—এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর সমসাময়িক অমর কবি দান্তে তাঁকে

তঁার বিশ্ববিখ্যাত কাব্যে যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এহ
 বাহ্য। তবু কথা এই যে বনিফাতিয়ুস সে-যুগের সর্বোত্তম দার্শনিক
 স্পেনের মুসলমান আবু রুশ্দের দর্শন প্রায় সর্বাংশে গ্রহণ করে
 নিয়েছিলেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কারণ আবু রুশ্দ্ (ঐ যুগেই
 তঁার দর্শন একাদশ খণ্ডে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়—লাতিনে
 রুশ্দের নাম আভের এস্) যুক্তিতর্কদ্বারা প্রমাণ করতেন যে মৃত্যুর
 পর মানবাত্মা অনন্ত স্বর্গভোগ বা অনন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে
 পারে না। তার কারণ অনন্ততা, আনন্ত্যগুণের অধিকারী একমাত্র
 মহান আল্লা। মানবাত্মা নয়, এবং অনন্ত স্বর্গ অনন্ত নরকের
 আনন্ত্যগুণ স্বীকার করলে এরা সকলেই সেই মহান আল্লার
 (বেদান্তের ভাষায় একমেবাদ্বৈতম্ ব্রহ্মের) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে—
 এ-ধারণা কিন্তু তর্কমাকার অশ্বভিষ্ম—আটারলি এব্‌সার্ড। তাই
 আবু রুশ্দের মতে মৃতাত্মারা স্বর্গ-নরক যথোপযুক্ত কাল ভোগ করার
 পর আল্লাতাল্লা অবশেষে সর্ব আত্মা, স্বর্গ, নরক সব, সব-কিছু
 নিজের মধ্যে আ প না তে সংহরণ করে নেবেন। তখন তিনি
 আবার একম্, অদ্বৈতম্।’

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, ‘এই মতবাদটা আমি ঠিক ঠিক
 বুঝতে পারি নি। একটু সবিস্তার বলুন।’

আমি বললুম, ‘নোঃ! আমি দর্শন প্রচার করিনে। আমি
 শোনাই কাহিনী। একটি করুণ কাহিনী। শোনাবার জন্ত আমি
 এস্থলে অতি সংক্ষেপে একটি পটভূমি নির্মাণ করলুম মাত্র। তৎপূর্বে
 আরো আধ মিলিগ্রাম দর্শনবিলাস করতে হবে। এদিকে আবার
 খৃষ্টান মাত্রেরই অটল অচল বিশ্বাস পুণ্যাত্মা অনন্ত স্বর্গস্থ এবং
 পাপাত্মা অনন্ত নরকযন্ত্রণা পাবে। ওদিকে পোপ, খৃষ্টজগতের পিতা,
 যার পুণ্যান্ধনির্গত প্রতিটি বাক্য শাস্ত্রাতিশাস্ত্র আশ্রিতবাক্য, সেই
 সর্বশাস্ত্রবিশারদ পোপ বনিফাতিয়ুস ‘গ্লেক্স যবন’ দার্শনিক আবু রুশ্দের
 মতবাদ এমনই আকর্ষণ গিলে বসে আছেন যে তিনি তঁার সহকর্মী

কার্ডিনালদের সমক্ষে গোপন রাখতেন না যে, তিনি মৃত্যুআর অনন্ত স্বর্গনরক-ভোগাদিতে বিশ্বাস করেন না। তাই পূর্বেই বলেছি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। খৃদ বাইবেলের বিরুদ্ধে এই 'স্লেচ্ছ' 'যাবনিক' মতবাদ প্রচার করার জন্ত পোপকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে কবি দাস্তে বিলাপ করে তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর জ্বলাদরা যেরকম তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাঙ্গবিদ্রপ করেছিল ঠিক সেই রকম 'প্রভু যীশুকে দ্বি তীয় বারের মত বাঙ্গবিদ্রপ করা হলো।

কিন্তু এহ বাহ্য।

যে কা এতানি পরিবারে এই পোপের জন্ম-পরিবারে যুগ যুগ ধরে বহু পণ্ডিত, বহু গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এ-পরিবারের শেষ পণ্ডিত, আমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক লেওনে কা এতানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, এই পোপের উপর আরব দার্শনিক আবু রুশ্দের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর পারিবারিক ও পোপদের প্রচলিত ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে তিনি আরবী ভাষা ও মুসলিম সভ্যতার প্রতি অকুণ্ট হন।

পর পর দু'খানি অত্যন্তম গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি ইয়োরোপ তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভূখণ্ডে নব "শমসু-ল-উলেমা" (জ্ঞান-ভাস্কর) রূপে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও অকুণ্ট প্রশস্তি লাভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন, এ-সব উটকো বই না লিখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন নিয়োজিত করবেন ইসলামের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে। বিদ্বজ্জন সোল্লাসে হর্ষধ্বনি তথা সাধুবাদ প্রকাশ করলেন।'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম, মেডিকেল কলেজ আর বেশী দূরে নয়। বললুম, 'এবার আমি আমার মোদা কথাতে চলে এসেছি।

রাজপরিবারের অংশবিশেষ, অসাধারণ সুপুরুষ, সংগীতচিত্রশিল্পী ইত্যাদির সক্রিয় সমঝদার কা এতানি প্রেমাবদ্ধ হলেন এক পরমা

সুন্দরী, সর্বগুণাধিতা রোমান রমণীর সঙ্গে । সৌভাগ্যক্রমে প্রেমটি হলো উভয়ত ও গভীরতম ।

বিবাহ হয়ে গেল । তাবৎ ইতালী এক কণ্ঠে বললে, তাদের দেশের নীলাম্বুজের স্থায় গভীর নীলাকাশের সঙ্গে চক্রবালবিস্তৃত ইন্দ্রধনুর এহেন পূর্ণাঙ্গ আলিঙ্গন ইতিপূর্বে তাদের এবং সর্ববিশ্বপূজ্য 'রোমেও জুলিয়েতের' প্রেমভূমিতেও হয় নি ।

তারপর আমাদের 'লেওনে—“নরসিংহ”—ডুব দিলেন তাঁর ইসলামের ইতিহাস—তাঁর “আন্নালি” বা “অ্যানালস—” গ্রন্থে ।

বউ এসে বললেন, “ওগো, শুনছো, কাল সন্ধ্যায় আমাদেরই তসকানানি আসছেন সঙ্গীত পরিচালনা করতে । ঐ দেখো টিকিট পাঠিয়েছেন । অগ্ন্যালোকে হন্তে হয়ে ধরা দিচ্ছে শুদ্ধুমাত্র গুঁর দর্শন পাবার জন্ম ।”

লেওনের মুখ বিবর্ণ । অপরাধীর মত বললেন, “কিন্তু আমার ‘আন্নালি’—এ-অধ্যায়টা শেষ না করে—আচ্ছা, কাল দেখব ।”

কিন্তু ‘কাল’ ও সেই ‘দেখবো’টা দেখা হয়ে উঠলো না । লেওনে ডুব মেরেছেন ‘আন্নালির’ গভীর অরণ্যে ।

তারপর এলেন ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ টেনর গাওয়াইয়া কারুজো । কল তদৎ .

মাঝে মাঝে বলতেন, “তা তুমি, ডালিং (দিলেস্তো), দিনোর সঙ্গে যাও না কেন ? সে তো সবসঙ্গীতে আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সমঝদার । আমার আন্নালি—”

বউ ঠোঁট চেপে বললেন, “দিনো তার ‘প্যাতীত্ আম্ম’ (প্রিয়া বান্ধবী-র) সঙ্গে যাচ্ছে ।”

আকাশপানে হানি যুগল ভুরু লেওনে অবাক হয়ে শুধোলেন, “সে কি ? দিনোর তো সুন্দরী বউ রয়েছে । এই হালেই বিয়ে করেছে । এর-ই মধ্যে ‘প্যাতীত্ আম্ম’ ?”

যা শুনেছি, তারই স্বরণে যতটুকু মনে আসছে তাই বলছি, বউ নাকি ঠোঁট ছুটি আরো কঠিনভাবে চেপে চলে যাচ্ছিল—

লেওনে গোংলাতে তোংলাতে—তিনি ছিলেন লক্ষ্মীটারার মত অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মী-তোংলা—বললেন, ‘কিন্তু, কিন্তু, ডার্লিং, আমার আন্নালি, আ—’

আন্নালি, আন্নালি—আবার সেই আন্নালি।

প্রেমিক, রসিক, ললিতকলার বিদগ্ধ সমঝদার লেওনে এখন হয়ে গিয়েছেন শুদ্ধমাত্র পণ্ডিত। পণ্ডিতেরও বউ থাকে। কিন্তু এ-স্থলে লেওনের একটি ‘প্যাতীত্ আমি’ তাঁর হৃদয়াসন জুড়ে বসে গেছেন। আন্নালি।

লেওনে যে তাঁর বউকে সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবেসে তার পদপ্রান্তে তাঁর সর্বাঙ্গা নিবেদন করেছেন এ-তত্ত্ব তাইবোরিয়ো রোমবার্সা জেনে গিয়েছে। বস্তুতঃ লেডিকিলার রোমান নটবররা এখন কস্‌কস্‌ গুঞ্জগুঞ্জ করতে আরম্ভ করেছে, লেওনেটা একটা স্ট্রেন ভেড়ুয়া, ভাস্তুয়া (পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় বউয়ের দেওয়া ‘ভাত’ না পেলে যে-ক্লাবের দিন গোজরান হয় না), আস্থ একটা নপুংসক।

এদিকে লেওনে তাঁর সর্বনস্তা স্ত্রীর কাছে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত। তাঁর দেবী যে তাঁর আন্নালিকে তার সপত্নী, তার “প্যাতীত্ আমি” রূপে কাম্যন কালেও ধরে নিতে পারে সেটা তার স্মৃদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু ডাক্তার, এই দগ্ধ জগতে কত চপবেচপেরই না সতীন হয়। সেই যে হিংস্রটে দ্বিতীয়পক্ষ দেখলো তার স্বামী একটা মড়ার খুলি বেড়ার কঞ্চির উপরে রাখছে সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করে ফেললে, এটা নিশ্চয়ই তার যুঁতা সপত্নী সীমস্তিনীর সীমস্তবহনকারী মস্তকের খুলি! তাই না মিনষের পরানে এত সোহাগের বান জেগেছে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। তনুহূর্তেই—না, বরঞ্চ বলবো— তনুহূর্তেরও তিন মিনিট আগে, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে “কৌরনকে পাঁচ মিনিট পেহলে”, সেই খুলিটা কেলে দিলে বাড়ির পিছনের

বিষ্ঠাকুণ্ডে । সে কেছা থাক, ডাক্তার, এ-বাবদে আমি বিস্তর গবেষণা করেছি—সুবিধে-কুবিধে মত কোনো এক সময়ে সেটা হবে । শুধু একটি আপ্তবাক্য বলি, এ-দেশের হরিপদ কেরানী যে তার কুলে জীবনের দশটা-পাঁচটা বেঁচে দিয়েছে তার জন্ত তার বউ খেদ করে না । কিন্তু বাবদ-বাকি ষোল সতেরো ঘণ্টা সেই পদী-বউ হয়ে যায় রাজ-রাজ্যেশ্বরী পটুমহিষী রানী পদ্মিনী পদ্মাবতী—শাহ-ইন্-শাহ বাদশা আলাউদ্-দীনও সেখানে ইতর জন ।

আমাদের পণ্ডিত লেওনে একটি আস্ত মূর্খ ।

এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানেন না, গভীর, উভয়পাক্ষিক প্রেমের পর, বিয়ে হওয়ার পরও অনেক কিছু করার থাকে । সেগুলো অতি ছোটোখাটো জিনিস । কিন্তু ছোট হলেই কি ছোট জিনিস সবাবস্থাতেই ছোট, বড় জিনিস বড় ? পিপীলিকা অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী ; হাতি বৃহত্তম । চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু বানানের বেলা ? সেখানে পিপীলিকার বানান চের বেশী শব্দ—হাতির তুলনায় ।

লেওনে মূর্খ । তিনি বুঝতে পারেন নি, এসব ছোটোখাটো অনেক ব্যাপার আছে । বউকে কনসাটে নিয়ে যাওয়া, তার জন্মদিন বা নামকরণ দিন স্মরণে রেখে ভালোমন্দ কিছু-একটা সওগাৎ নিয়ে আসা, বিবাহের বর্ষাবর্তনের দিন হৈ-ছল্লোড় করে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে উত্তমরূপে সমাধান করা—এ-সব কিছুই লেওনের স্মৃতিতে আসে না । আল্লালির গভীর গর্ভে এসব জিনিস ডুবে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ ।

ইঠাৎ এক সকালে লেওনে ব্রেক্ফাস্ট খেতে এসে দেখেন, তাঁর পেলেটের উপর ছোট্ট একটি চিরকুট ।

এবং ইতিমধ্যে তাঁর মত আপন-ভোলা লোকও লক্ষ্য করলেন, যে-বউ সদাসর্বদা তাঁর ব্রেক্ফাস্ট তৈরি করে দিত, সেও সেখানে নেই ।

চিরকুটটি খুলে পড়লেন, 'আমি তোমার ভবন পরিত্যাগ করলুম।
অপরাধ নিয়ো না।'

ডাক্তার হতভম্ব।

তারপর রাম-গবেটের মত তোৎলাতে তোৎলাতে যা শুধোলো
তার বিগলিতার্থ, এ-রকম একটি সর্বগুণসম্পন্ন মহিলা যিনি তাঁর
আপন দায়িত্বের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন পেয়েছেন তাঁকে ত্যাগ করে
চলে গেলেন ?

আবার নূতন করে বুঝতে পারলুম, আমাদের এই মাইডিয়ান
লার্নেড ডাক্তারটি হয়তো তাঁর চাকৎসা-শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসাদাৎ মড়াকে
জ্যাস্ত করতে পারেন, কিন্তু জ্যাস্ত লোক যে দৈহিক মৃত্যু ভিন্ন অস্থ
নানাভাবে মরতে পারে—কএস যেরকম লায়লাকে ভালোবেসে বন্ধ
উন্মাদ হয়ে গিয়ে লোকমুখে প্রচারিত মজনুন (যার স্কন্ধে জিন্ = ভূত
চেপেছে ; উপাধি পান—এ-সবের কোনো এনটি তাঁর জীবনের
খাতাতে নেই। তাঁর কাছে সব-কিছুই সরল সিলাজিমে প্রকাশ
করা যায়.—

ডাক্তার শহূর্-ইয়ারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন।

শহূর্-ইয়ার ডাক্তারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে।

অতএব এঁদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ আসতে পারে না।

কিউ ই ডি!!!

প্রভু যীশু নার্ক বলেছেন, শুধু রুটি খেয়েই মানুষ বাঁচে না, ঠিক
তেমনি বলা যেতে পারে দাম্পত্যজীবনে শুধু প্রেম দিয়েই পেট ভরে
না।

কিন্তু এসব তত্ত্বকথা ডাক্তারকে এখন বলে আর কি লাভ ?
মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গিয়েছে।

বললুম, 'ডাক্তার, আমাকে অনেকেই শুধোয়—বিশেষ করে
আমার মস্তান চেলারা শুধোয়, কোন্ দেশের রমণী আমাকে সব চেয়ে
বেশী মুগ্ধ করেছে। কী প্রশ্ন! আমি কি দেশে দেশে কাস্তা, দেশে

দেশে প্রিয়া করে বেড়িয়েছি না কি যে, এর পাকি উত্তর দেব। তবে নতাস্ত 'হাই-কোর্ট' মাত্রই দেখি নি বলে চোখ কান খোলা ছিল। এবং লক্ষ্য করেছি, স্পেন আর ইতালির মেয়েরা হয় তেজী আর স্বামী হ'ক প্রেমিক হ'ক তার উপর যে হক্ক বর্তায় সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানটি হয় খুবই টনটনে—ভয়ঙ্কর জেলাস্। 'অভিমান' শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ নেই, ইতালি ভাষায়ও খুব সম্ভব নেই। তবু ইতালির নিম্নশ্রেণীতে হিংসুটে রমণী প্রতি গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায়, আর ভদ্রসমাজে অভিমানিনীরা অভিমানের চূড়ান্তে পৌঁছে আত্মহত্যাতে বাধ করি জাপানীদেরও হার মানায়। কাএতানির বউ এক অর্থে আত্মহত্যাই করলেন, এবং করলেন একটি জলজ্যাস্ত খুন। কিন্তু এহ বাহ।

লেওনের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবিস্তর সংবাদ কেউই দিতে পারে নি। তবে তাঁর পরবর্তী আচরণ থেকে এ-স্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

আম্মালির দশাংশের একাংশ তখনো শেষ হয় নি।

তার পর একদিন লেওনে ইতালি থেকে উধাও। কেউ জানে না কোথায় গেছেন।

তার কিছুদিন পরে খবর এল লেওনে তাঁর বিরাট জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছেন দূরের চেয়ে দূর সুদূর ক্যানাডায়। সেখানে সামান্য জমিজমাসহ একটি কুটির খরিদ করেছেন। ঝনের ভিতর।

সেখানে দিন কাটান কি করে ?

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জলের ধারে, বঁড়িশি ফেলে।

কে জানে, মাছ ধরা পড়তো কিনা।

আর তাঁর হাজার হাজার বই—অন্তত ত্রিশটি ভাষায়—যার উপর নির্ভর করে, যে সব ইট-সুরকি দিয়ে তিনি তাঁর আম্মালি-কুৎবমিনার গড়ে তুলেছিলেন ?

জানিনে । কিন্তু এ-কথা জানি, তিনি ক্যানাডা যাবার সময় একথানা বইও সঙ্গে নিয়ে যান নি ।’

ডাক্তার বললেন, ‘সে কি কথা ? তাঁর সমস্ত সাধনা বিসর্জন দিলেন ?’

‘তাই তো বললুম, লেওনের বউ তাঁকে ছেড়ে যাবার সময় খুন করে গেলেন, পণ্ডিত লেওনেকে । আর যেহেতুক পণ্ডিত লেওনেই ছিলেন লেওনের চোদ্দ আন্না সত্তা তাই বলা যেতে পারে, তিনি লেওনেকেই খুন করলেন ।

তিনি যেন যাবার সময় বলে গেলেন, “আন্নালিই যদি তোমার আরাধ্য দেবী হন, তবে আমার স্থান কোথায় ?”

লেওনে যেন উত্তরে বললেন, “তুমিই ছিলে আমার জীবনের আরাধ্যা । আন্নালি নয় । প্রমাণ ? সেই অসমাপ্ত আন্নালি-প্রতিমাকে ভেঙে চূরমার করে চললুম নিরুদ্দেশে ।”

এবং আমার মনে হয়, লেওনে যেন পত্নীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছিলেন, “তুমি রোমান সমাজের উচ্চশিক্ষিতা রমণী হয়েও বুঝতে পারলে না, আমি কাকে কোন্ জিনিসকে কতখানি মূল্য দিই !”

এ-কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয় ।

লেওনে কিন্তু তাঁর তাবৎ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করতে পারেন নি বা তাঁর সে-দিকে হুঁশ ছিল না । কাজেই দশ দশ বিরাট ভলুমে বেরুলো তাঁর আন্নালির অতিশয় অসমাপ্ত অংশ । আরবী প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণবরা সেটিকে রাজমুকুটের কুহ-ই-নূরের মত সম্মান দেন ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণবরা আন্দেখা করতে লাগলেন, লেওনেকে কি করে সেই পাণ্ডুবর্জিত ক্যানাডা থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক করা যায়—যাতে করে অন্তত তিনি তাঁর আন্নালি সমাপ্ত করে যান ।

এক প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণবদের সাধারণ সম্মেলনের পর পণ্ডিতরা গোপন বৈঠকে বসে স্থির করলেন কয়েকজন সমঝদার গেরেস্কারী বৃদ্ধ পণ্ডিতকে পাঠাতে হবে, 'ডেপুটেশনে, লেওনের কাছে। এঁদের সবাইকে বিনয়ী লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এঁরা আপন আপন খরচে পৌঁছিলেন, পৃথিবীর সেই সুদূর অগ্ন প্রান্তে ক্যানাডার ভ্যানকুভারে—বিন্ নোটিশে। লেওনে সবাইকে তাঁর সরল অনাড়ম্বর কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেপুটেশন ডিনারের পর কফি-লিকোর খেতে খেতে অতিশয় যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে, তাঁদের সমস্ত ধার, সমস্ত ভার, লেওনের ক্ষেপ্ত্র নামিয়ে কি সব উপদেশ দিয়েছিলেন, কি সব অনুন্নয়বিনয় করেছিলেন তার কোনো প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নেই, তবে আমি কল্পনা-রাজ্যে উদ্ভীর্ণ হয়ে কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমার অনুমানে কি যায় আসে! এ যে এক বিরাট ট্রাজেডি। এ তো শুধু ছুটি নরনারীর ব্যক্তিগত মান-অভিমান বিরহ-মিলন এবং সর্বশেষে অন্তহীন বিচ্ছেদের কাহিনী নয়—যেটা হর-আকছারই হচ্ছে—এখানে যে তার বাড়া রয়েছে, অকস্মাৎ অকালে একটি প্রজ্ঞাপ্রদীপের অন্ধকারে নিলয়। শুধু পণ্ডিতজন না, যুরোপের বহু সাধারণ জনও আশা করেছিল, লেওনের আন্সালির জ্যোতিঃ ইসলাম-ইতিহাসের বহু অন্ধকার গুহাগহ্বর প্রদীপ্ত করে তুলবে—কারণ লেওনে লিখতেন অতিশয় সাদামাটা সরল ইতালীয় ভাষা।

ডেপুটেশনের সর্ব বক্তব্য লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে শুনে বললেন, কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি ডেপুটেশনকে তাঁর শেষ মীমাংসা জানাবেন।

ডেপুটেশন দেশে ফিরে গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও তাঁরা লেওনের তরফ থেকে কোনো চিঠি পান নি।

লেওনে কাএতানি তাঁর খোলস দেহটি ত্যাগ করে ইহলোক ছাড়েন ক্যানাডাতেই, খৃষ্ট জন্মদিবসে, বড়দিনে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে।

তঁার জন্ম রোম শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। আমার গুরু আমাকে একাধিনীটি বলেন লেওনের মরজগৎ ত্যাগ করার প্রায় এক বৎসর পূর্বে।

যুদ্ধে মিসিং জোওয়ানের মা যেরকম বছরের পর বছর নিস্তব্ধ, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা করে, তার ছুলাল একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, আমার গুরু অরিবী শাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত, স্নেহময়ী মাতার ত্রায় বহু বৎসর ধরে প্রতীক্ষা করতেন লেওনে একদিন আবার তঁার ক্যানাডার অরণ্যানীর বনবাস ত্যাগ করে ফিরে আসবেন তঁার মাতৃভূমি ইতালিতে। তার পর অধ্যাপক গুনগুন করে যেন আপন মনে বলতেন, “লেওনের মত এরকম স্পর্শকাতর লোক কি আমৃত্যু বিদেশ-বিভূঁইয়ে পড়ে থাকবে? নাঃ, হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পূর্বে রোমে ফিরে আসবে। যাতে করে তার হাড়িগুলো তার মায়ের হাড়িগুলোর পাশে শেষ-শয্যায় শয়ান করা হয়।” কিন্তু আমার গুরুর এ ছুরাকাজ্জা পূর্ণ হয় নি।’

ততক্ষণে ডাক্তার আবার খানিকটে সংবিত্তে ফিরে এসে কি যেন শুধোচ্ছে। আমি ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললুম, ‘বাস, আমরা মেডিকেল কলেজে পৌঁছে গিয়েছি। এবারে আমি পাবলিশার্সদের কাছে যাচ্ছি।’

মনে মনে বললুম, বুদ্ধুটা এখনো যদি না বোঝে আমি কোন্ দিকে নল চালাচ্ছি, তবে ঝকঝক, ঝকঝক, হাজার বার ঝকঝক।

পনরো

প্রকাশকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এ স্থলে অবাস্তর।

তবে এ স্থলে এ-বাবদে একটি কথা বলতে হয়। শহর-ইয়ারদের বিস্তর টাকাকড়ি। আমার অর্থাভাব সে ভালোভাবেই বুঝতো, কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী বলে আরো জানতো আমাকে কোনো প্রকারের সাহায্য করতে চাইলে আমার আত্মাভিমাণে লাগবে।

একদিন তাকে ঠাট্টাচ্ছিলুম, ‘আমি জীবনে সাতবার না আটবার ক’বার চাকরি রিজাইন দিয়েছি বলতে পারবো না। কারো সঙ্গে আমার বনে না। যখন চাকরিতে থাকি, তখন ‘সাহিত্য-সৃষ্টির’ কোনো কথাই ওঠে না। মাইনের টাকা তো আসছে। বই লেখার কী প্রয়োজন? চাকরি যখন থাকে না, তখন ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘শব্দনম্’ এসব আবোল-তাবোল লিখতে হয়।’

শহর-ইয়ার তাজ্জব হয়ে শুধিয়েছিল, ‘আপনি শুধু টাকার জন্ত লেখেন!’

আমি বলেছিলুম, ‘এগ্জ্যাক্টলি! মোস্ট সার্টেনলি!’

তারপর বলেছিলুম, ‘জানো, শহর-ইয়ার, এ-বাবদে অন্তহীন সাহিত্যাকাশে আমিই একমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকা নই। মহা মহা গ্রহ উপগ্রহও ঐ একই নভোমণ্ডলে বিরাজ করার সময় বলেছেন, লজ্জাঘৃণাভয় অনায়াসে তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, কথাগুলো আমার ঠিকঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা কথা এই, “নান্ বাট্ এ ফ্ল রাইট্‌স একসেপ্ট ফর মানি” অর্থাৎ “অর্থাগম ভিন্ন অণ্ড কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে শুধু গাড়লরাই।” স্বয়ং ডক্টর জনসন বলেছেন “আমি লিখি টাকার জন্ত!” বুঝলে ইয়ার, শহর-ইয়ার?’

ঈষৎ জ্রকুঞ্চন করে শহর-ইয়ার শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, কাল যদি আপনি দশ লক্ষ টাকার "লটারি জিতে যান তবে কি করবেন ?' (আমি জানতুম, 'ডাক্তারের জমিদারী, কলকাতার গণ্ডা গণ্ডা বাড়ি থেকে প্রতিমাসে ওদের দশ-পনরো হাজার টাকা আমদানি হয়, আর ব্যাঙ্কে আছে দশ পঁচিশ লাখ)।

আমি সোল্লাসে বললুম, 'দশ লাখ ? পাঁচ লাখ পেলেই আমার কাজ হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে কালি কলম কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে বলব, বাঁচলুম। এখন থেকে লিখব শুধু প্রেমপত্র, আর, আর চেকের উণ্টো দিকে নাম সই।'

শহর-ইয়ার টাকাকড়ি বাবদে বড়ই অনভিজ্ঞ। শুধোলো, 'চেকের উণ্টো-পিঠে সই, তার অর্থ কি ?' আমি লক্ষ্য করলুম, প্রেমপত্র নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন শুধোলো না। আর চেককে তো তার স্বামীর নায়েব সই করে। সে-সব জিনিস তার জানার কথা নয়।

বললুম, 'চেকের উণ্টো-পিঠে সই, মানে, সে-টাকা আ মি পাবো। আর এ-পিঠে সই, তার মানে টাকাটা আ মা কে দিতে হচ্ছে। জানো না, দিশী ছড়া :—

“হরি হে রাজা করো, রাজা করো।

যার ধারি তারে মারো ॥

যার ধারি ছ'চার আনা,

তারে করো দিন-কানা।

যার ধারি ছ'শ চার শ'

তারে করো নির্বংশ ॥”

বুঝলে, চেকের এ-পিঠে সই করার প্রতি আমার অনীহা কেন ?'

এ স্থলে বলে রাখাটা প্রয়োজন মনে করি যে, আমার যে-ক'টি ইয়েসমেন চেলা আছে, তারা সবাই তখন বলে, “না, স্বর ! আপনার দশ লাখ টাকা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবান করুন, আপনার যেন চাকরি না জ্বোটে। তাহা হইলে আপনি লেখনী

বন্ধ করিবেন না। কলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য ত্রীবৃদ্ধিশালী হইবেক, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে উচ্চাশ্রমে প্রবেশ করিবেক।”

কিন্তু শহর-ইয়ার এ স্থলে সে-বুলি আওড়ালো না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিলক্ষণ জানে, আমার ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ সাম্প্রতিক যত মূল্যই ধরুক তার দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নাও থাকতে পারে।

তা সে যাই হোক, প্রকাশকের কাছে দরিদ্র লেখকের ছ’পাঁচ টাকার জঞ্জাল ধরে দেওয়াটা সে ‘বিতৃষ্ণার সঙ্গে শুনে যেত। তার সহানুভূতি ছিল লেখকের সঙ্গে।

তাই জানতুম, সে আমাকে শুধোবে না, আমি টাকা পেলুম কি না।

ডাইভার যখন বন্ধিম চাটুয্যে স্ট্রীটে পৌঁছল তখন তাকে বললুম, ‘তুমি বাড়ি যাও, আমি ট্যাক্সি ধরে গিরব। মা-জী পীরের বাড়ি যাবেন। গাড়িটার দরকার হবে।’

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, “কিন্তুক সায়েব যে বললেন, আমি আপনার জঞ্জাল গাড়িটা রাখি।”

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ডাইভারও শহর-ইয়ারের এই গুরু নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করে না।

তাই দৃঢ় এবং মোলায়েম কণ্ঠে বললুম, ‘না, ভাই, তুমি বাড়ি যাও।’

ডাইভারকে শুধিয়েছিলুম, পীরের নাম ঠিকানা কি ?

ঘণ্টাখানেক পরে সেই উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলুম।

আমার এক মুসলমান চেলা একদিন আমাকে বলেছিল, সে নাকি তার এক ল্যাটাই-ভক্ত দোস্তের পাল্লায় পড়ে সেই দোস্তের পীর দর্শনে যায়। গিয়ে তাজ্জব মেনে দেখে, গুরু বসে আছেন একটা বিরাট হলের মাঝখানে। আর তাঁকে ঘিরে গোটা আষ্টেক ডপকী

ছুঁড়ী দাঁড়িয়ে। তাদের উত্তরাঙ্গে ব্লাউজ-চোলী নেই। ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি খসে পড়ে গিয়ে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করে দিচ্ছে। কেউ তখন শাড়ি তোলে, কেউ তোলে না। আর গুরু বলছেন, 'এই দেখো, আমি চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না। আমি ভেবেছিলুম, 'অতখানি না হলেও অনেকটা ঐ রকমেরই হবে। শহর-ইয়ার নিশ্চয়ই কোনো 'বুজরুক' শার্ল্যাটেনের পাল্লায় পড়েছে।

বিরাট গৃহে বসে আছেন পীরসাহেব। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হতভম্ব।

পীরটি তো আমার প্রাচীন দিনের বন্ধু আমীনুর রশীদ মজুমদার।

ষোল

আমি স্তম্ভিত ।

আমি বেকুবের মত বাক্যহারা । এমন কি পীরসাহেবকে সেলামটা পর্যন্ত করতে ভুলে গিয়েছি । পীর মানি আর নাই মানি, স্বেচ্ছায় পীরের আস্তানায় গিয়ে তাকে সেলামটা পর্যন্ত করলুম না, এতখানি বেয়াদব, বেতমীজ মস্তান আমি নই ।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি । পার্ক সার্কাস আমার চেনা পাড়া । পীরমুর্শিদরা সচরাচর এ-পাড়াতেই আস্তানা গাড়েন । আমার এক পুত্রবৎ সখা মুসলমান হলে, কচিবাবু আমাকে একদিন বলেছিল, সেনাকি তার এক 'কর্তাভজা' বন্ধুর পাল্লায় পড়ে জর্নৈক পীর দর্শনে যায় । সেখানে গিয়ে দেখে, পীরসাহেবের চতুর্দিকে গোটা আষ্টেক খাপসুরত উপকী হরী তাঁর চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে । আর তিনি নাকি ক্ষণে ক্ষণে উদাহ হয়ে বলছেন, 'এই দেখো, এই দেখো, আমার চতুর্দিকে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না, আমার ঘি গলছে না ।' কচিবাবু নাকি একেবারে বেবাক নির্বাক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ।

আমি কিন্তু সেভাবে হতভম্ব হই নি ।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মনে হয়েছিল, একতলাতে বাড়ির মালিক সপরিবার বাস করেন, দোতলাতে পর্দা চিক ঝিলিমিলির প্রাচুর্য থেকে অনুমান করলুম, এখানে পীরসাহেবের শিষ্যারা আলাদা-ভাবে থাকেন, আসেন ।

তেতলায় যে ঘরে পীরসাহেব বসে আছেন সেটি অনাড়ম্বর । খানচারেক তক্তপোশ মিলিয়ে একটি ফরাশ । পীরসাহেব ছোট্ট

একটি তাকিয়াতে হেলান দিয়ে ঐ তক্তপোশেই উপবিষ্ট কয়েকজন শিশ্যিকে কি-একখানা চটি বই থেকে পড়ে শোনানোছেন ।

তক্তপোশের এ-পারে কয়েকখানি চামড়ামোড়া আয়াম-কেদারা ।

এ-সবেতে হতভঙ্গ হবার মত কিছু নেই ।

পীরসাহেবের চতুর্দিকে ঘি-গলানেউলী অষ্টরমণী নেই, এমন কি চিত্রে খুঁটান সেন্টদের মস্তকের চতুর্দিকে যে 'হেলো' বা 'জ্যোতিঃচক্র' থাকে সেটি পর্যন্ত তাঁর মস্তক ঘিরে নেই ।

লৌকিক, অলৌকিক, কুলৌকিক কোনো কিছুই নেই । অত্যন্ত সাদামাটা পরিস্থিতি ।

আমি স্তম্ভিত হলাম পীরসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ।

আমি আন্দেখা করেছিলুম, দেখতে পাবো এক বুজুরুক, ভণ্ড, শার্লটন । আমারই ভুল, আমারই বোঝা উচিত ছিল, শহর-ইয়ার এ-রকম কাঁচা মেয়ে নয় যে বুজুরুকি দেখে বানচাল হবে ।

আমি অবাক, এই পীর আমার সাতিশয় পরিচিত জন ।

বছর পঁচিশেক পূর্বে ঐর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খ্যাতনামা পুত্র, পণ্ডিত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—বরদায় ; বিনয়তোষ ও আমি তখন বরদাতে সরকারী কর্ম করি । পীর খাঁটি বাঙালী মুসলমান ।

শহর-ইয়ারকে মনে মনে পুনরায় সানন্দ নমস্কার জানালুম । বাঙালী মাত্রই—কী হিন্দু, কী মুসলমান—হয়বকত তাকিয়ে থাকে পশ্চিমবাগে । কন্নৌজের ব্রাহ্মণগুরু, দিল্লীর মুসলমানপীর ঐরা যেন এই 'পাপ' বঙ্গদেশে আসেন পশ্চিমের কোনো-এক 'পুণ্য'লোক থেকে । একমাত্র কাবুলে দেখেছি, সেখানকার হাজার বাটেক হিন্দু পূর্ববাগে তাকায়, কারণ পশ্চিমবাগে তো আর কোনো হিন্দু নেই । তাই প্রতি দু'তিন বৎসর অন্তর তাদের এক গুরু আসেন বন্দাবন থেকে । তাদের মন্ত্র নেওয়া প্রাচিস্তির-কিস্তির করা বছর দুয়েকের জন্ত বন্ধ থাকে ।

শহুর্-ইয়ারের হৃদয় মন গড়ে দিয়েছেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ।

ধর্মক্ষেত্রে সে যখন অবতরণ করলো তখন সে বরণ করেছে, বাঙালী
র । বাঙালী পীরই তো বাঙালী রমণীর অশ্রাব-পরিপূর্ণতা বুঝতে
ারবে সব চাইতে বেশী । শহুর্-ইয়ার পশ্চিমবাগে তাকায় নি ।

এই পীরটির নাম—অবশ্য তখনো তিনি পীর হন নি—আমীন্সর
শীদ মজুমদার । তিনি গুজরাতে এসেছিলেন মধ্যযুগের পীরদের
াস্তানার সন্ধানে । কবীর, দাদু, জমাল কামাল, বুড্‌চন্‌ এঁদের
ানেকেই তাঁদের হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিমূলক মতবাদ প্রচার করেন
জরাতে । তহুপরি বরদার অতি কাছেই নর্মদা নদী বয়ে যাচ্ছেন ।
হমালয়ে প্রধানত থাকেন সাধু-সন্ন্যাসী । নর্মদার পারে পারে
াকেন পীর-ফকীর সাধু-সন্ন্যাসী দুই সম্প্রদায়ই । স্বর্গত অরবিন্দ
দ্যব বরদায় অধ্যাপনা করার সময় প্রতি শনি-সোম কাটাতেন নর্মদার
ারে পারে উভয়ের সন্ধানে ।

এই আমীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে তখনই বুঝে গিয়েছিলুম
য়, বিনয়তোষ সত্যই একটি সত্যার্থেবীকে বাড়িতে এনেছেন তাঁর
চিন্তাধারা তাঁর অভিজ্ঞতা জানবার জন্য ।

বিনয়তোষের ধর্মপত্নী ছিলেন ভূদেববাবুর আদর্শ ছাড়িয়েও
।চীনতরা হিন্দু-গৃহীণী । এদিকে পূজাআচ্ছা ব্রত-উপবাসে পান
কে চুন খসতো না, ওদিকে দরিদ্রনারায়ণ অতিথি সেবার বেলা
নি বিলকুল নিষ্পরোয়া 'মুচিমোচরমান' ডোমটাড়ালের সেবা
র যেতেন । বিরাট কাঁসার থালায় তিনি আমীন্সর রশীদ মিঞার
বা করলেন ।

বিনয়তোষের অনুরোধে তাঁর ওপেল গাড়িতে করে মিঞাকে
র বাসস্থানে নিয়ে গেলুম । সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি একটি
মবস্তী অশাস্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন ।

আমি একটু আবছা আবছা ভাবে যেন ক্লীণফুট আত্মচিন্তা
রলুম, 'এখানে আপনার অশুবিধা হচ্ছে না ?'

আমীন সাহেবের স্মিতহাস্যটি বড় মধুর এবং কিঞ্চিৎ রহস্যময় বললেন, 'তেমন কি আর অসুবিধে। এদের অধিকাংশই মুসলমান কাপড়ের মিলে কাজ করে। 'মদ খায়, জুয়ো খেলে আর বউ ঠ্যাঙায়। কিন্তু আমার মত বেকারের প্রতি তাদের স্নেহ আশ্রয় প্রচুর। তবে মাঝে মাঝে বড় বেশী চিৎকার হৈছল্লোড়ের দর আমার কাজের একটু-আধটু অসুবিধে হয় বৈ কি!'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধিয়েছিলুম, 'আপনার কাজটা কি? রশীদ সাহেব কোনো উত্তর দেন নি। আমি অহুমান করলুম তিনি যে শুধু নর্মদার পারে পারে তত্ত্বানুসন্ধান করছেন তাই নয়, সম্ভব ধ্যানধারণা, জিক্‌ব-তস্বী, যোগাভ্যাস, সূফী-চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করে থাকেন।

অতিশয় সবিনয় কিন্তু কিন্তু করে নিবেদন করলুম, 'আপনার য কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন না।'

'কী দরকার! এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। আপনাদের অসুবিধে হবে হয়তো।'

আমি বললুম, 'আমি তো একা থাকি। মাত্র একটি পাচ আছে। তবে সে মাছ-মাংস ছোঁয় না। ফলে আমিও বাড়ি নিরামিষাশী। আপনার একটু কষ্ট হবে। আর আমার দিন কা কলেজে। অপরাহ্ন আর রাত্রির এক যাম কাটাই আমার পা সহকর্মী অধ্যাপক ওয়াডিয়ার বাড়িতে।'

জানিনে, হয়তো এই নিরামিষের চ্যালেক্স মৎস্যভুক বঙ্গসন্তান আমার বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু আমীন মিঞা যদিও মাঝে মাঝে আমাকে নর্মদার পা ফকীর সাধুসন্ন্যাসীদের কাহিনী শোনাতেন তবু তিনি ছিলেন ঘোর সংসারী। প্রতি ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে পাচক ইন্দ্রায় নিয়ে বেরুতেন বাজারে। কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরে কুটে কুটেতেন, কয়লা ভাঙতেন, উনুন ধরাতেন আর ইন্দ্রায়কে হা

লমে বাতলাতেন কি প্রকারে ছানার ভালনা, ধোকার কোল, ড়র চচ্চড়ি তৈরি করতে হয়।

আমি অত বোকা নই। আমি বুঝে গিয়েছি, তিনি কারো দ্বারোহণ করে মুক্তে থাকতে চান না। বরং যতপি আমি সংসার লানো বাবদে একটা আস্ত অগা, তথাপি লক্ষ্য করলুম, চিরকুমারকে বাহ বাবদে উৎসাহিত করে লোকে যে বলে, 'টু ক্যান লিভ্ অ্যাজ পলি অ্যাজ ওয়ান'—স্বামীজীর যা খরচা অবিবাহিত পুরুষেরও এই খরচা—সেটা কিছু মিথ্যে প্রলোভনকারী স্তোকবাক্য নয়। জনার খরচাতে তিনজনেরও চলে। তত্পরি তখন ছিল সস্তাকড়ির জার।

বড় আনন্দে বড় শান্তিতে কেটেছিল ঐ ছ'টি মাস। কখনো আমীন মিঞার ঘরে, কখনো বিনয়তোষের বারান্দায়, কখনো ওয়াড়িয়ার রকে আমাদের চারজনাতে নানাপ্রকারের আলোচনা তো। সবচেয়ে মজার লাগত, বিনয়তোষ তন্ত্রঘেষা, আমীন মিঞা ক্তিমার্গের সূফী, আর বরদা-আহমদাবাদ, সুরাট বোম্বাইয়ের আবজ্জন জানতো, চার্বাকের পর সোহরাব ওয়াড়িয়ার মত পাঁড় স্তিক কস্মিনকালেও ইহভুবনে অবতীর্ণ হন নি।

তারপর একদিন আমাদের কাউকে, এমন কি তাঁর জান দিলের দাস্তো ইন্দ্ররায়কে ছায়ামাত্র আভাস-ইঙ্গিত না দিয়ে আমীন মিঞা এক গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রে নিরুদ্দেশ। জানতুম, অল্পসন্ধান থা, তবু আমরা তিনজনাই মাঝে মধ্যে সেটা করেছিলুম। কোনো ল হয় নি।

তার পরিপূর্ণ ত্রিশ বৎসর পর আবার আমাদের চারি চক্ষে মলন।

পীরও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন ; তবে পীর, পুলিশ, ব্যারিস্টার, গজ্ঞার সংসারের এত শত বিচিত্র জিনিস দেখবার সুবিধে-কুবিধে

পান যে তাঁদের অভিজ্ঞতার কেলাইডেস্কোপ যত বিচিত্র প্যাটার্নই তৈরি করুক না কেন ঐরা সংবিৎ হারান না। ‘কোন বাঁকে কী খন দেখাবে, কোনখানে কী দায় ঠেকাবে?’ এই অপ্রত্যাশিতের আশা কবিদের—পীর পুলিশের নয়।

ততক্ষণে আমি সংবিতে ফিরেছি। আদব মাস্কিক মাথা ঝুঁকিয়ে ঠুঁকে একটা সালাম জানিয়েছি। তিনি প্রত্যভিবাদন জানালেন। যদিও আমার শোনা ছিল, বহু পীর বহু গুরু প্রতিনমস্কার করেন না।

কারণ এত রবাহুত, অনাহুত এমন কি অবাঞ্ছিত জনও পীরের ঘরে সুবো-শামু আনাগোনা করে যে এক পলিটিশিয়ান ভিন্ন অল্প কোনো প্রাণীর সাধ্য নেই যে, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ‘সালামালিক’ জ্ঞানায়, বা ‘শতংজীব’ বলে।

আস্তানায় গিয়েছিলুম বেলা প্রায় চারটার সময়। ঐ সময় ‘আসরের নামাজ’ বা অপরাহ্নকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। পীর-সাহেব আসন ত্যাগ করে অল্প ঘরে চলে গেলেন—অনুমান করলুম, নামাজ পড়তে। মুরীদান (শিশু সম্প্রদায়) পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে রওয়ানা হলেন। আমি ‘কি করবো, কি করবো’ ভাবছি এমন সময় একজন গেরেমভারী চেলা এসে আমাকে কানে কানে বললেন, ‘হুজুর আপনাকে তসলিমাৎ জানিয়েছেন। হুজুরের নামাজ-ঘরে একটুখানি আসবেন কি?’ যে সমস্তম-কণ্ঠে চেলাটি আমাকে দাওয়াৎ-সন্দেশটি জানালেন, তার থেকে অনায়াসে বুঝে গেলুম যে পীরের নামাজ-ঘর হোলি অব্ হোলিজ্জ, সানখটুম সানকুটরুম, হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগহপ্রায়। সেখানে প্রবেশাধিকার অল্পজনেরই। আর আমি প্রথম ধাক্কাতেই!

নামাজ-ঘরে ঢুকতেই পীর আমাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর বরের এককোণে পাতা একখানি সিলেটি শেতলপাটিতে আমাকে বসালেন, নিজেও বসলেন। ‘হু’ একটি কুশঙ্গপ্রশ্ন শুধিয়ে বললেন, ‘আপনি একটু নাশ্‌তা করুন। ততক্ষণে আমি নামাজটি সেরে নি।’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি করে হয় ? আপনি নামাজ সাক্ষর। তারপর একসঙ্গে খাব।'

অভিমানভরা কণ্ঠে পীর আমীন বললেন, 'এই তো আপনার সখার প্রতি ভালোবাসা, আর এই তো আপনার শ্রুতিশক্তি ! আমি যে দিনে একবার খাই সেও ভুলে গেছেন ?'

আমি বেহুঁ শরম পেলুম। এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। তাই লজ্জাটা চাকবার জন্তে সঙ্গে সঙ্গে আমার মত মূর্খের মাধ্যমে একটি মিথ্যা সহজুর জুটে গেল—নিছক আল্লার মেহেরবানীতেই বলতে হবে। কারণ আসমান-জমীনে কে না জানে, মা সরস্বতী গূর্খকেই (যথা কালিদাস) হরহামেশা দয়া করেন ; নইলে চালাকরা নিশ্চয়ই এতদিনে আমার মত কুলে বেওয়ারিশ বেকুবের সর্বস্ব গ্রাস করে, আমাদের 'সত্য নাশ' করে আমাদের পিতামহাশয়দের নির্বংশ করতো।

সেই কিস্তি-প্রসাদে প্রাপ্ত সহজুরটি দিতে গিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললুম, 'তা-তা-তা, সে-সে, সে তখন আপনি—আপনি ছিলেন আমার গরীবখানায়—'

পীরের কপালে যেন হাল্কা মেঘের সামান্য আবছা পড়েছে। তাই দেখে আমি ধেমে গেলুম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আর এখন আমি পীর—না ? এখন আমি যত খুশী গাণ্ডেপিণ্ডে গোগ্রাসে যত চাই তত গোস্ত গিলতে পারি—না ?'

ধেমে গেলেন। আমি আশঙ্কা করেছিলুম, এর পর তিনি আমাকে খোঁটা দিয়ে বলবেন, 'তাই আমি পীর হয়েছি—না ? চেলাদের ঘাড় ভেঙে তাদের মগজ দিয়ে মুড়ি-ঘন্ট খাবো বলে—না ?'

না। এ লোকটি যে অতিশয় ভদ্র।

আমি চুপ করে গিয়েছি দেখে বললেন, 'ভাই মৈয়দ সাহেব, আমি জানি, আপনি খাঁটি পীরের নাতি। আপনি কথার মুখে কথায় কথায় ওটা বলে ফেলেছেন।'

আমি খুলী হয়ে বললুম, 'আমি যে পীরের নাতি সেটা মেহেরবানী করে আর তুলবেন না, সেটা দয়া করে ভুলে যান। আপনি তো নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, ধর্মবাবদে আমি একটা আস্ত চিনির বলদ। ওটা দেখেছি, শুঁকেছি, ওর দরদাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, কিন্তু ওটা কক্থনো চাখি নি—খেয়ে দেখা তো দূরে।'

তিনি বললেন, 'এসব কথা পরে হবে; কেন আমি এখানে আছি, কেন আমি 'পীর' রূপে এখানে 'দর্শন' দিচ্ছি—'

ইতিমধ্যে সেই গেরেমভারী চেলা একটা বিরাট ট্রে নিয়ে এসে আমার পাশে রেখেছেন। তার উপর অতিশয় সযত্নে সাজানো ছ'খানি মুড়মুড়ে চেহারা তেকোনা পরোটা, গ্রেট্ট ঈস্টারনের পাঁউরটির মত ফোলানো টেবো-টোবো বিরাট একটি মম্লেট, ডুমো-ডুমো আলু-ভাজা, এবং কাঁচা-লঙ্কার আচার।

আমি আবার পেলুম দারুণ শক্। এ-সব যা এসেছে এ তো আমার জন্ম তৈরি করা শহূ-ইয়ারের ফেভারেট মেন্নু!

এ তো আমাদের উভয়ের প্রিয় মেন্নু!

কি করে শহূ-ইয়ার জানলো, আমি এখানে এসেছি?

কিন্তু এ-শক্টা সামলাতে না সামলাতে পেলুম এর চেয়ে মোক্ষমতর দুসরা শক্।

পীরসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শহূ-ইয়ার বান্নু।' আর কিছু না বলে খাতে উঠে নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন।

সত্তরো

আমি মিরাকুল বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করিনে।
যে ইরান কর্তাভজাগিরিতে ভারতের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে
পারে তারই এক গুণীজন হাফ-মস্করা করে বলেছেন :

‘পীরেরা ওড়েন না, ওঁদের চেলারা ওঁদেরকে ওড়ায়।’

‘পীরহা নমীপরন্দ, শাগিরদান উনহারা মীপরন্দ।’

বিশেষতঃ, এই পীর আমিন সাহেবকে আমি অন্তরঙ্গভাবে একদা
চিনেছিলুম। তিনি যে এ-রকম একটা বাজে স্টান্ট মারবেন—খাস
করে আমার উপর—যে, তিনি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ধরে ফেলেছেন,
আমি শহর-ইয়ারের সন্ধানে এসেছি সেটা আমি বিশ্বাস করতে
নারাজ। কাজেই সে-কথা পরে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

কিন্তু শহর-ইয়ার জানলো কি করে যে আমি এখানে
এসেছি ?

সে নিজে পর্দা মানে না, কিন্তু পীরসাহেব যে তাঁর শিষ্যদের
সম্পর্কে কিছুটা মানেন সেটা দোতলার চিচ্, পর্দা থেকে খানিকটে
অনুমান করেছিলুম। কিন্তু সেই চিকের আড়াল থেকে শহর-ইয়ার
যে উঁকিঝুঁকি মারবে সে-রকম মেয়ে তো সে নয়। বরঞ্চ আজকের
মত মেনে নিলুম, শহর-ইয়ার অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছে।
আজ বাড়ি ফিরে যদি কথা ওঠে, তবে সেই ইরানী গুণীর হাফ-
মস্করাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে তাকে বলবো—

‘পীরেরা ওড়েন না, কিন্তু ওঁদের চেলাদের, বিশেষ করে ‘চেলী’দের
কেউ কেউ ওড়েন।’

‘পীরহা নমীপরন্দ, ওয়া লাকিল বা’জী শাগিরদান খসুসান
জনানা মীপরন্দ।’

এতে তাজ্জব বনবার মত কী-ই বা আছে ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বজয় করেন নি কিন্তু তাঁর শিষ্য বাগ্মীরাজ বিবেকানন্দ করেছিলেন !

একজন নমাজ পড়ছেন, তার অনতিদূরে আরেকজন থাকছে—এটা দৃষ্টিমধুর না হলেও ইসলামে বারণ নয় । হুঁঃ! বারণ হবে কেন ? দূর সম্পর্কের আমার ফুফুকে দেখেছি, বাচ্চার মুখে মাই তুলে দিয়ে তসবী-মালা জপ করতে ।

আমি কোনো প্রকারের শব্দ না করে মিনিমামতম পরোটা খাচ্ছি—যত্বপি শহুর্-ইয়ারের আপন হাতে সযত্নে তৈরি (এটা ভুল বললুম, তাকে আমি অযত্নে কখনো কোনো কাজ করতে দেখি নি) খাস্তা, ক্রিস্প, মুড়মুড়ে পরোটা মর্মরধ্বনিবিবর্জিত কায়দায় খেতে পারাটা একটি মিনি-মিরাকুল্—এমন সময় আমার চিন্তাস্বরের এক প্রান্তে একটি বিছাল্লৈখা খেলে গেল ।

ওঃ ! তোমার আপন বাড়িতে আমি কি খাই না-খাই সে-বাবদে তুমি আমার যত না দেখ-ভাল করো তার চেয়ে এখানে তোমার হুঁশিয়ারি চেয়ে বেশী টনটনে ! গুরুর বাড়ির ইজ্জৎ ? না ?

অভিমানভরে হাত-চলা বন্ধ হয়ে গেল ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবেকান্বরে আরেকটি সং বুদ্ধির বিছাল্লতা শাখা-প্রশাখা মেলে দিল :

আমি কী নেমকহারাম ! মাত্র অর্ধদিবস, তার চেয়েও কম, হয়তো সম্পূর্ণ অজানায়, সে বাড়িতে ছিল না বলে আমি আমার পরিচিত পরিচর্যা পাই নি । আর সঙ্গে সঙ্গে বেবাক ভুলে গেলুম তার এত দিনের দিল্-ঢালা খেদমৎ, প্রাণ-ভরা সেবা ? ছিঃ ! এ তো সেই প্রাচীন কাহিনীর নিত্যদিনের পুনরাবৃত্তি ! যে-লোক একদা আমাকে হাতি দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে, সে আজ বেয়ালটা দিল না বলে তনুহুর্তেই নিলাজ নেমকহারামের মত তাবৎ অতীতের অকৃপণ

গান ভুলে গিয়ে 'মার মার, কাট কাট' ছুঁছকার ছেড়ে তার পশ্চাতে পাগুর নিয়ে তাড়া করা !

তত্বপরি আরেকটা রীতি-রেওয়াজ মনে পড়ল ! যদিও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তবু বিশ্বস্তজনের কাছে শুনেছি, যে পীরের কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে সেখানেই মহিলা-শিষ্যারা আপন হাতে রান্না-পান্না করে, নাশ্তা বানিয়ে সমাগত জনের সেবা করেন । এ-রীতি তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ।

যে কাজ যারা উত্তমরূপে করতে পারে বিধাতা তাদেরই স্বক্লেমস কাজ চাপান ।

নইলে তিনি শেষালের কাঁধে দিতেন সিংহের কেশর, বেরালকে দিতেন হাতির গুঁড় ।

শহূর-ইয়ার যে বস্তু সব-চেয়ে ভালো তৈরি করতে পারে সেইটেই করেছিল ।

মনে শাস্তি পেলম । পীর মিরাকুল করতে পারুন আর না-ই পারুন, বহু তৃষিত নরনারী শুষ্ক হৃদয় নিয়ে যেখানে ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে সেখানে আল্লাতালা কিছু-না-কিছু শাস্তির সুধাবারি বর্ষণ করবেনই করবেন ।

এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি কথা যোগ দিতে হয় । শহূর-ইয়ারকে আমি দিনে দিনে, এতদিনে যে-ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তারপর তার যে-কোনো আচরণ—সে আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রিয় হোক—গ্রহণ করতে গোপনে গোপনে সে-হৃদয় সব সময়ই তৈরি । চোরাবাজারীর চোরাই মাল নেবার জ্ঞান কালোবাজারী যে-রকম তৈরি থাকে ।

প্রসন্ন মনে আবার হাত চালালুম । পরোটার অশ্রুপ্রাস্ত চুরমুড়ুলুম ।

অপরাত্তের যে-আসূরের নমাজ পীর পড়ছিলেন শাস্ত্রাদেশে সেটি হৃষ ।

পীরসাহেব পনরো মিনিটের ভিতর নামাজ শেষ করে উঠলেন
আমিও উঠে দাঁড়ালুম। তিনি ঘরের এক কোণ থেকে একট
ভাঁজকরা ডেক চেয়ার টেনে এনে আমার সামনে সেটি পেতে
বসলেন।

আমি চুপ করে আছি। যদিও একদা তিনি আমার কথা ছিলে
তবু তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বাক্যালাপ তিনিই আরম্ভ
করবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না; তিনিই বললেন, 'শহর
ইয়ারের কথা ভাবছি।'

আমার মনে সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরোদয় হলো, তিনি জানলে
কি করে. আমি শহর-ইয়ারের সন্ধানে এখানে এসেছি? তবু চুপ
করে রইলুম।

বললেন, 'আমার কাছে অনেক লোক আসে। মনে আছে
আপনার,-আমরা যখন একসঙ্গে বরদাতে বাস করতুম তখন একদিন
আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাকে পড়ে শুনাতিলেন?—

'ভক্ত ধীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।

কুটির তাহার ঘরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।

কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পাড়িয়া দেহো',

সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বক্ষ্যা রমণী কেহ।

কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষু দেখাও মোরে',

কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।"

রবীন্দ্রনাথ মহান কবি। তিনি মানুষের কামনা-বাসনার সংক্ষিপ্ত
একটি কিরীসত্তর ব্যঞ্জনা দিয়ে বাকিটা বিদগ্ধ পাঠকের কল্পনাশক্তি
উপর বরাৎ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে তো কল্পনা করতে হয়
না। মানুষের সম্ভব এসম্ভব সব অভিলাষই আমাকে শুনতে হয়
বিশ্বাস করবেন কি, সৈয়দ সাহেব, জাল দলীলপত্র তৈরি করে, ভেজা
মোকদ্দমা রুজু করে আমার কাছে স্বেচ্ছায় অকপটে সেই কপট

কবুল করে অনুরোধ জানায় আমি যদি তার জন্তু সামান্য একটু
দোওয়া করি তবে সে মোকদ্দমাটা জিতে যায় !'

আমি বিশ্বয় মেনে বললুম, 'সে কি ?'

গ্লান হাসির ইঙ্গিত দিয়ে পীর বললেন, 'উকীল, বৈজ্ঞানিক আর পীরের
কাছে কোনো কিছু লুকোতে নেই, এই হলো এদের বিশ্বাস। বিশেষ
করে পীরের কাছে তো নয়ই। কারণ তিনি নাকি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে
মনের গোপন কথা দেখতে পান ! এক পীরসাহেব তো কোনো
মেয়েছেলেকে সামনে আসতে দিতেন না, কারণ তাঁর "আধ্যাত্মিক"
শ্রোণদৃষ্টি নাকি কাপড় জামা ভেদ করে সব-কিছু দেখতে পায় !'

আমি বললুম, 'ধাক !'

'আপনি তো জানেন, আমি পারতপক্ষে ভালোমন্দের বাচাই
করতে যাইনে। তবু শুনুন, সেদিন এক মারওয়াড়ি জৈন এসে
উপস্থিত। ওদিকে জৈন কিন্তু এদিকে করুণাময়ের করুণাতে তার
অশেষ বিশ্বাস। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ হলো।
বড় সরল, অকপট, সজ্জন। ইতিমধ্যে শহর-ইয়ার তাঁর জন্তু এক জাম-
বাটি লসসী পাঠিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা সে বারান্দায় আড়ালে
বসে শুনছিল। তার থেকে অনুমান করেছে, ইনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন
না, নইলে হিন্দু অভ্যাগতদের অনুমতি ভিন্ন সে কোনো খাবারের
জিনিস ওঁদের সামনে পেশ করে না। আর আপনি তো জানেন,
মেয়েটির দেহমনহৃদয় কতখানি সরলতা দিয়ে গড়া। সে মোহমুক্ত
বলে প্রায়ই ভুল করে ভাবে ইহসংসারের সবাই বুঝি তারই মত
সংসারমুক্ত।—শহর-ইয়ারের কথা কিন্তু পরে হবে। এবারে সেই
মারওয়াড়ি সজ্জনের কথা শুনুন।...লসসী সামনে আসতেই তাঁর
মুখ শুকিয়ে গেল। আমি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললুম, "না, না,
আপনাকে খেতে হবে না। আপনি হয়তো যত্রতত্র পানাহার
করেন না। সেটা তো কিছু মন্দ আচরণ নয়। আমিও তো বাড়ির
বাইরে কোথাও খাইনে।" তখন তিনি কি বললেন জানেন ? তিনি

নিরামিষাণী। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, লসুসী আবার আমিষ হয় কি প্রকারে? তিনি যা বললেন তার অর্থ একটা পশুর রক্তমাংস নিংড়ে যে নির্ধাস বেরয় সেটা সব চেয়ে কড়া আমিষ। তিনি খান—না, পান করেন সুদুমাত্র ডাবের জল। অল্প কোনো-কিছু খান না সুদুমাত্র ডাবের জল খেয়ে লোকটি গত পঁচিশ বৎসর ধরে বেঁচে আছে।’

আমি বললুম, ‘এ-ধরনের ডায়েটিং হয়, সে তো জানতুম না।’

পীর বললেন, ‘আপনি ভাবছেন, আমি পীর ব’নে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি বলে আমার আর-কিছু জানবার নেই, শেখবার নেই! হাজার দক্ষা ভুল! নিত্যনিত্য শিখছি। তার পর শুনুন, বাকিটা। হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোক ছুঁহাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর ছেলেটা জাহান্নমে গেছে। মদমাংস মেয়েমানুষ নিয়ে অষ্টপ্রহর মেতে আছে। বুরু ব্যাপারটা, সৈয়দ সাহেব। যে-লোক মাছমাংস, এমনকি ছুধ পষণ না খেয়ে অজ্ঞাতশত্রু হয়ে জীবনধারণ করতে চায়, তারই একমাত্র পুত্র হয়ে উঠেছে তার সব চেয়ে বড় শত্রু! তার পরিবারের শত্রু, তার বংশপরম্পরার ঐতিহ্যের শত্রু, পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্মের শত্রু

সর্বশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললে, “আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনে পাপ করেছিলুম, তার জন্তু আজ আমি এই শাস্তি পাচ্ছি। আপনি আমার ছেলের জন্তু দোওয়া করুন।”

বলুন তো, তার সঙ্গে তখন পূর্বজন্ম পরজন্ম আলোচনা করে কী লাভ! আর দোওয়া তো আমি সকলের জন্তুই করি, আপনিও করেন, কিন্তু, আমি কি মিরাকুল করতে পারি?’

তার পর পীর বেদনাপীড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘কেন লোকে বিশ্বাস করে, আমি অলৌকিক কর্ম করতে সক্ষম!’

পীরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন বলে আমাকে বাধ হয়ে সে-নীরবতা ভঙ্গ করতে হলো। বললুম, ‘আপনাকে এ-স’

ব্যাপারে আমার কিছু বলতে যাওয়া গোস্তাকি হবে। অপরাধ নেবেন না। তবু বলি, এ-সব লোক আসে আপনার কাছে ভক্তি-বিশ্বাসসহ। আপনি তাদের জন্তু দোওয়া-আশীর্বাদ করলেই তারা পরিতৃপ্ত হয়।’

পীর বললেন, ‘ঠিক। আমি তাই মারওয়াড়িকে বললুম, “আপনি শাস্ত হোন।” তারপর তাঁকে এই নামাজের ঘরে এনে দু’জনাতে একাসনে বসে আল্লার কাছে দোওয়া মাঙ্লুম।’

এর পর পীর একদম চুপ মেরে গেলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে শুধোতে হলো, ‘তার পর কি হলো?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ‘তার পর দীর্ঘ তিন মাস ধরে সে ভদ্রলোকেও আর দর্শন নেই।’

তারপর আমি শহর-ইয়ারের মুখে থবর পেলাম, ছেলেটি নাকি সংপথে ফিরে এসেছে, এবং সে-ভদ্রলোক আমাদের পাড়ার জরাজীর্ণ মসজিদটি নিদেন ত্রিশ হাজার টাকা খর্চা করে মেরামত করে দিয়েছেন। ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, হয়তো আমি মুসলমান বলেই।

আচ্ছা, এবারে বলুন তো, এর মধ্যে আমার কেয়ামতি—মিরাকুল কি?’

আমি আর কি বলি! কাকতালীয় হতে পারে, আল্লার অযাচিত অনুগ্রহ হতে পারে। কে জানে কি? আমি চুপ করে নিরুত্তর রইলুম।

পীরসাহেব তখন স্মিতহাস্য করে বললেন, ‘শহর-ইয়ার কিন্তু তখন কি মস্তব্য করেছিল জানেন?’

কিন্তু আমি অতশত নানাবিধ জিনিস আপনাকে বলছি কেন বলুন তো? ঐ সব শত শত হরের রকমের লোকের মাঝখানে এখানে এল শহর-ইয়ার।

কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করবেন তো, শহর-ইয়ার তখন কি মস্তব্য করেছিল?’

খানিকক্ষণ চুপ থেকে গীরসাহেব বললেন,

ভক্ত কবীরের কাছে কে কি চেয়েছিল, সে তো জানেন। আমি কবীর সাহেবের পদধূলি হবার মত যোগ্যতাও ধরিনে, তবু আমারই কাছে কারা কি চায়, তার ছই প্রান্তের ছাঁটি একস্ট্রীম উদাহরণ আপনাকে দিলুম।

আজ পর্যন্ত আমি যে-সব পীরদের আস্তানায় ঘুরেছি, এবং আমার এই ডেরাতে যারা আসে, এদের ভিতর এমন একজনও দেখি নি, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দিল্ নিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশ-কিছু লোক আসেন তথাকথিত 'শাস্ত্রালোচনা' করতে। সেও এক বিলাস, ক্যাশান। তা হোক। আল্লা পাক্ কার জন্তু কোন্ পথ স্থির করে দিয়েছেন, তার কী জানি আমি!

এরই মাঝখানে এল শহূর্-ইয়ার। এক মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কোনো কামনা নিয়ে আসে নি। বিশ্বাস করবেন না, সে আজ পর্যন্ত এক বারের মতও আমার সঙ্গে 'শাস্ত্রালোচনা' পর্যন্ত করে নি। এ যাবৎ একটি প্রশ্নমাত্রও শুধায় নি।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুধোলুম, 'সে কি?'

'হ্যাঁ। এটা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হতে পারে। সেটার সমাধান হলো, একদিন যখন শুনেতে পেলুম, শহূর্-ইয়ার কার যেন প্রশ্নের উত্তরে জনান্তিকে বলছে, সে এমন কিছু জিনিয়াস নয় যে উত্তর নতুন কোনো প্রশ্ন শুধাবে। সে নাকি অতিশয় সাধারণ মেয়ে। তার মনে অতিশয় সাধারণ প্রশ্নই জাগে। সেগুলো কেউ না কেউ আমাকে শুধাবেই। আমি উত্তর দেব। ব্যস, হয়ে গেল। কী দরকার ঔঁকে—অর্থাৎ আমাকে—বিরক্ত করে।'

আমি জিস্তেস করলুম, 'তা হলে সে আপনার শিষ্যা হলো কেন?'

পীরসাহেব একটু চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত হয়ে বললেন,

আমার কোনো শিষ্য শিষ্যা নেই। আমি কখনো মুর্শিদরূপে মস্ত্র দিয়ে কাউকে শিষ্য বা শিষ্যারূপে গ্রহণ করি নি !'

আমি হতভম্ব।

ইতিমধ্যে বিস্তর লোক পাশের ঘরে জমায়েৎ হয়েছে।

এবং সাক্ষ্য নামাজের আজান শোনা গেল।

পীর এবার এদের সঙ্গে নামাজ পড়বেন। তারপর শাস্ত্রালোচনা তত্ত্বালোচনা হবে হয়তো।

আমি হতভম্ব অবস্থাতেই বিদায় নিলুম।

আঠারো

যা জানতে চেয়েছিলুম তার কিছুই জানা হলো না ; কল্পনায় যে ছবি ঐকেছিলুম তার সঙ্গে বাস্তবের ফিঙ্গার প্রিন্ট একদম মিলল না । উণ্টে রহস্যটা আরো ঘনীভূত হলো । কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনো কিছুই খাপ খাচ্ছে না ।

আমি কলকাতা থেকে আকছারই ট্রেনে করে বোলপুর যাই । একবার বোলপুর স্টেশনে ঢোকান পূর্বে সব-কিছু কেমন যেন গোবলেট পাকিয়ে গেল । কই, এতক্ষণে তো অজয় ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়িটা গমগম করে পেরবে, তার পরে বাঁ দিকে পুকুর, ডানদিকে জরাজীর্ণ একটা দোতলা—কই সে-সব গেল কোথায় ? উণ্টে মাথার উপর দিয়ে ছশ করে একটা ওভারব্রিজ চলে গেল ! এটা আবার রাতারাতি কবে তৈরি হলো ! তখন হঠাৎ আমার হুঁশ হলো, এবারে আমি কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি না, আসছি ভাগলপুর থেকে । অর্থাৎ আমি স্টেশনে ঢুকছি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নয়, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে । সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্কিবাজি । উত্তর হয়ে গেল দক্ষিণ, পূর্ব হয়ে গেল পশ্চিম । বাইরের ছাদিকের দৃশ্য ফটাকটু ফিট করে গেল ।

তবে কি আমি শহর-ইয়ার রহস্যের দিকে এগুচ্ছিলাম উণ্টো দিক দিয়ে ? তবে কি আমার অবচেতন মন প্রতীক্ষা করছিল, পীর আমার দিক্-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে শহর-ইয়ার রহস্য অর্থাৎ তার আকস্মিক গুরু ধর্মের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ, সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঔদাস্য, ত্রিয়ামা বামিনী-ব্যাপী জপ-জিকর—এসব তার পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে ফিট করে যাবে, সর্ব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে ?

বরঞ্চ পীর যে সব ছুটি একটি তথ্য পরিবেশন করলেন সেগুলো যেন চকিতে চকিতে বিজলী আলো হয়ে চোখেতে আরো বেশী ধাঁধা লাগালো।

সিঁড়ি দিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে নামছি এমন সময় জানা-অজানায় লক্ষ্য করলুম, কালো নরুনপেড়ে শাড়ি-পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা নেমে যাচ্ছেন। মনে হলো হিন্দু বিধবা। আকর্ষণীয় রহস্যনির্মিত অবস্থায়ও আমার মনে রক্তিমর কৌতুক সঞ্চারণিত হয়ে মানসিক মুহূর্তস্থ বিকশিত হলো।...কে বলে, এদেশে হিন্দু মুসলমান সুন্দু ঝগড়া-ফসাদই করে! যান না, যে কোনো পীর-মুর্শিদ গুরু-গোসাইয়ের আস্তানায। হিন্দু-মুসলমান তো পাবেনই, তছপরি পাবেন গণ্ডাখানেক দিশী সাহেব, ছুঁচারটি খাস বিলিতি গোরা। তবে হ্যাঁ, কবিরাজ ওমর খৈয়াম বলেছেন, সর্ব ধর্মের সর্বোত্তম সম্মেলন পাবে শুঁড়িখানায়। সেখানে সব জাত, সব জাতি, সব ধর্ম সম্মিলিত হয়ে নিবিচারে একাসনে বসে পরমানন্দে মদিরাপাত্রে চুম্বন দেয়।*

কিন্তু ভুললে চলবে না, সুফী-ফকীর সাধুসন্তরা সাবধান করে দিয়েছেন, এ-স্থলে মদিরা প্রতীক মাত্র, সিম্বল্। মদিরা বলতে এ-স্থলে ভগবদ্প্রেম বোঝায়। তাইতো পীর গুরুর আস্তানায এত শত ছাপ্পান দেশের ইউনাইটেড নেশন, এবং তারো বাড়া, ইউনাইটেড রিলিজিয়ন ইউনাইটেড জাতবেজাতের সম্মেলন। এরা এখানে এসে জন্মগত পার্থিব সর্বপার্থক্য অগ্রাহ করে গুরুমুর্শিদ—যিনি সাকী—

* ইরানের এক গণ্যমান্য সন্তাকবি নাকি নিরুপ্তম শুঁড়িখানায় চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মণ্ডপান করছিলেন। নগরপাল মারফত খবরটা জানতে পেয়ে বাদশা নাকি অহুযোগ করিতে কবি একটি দোহা রচনা করেন।

“হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ঐ তারা।

গোপ্পদে হ'ল প্রতিবিস্তিত ; তাই হ'ল মানহারা ?”

শব্দম্, পৃ ১০।

তঁার হাত থেকে ভগবদ্‌প্রেমের পেয়ালা-ভরা শরাব তুলে নেয়।...
ধাক্কাগে এসব আত্মচিন্তা।

ততক্ষণে পেভমেন্টে নেমে গিয়েছি।

সামনে দেখি একটা বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান মর্দ—কেমন যেন
ঈষৎ চেনা-চেনা—একটা কালো মটর গাড়ির স্প্রিং-ভাঙা দরজাটা
নারকোলের সরু দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

আমার পাশে ততক্ষণে সেই বৃদ্ধা হিন্দু বিধবাটি এসে
দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সেই জোয়ান (মিলিটারি অর্থে নয়,
রুটার্থে) তাঁর দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার
চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই একে অঙ্কে চিনে ফেললুম।...বেশ
কয়েক বছর পর পুনর্মিলন।

এ তো আমার শ্বশুরবাড়ির ছাশের লোক। নাম, ভূতনাথ
খান। ‘খান’ পদবী মুসলমানের হলেও ওটা ওদের সম্পূর্ণ একচেটে
নয়। খান হিন্দুসন্তান।

‘তুমি এখানে?’ অবাক হয়েই শুধোলুম। খানকে আমি চিনি।
মহা পাষাণ। দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, পীর মুর্শিদের তো কথাই
ওঠে না।

‘আপনি এখানে?’ সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। কারণ
সে বিলক্ষণ জানতো আমি পীরটারের সন্ধান কখনো বেরুই না। খান
ঝাণ্ডু ছোকরা। তাই পুরো পাক্কা ‘তরুণ’, ‘মডার্ন’ হয়েও প্রাচীন
প্রবাদে বিশ্বাস করে, কাগে কাগের মাংস খায় না।

বৃদ্ধাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে সে তাঁকে মোটরের পিছনের সীটে
বসালো, কোনো প্রকারের প্রতিবাদ না শুনে আমাকে হিড়হিড়
করে টেনে নিয়ে সামনে বসালে। স্টার্ট দিতে দিতে পিছনের দিকে
ঘাড় ফিরিয়ে বললে, ‘ঠাকুমা, ঐকে তুমি কখনো দেখ নি, কিন্তু
চিনবে। তোমার ঐ শাজাদপুরের প্রতিবেশী মৌলবী বশীরুদ্দীনের
মেয়েকে বিয়ে করেছেন—’

বাকিটা কি বলেছিল আমার কানে আসে নি। বৃদ্ধা তাকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ‘চুপ কর্—’ বলে তাঁর কম্পিত শীর্ণ হস্ত আমার মস্তকে রেখে বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলেন। খানের সেই ভিণ্টেজকারের নানাবিধ কর্কশ কানকাটা কোলাহল ভেদ করে যে ক’টি শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছিল তার একটি বাক্য শুধু বুঝতে পারলুম, “আঃ! তুমি আমার বশীর ভাইসাহেবের মাইয়ারে বিয়া করছো।” বুড়ি একই কথা বার বার আউড়ে যেতে লাগলেন।

আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হলো, বুড়ির কাপড়ের খুঁটে আকবরী মোহর বাঁধা ছিল না বলে তিনি সাড়ম্বর জামাইয়ের মুখদর্শন কর্ম সমাধান করতে পারলেন না। বুড়ি পিছনের নীটে গুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়লেন। হায় দিদিমা, তুমি হয়তো এখন মনে মনে চিন্তা করছো, জামাইরে কি খাওয়াইমু!

আমি খানকে শুধালুম, ‘তুমি ঐ পীরের আস্তানায় জুটলে কি করে?’

খান তার সেলফ-মেড্ একটা সিগারেট আমার দিকে এঁগিয়ে ধরে বললে, না, আমার কোনো ইনট্রেস্ট নেই। ঠাকুরমাকে আপসে যাওয়ার সময় ড্রপ্ করে যাই, ফেরার সময় ছুই এক পেগ সঁ্যাট সঁ্যাট করে নামিয়ে, ঠিক মগরীবের নমাজের ওক্লে তাঁকে ফের পিক্ অপ্ করে নি—’

ঠাকুরমা যাতে শুনতে না পান তাই ফির্মাফিস করে শুধাঃম, ‘সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমি তো জানতুম, তোমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি আবার এই মুসলমান পীরের কাছে এলেন কি করে?’

খান বললে, ‘অতি সহজ এর উত্তর। তাঁর নাতনীর মারকত। সেই নাতনীর এক ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরমার পরিচয় হয়। মেয়েটা মুসলমান।’

‘ওরে বাব্বা!’

শিউরে উঠে ভূতনাথ খান বললে, 'অগ্নিশিখা, মশাই, অগ্নিশিখা ।
 'অগ্নিকুণ্ড বলতে পারেন । জহরতের অগ্নিকুণ্ড । যেখানে গণ্ডায়
 গণ্ডায় লেডি-কিলার ঝাপিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে পারে ! কিন্তু আজ
 পৰ্বস্তু কোনো নটবরই সে-অগ্নিকুণ্ডের কাছে যাবারও ইজাজৎ পান নি
 —ঝাঁপ দেওয়া দূরের কথা । লেডি-কিলার হিসেবে আশ্মো কম যাই
 নে, হেঁহেঁ হেঁহেঁ, কিন্তু ঐ মুসলমানীর দিকে এক নজর বুলোওই—
 সে তখন পীরসাহেবের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—গাড়ে হাড়ে
 টের পেয়ে গেলুম এ-রমণী ফাঁসুড়ে । তার একটিমাত্র চাউনি যেন
 অদৃশ্য একখানা রুমানে পরিবর্তিত হয়ে সাঁ করে উড়ে এনে লটবর-
 বাবুর গলাটিতে ফাঁস লাগিয়ে, জস্ট স্ট্রেণ্ডল্‌স্ হিম্ টু ডেথ. কিংবা
 বলতে পারেন, 'তার হী-ম্যান হবার প্ল্যানটি নশ্বাৎ করে দেয় !
 বাপ্‌স্ ।'

রঙ্গুরগে বর্ণনাটা শুনে আমার মনে কেমন যেন একটু কৌতূহল
 হলো । শুধালুম, 'নামটা জানো ?'

'দাডান, বলছি, স্মর । আরব্য উপন্যাসের কোন্ এক নায়িকা না
 নায়কের নাম । শহর-জাদী ? শহর-বানু ? হ্যাঁ, হ্যাঁ শহর-ইয়ার—'

আজ আমার বার বার স্তম্ভিত হবার অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক স্তম্ভে
 পরিণত হওয়ার পালা ।

শুনেছি, একদা নগরের একাংশ সহস্র স্তম্ভের (খাম্বার) উপর
 নির্মিত হয়েছিল বলে অগ্ণকার ক্যাম্ব্রে বন্দরকে গুজরাতিতে 'খাম্বাৎ'
 বলা হয়, প্রাচীন যুগে 'স্তম্ভপুরা' বলা হতো । দিল্লীবাসীর কাছে এ-
 শব্দতত্ত্ব কজুল । মেথাকার চৌবটিটি স্তম্ভের উপর খাড়া বলে
 আকবর বাদশার ছুধাপ আজীজ কোকলতাসের কবরকে 'চৌসট
 খাম্বা' বলা হয় ।

আজ আমি এতবার হেথাহোথা স্তম্ভে পরিণত হয়েছি যে
 আমার উপর দিয়ে অনায়াসে কলকাতার ওভার-হেড্‌ রেলওয়ে
 নির্মাণ করা যায় !

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ফের বকর বকর আরম্ভ করেছে। আমি ফের ফিসফিস করে বললুম, 'চুপ, চুপ। ঠাকুরমা শুনতে পাবেন। তুমি নিতান্ত অর্বাচীন; তাই জানো না, প্রাচীনারা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি মহৎ সদৃশ্য রপ্ত করে নেন সেটি হচ্ছে, যে-কথা তাঁরা শুনতে চান না, সেটা তাঁদের কানের কাছে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে শোনাতেও শোনে না, আর যেটি তাঁরা শুনতে চান সেটি তুমি বাঁশবনের কলমর্মরের ভিতর 'রাজার মাথায় শিং' গোছ গোপনে গোপনে বললেও তাঁরা দিব্য শুনতে পান। তাই তো তাঁরা দীর্ঘজীবী হন! আফটার্ অল, কানের ভিতর দিয়ে যে-সব কথা মরমে পৌঁছে তার চৌদ্দ আনাই তো ছু সংবাদ। অস্তত এ-যুগে।'

ভূতনাথ নিশ্চয়ই ভূতকালটা সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল। তছপরি সে 'বুখা-মাংস' খায় না, বুখা তর্ক করে না। গস্তীর কণ্ঠে বললে, 'সর্ব যুগেই, সত্যযুগেও।' পূর্বেই বলেছি, সে একটা আস্ত চার্বাক। আর আমার বন্ধুর জানা, প্রথম চার্বাক এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হন সত্য ও ত্রেতাযুগের মধ্যখানে। ভূতনাথ জাতিস্মর।

ঠাকুমা গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন।

খাইছে!

ঠাকুমা নিশ্চয়ই তাঁর ভাইয়া বশীরুদ্দীনের জগ্ন য়ে-ভাবে লুচি ভাজতেন সেইভাবে ভাজবার জগ্ন ভূতনাথের বউকে ফরমান ঝাড়বেন। তার বয়স ত্রিশ হয় কি না হয়। আমাদের পাড়ার চ্যাংড়া হীকু রায় বাজাবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সামনে বাজনা! তওবা, তওবা!

তা সে যাকুগে।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ আমাকে তার হাক-প্রাচীনপন্থী বৈঠকখানায় বসিয়ে ব্যাপারটি সংক্ষেপে সারলো :

‘আপনি ঠিক বলেছেন, আমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী
 এখনো স্বপাকে খান। আমাকে তাঁর হেঁশেলে ঢুকতে দেন না।
 ইংরিজিতে একটা শব্দ আছে—এমরাল। মরাল নয়, ইমরালও নয়।
 আমার ঠাকুরমা এলিবারেল। তিনি ধর্মবাবদে লিবারেল নন,
 ইলিবারেলও নন—তিনি এলিবারেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে
 হয়, কারণ ঐ শহর-ইয়ার বীবীর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে—
 অবশ্য সেটা অনেক অনেক পরের কথা।

উত্তরবঙ্গের কোন্ হিন্দু সর্ব মুসলমানের সংস্পর্শ বর্জন করে বাস
 করেছে কবে? তাই তিনিও মুসলমানদের কিছুটা চেনেন। যেমন
 আপনার মরহুম শঙ্কর সাহেবকে খুব ভালো ভাবেই চিনতেন।

কিন্তু আপন ধর্মচার তিনি করতেন—এখনো করেন—তাঁর মা
 শাশুড়ী যে-ভাবে করেছেন ছবছ সেইরূপ। অশ্রু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর
 কোনো কৌতূহল কখনো ছিল না—এখনো নেই এবং সেখানে পুনরায়
 আসেন ঐ শহর-ইয়ার বীবী। এমন কি এই হিন্দুধর্মেই যে—পূজা-
 আচার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে সে সম্বন্ধে ঠাকুরমা ছিলেন সম্পূর্ণ
 উদামীন। তাই বলছিলাম তিনি ধর্মবাবদে ছিলেন এলিবারেল।
 তিনি তো, আর-পাঁচটা ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফ্-হাল হয়ে সেগুলো
 রিজেক্ট করেন নি। সে হলে না হয় বলতুম, তিনি ইলিবারেল, কটর,
 কনজারভেটিভ। হাওয়ার ধাক্কায় যখন তেতলার আলসে থেকে
 ফুলের টব্ নিরীহ পদাতিকের কাঁধে পড়ে তাকে জখম করে তখন
 কি সে-টব্ চিন্তা করে এই কর্মটি করেছে? সে কি চিন্তা করে জানতে
 পেরেছে, উক্ত পদাতিক অতিশয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তি? অতএব ফুলের
 টব্-এর এ-কর্মটি এমরাল। ঠিক ঐ ভাবেই আমার ঠাকুরমার
 যাবতীয় চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি পূজা-আচ্চা সব, সব-কিছু ছিল
 এলিবারেল। ফুলের টব্-এর মতই তিনি ছিলেন অশ্রু পাঁচটা ধর্ম
 সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আনকনশাস,—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘ধাক্, তোমার এসব কচকচানি।

আমি জানতে চেয়েছিলুম, তোমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু ঠাকুমা ঐ মসলা পীরের মোকামে পৌঁছিলেন কি করে ?’

খান বড় সহিষ্ণু ব্যক্তি। বললে, ‘শ্বর, ঐ সময়ই নাট্যমঞ্চে শহর-ইয়ার বানুর অবতরণ। তাই আমি তার পটভূমি নির্মাণ করছিলুম মাত্র। এইবারে আসল মোদা কথায় পৌঁছে গিয়েছি। শুনুন।

দেশ-বিভাগের পর ঠাকুমাকে প্রায় দৈহিক বল প্রয়োগ করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তিনি তাঁর শশুরের ভিটে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ছাড়তে চান নি। এ-রকম বিস্তর কেস্ আপনি রেফুজি কলোনিগুলোতে পাবেন।

ঠাকুমার সঙ্গে দেশত্যাগ করে এসেছিল তাঁরই পিতৃকুলের সুদূর সম্পর্কের একটি অরক্ষণীয়া। রান্নাবান্না ধোয়ামোছার পরও আর-কিছু করবার নেই বলে সে কলেজ যেত। ঠাকুমা ব্রাহ্মণী, গ্যাচরলি আত্মীয় পালিতা কন্যাও ব্রাহ্মণী। কিন্তু, মোশয়, সে যে ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে প্রেমে পড়লো সে এক বড় সন্তান। তাকে বিয়ে করতে চায় !

ঠাকুমা তো শুনে রেগে কাঁই ! কী ! বড়ির সঙ্গে বামুন মেয়ের বিয়ে ! বরঞ্চ গোহত্যা করা যায়, গোমাংস ভক্ষণ করা যায়, কিন্তুক বামুনের সঙ্গে বড়ি ! বরঞ্চ ছুঁড়িটা ডোমচাড়াল, মুঁচমোচরমান বিয়ে করুক ! কারণ ঠাকুরমার মনঃসিন্দুক একটা আগুবাফা প্রায় গোপন তত্ত্বরূপে লুক্কায়িত আছে :

“একশ’ গোথারোর বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বড়ি তৈরি করেন।”

কিন্তু ঠাকুরমা জানতেন না যে, “একশ’ বড়ির বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বারেল্ড ব্রাহ্মণ তৈরি করেন।” আমরা বারেল্ড।’ ভূতনাথ তার হোমমেড্‌সিগরেটে আগুন ধরাবার জন্তু ক্ষণতরে চুপ করে গেল।

আমি গুনগুন করে বললুম, ‘এবং একশ’টি বারেল্ডের বিষ দিয়ে আল্লাতা’লা তৈরি করেন একটি সৈয়দ।’

খান আস্ত একটা চাণক্য। কিন্তু এ-নীতিটি জানতো না। খানিকক্ষণ এই নবীন তত্ত্বটির গভীর জলে খাবি খেয়ে খেয়ে বললে,

‘তাই বুঝি সৈয়দরা এত বিরল ?’

আমি বললুম, ‘চোপ্, তুমি যা বলছিলে, তাই বলো।’

খান তাবৎ বাক্য হজম করে নিয়ে বললে, ‘এ-হেন সময়ে, যে-নাটো ছিলেন সুদ্দুমাত্র ছুটি প্রাণী, ঠাকুমা এবং অরক্ষণীয়া, সেখানে প্রবেশ করলেন বীরপদভরে পৃথিবী প্রকম্পিতা করে একটি তৃতীয়া প্রাণী।

ভুল বললুম, স্মর, আমার মনে হলো যেন আমাদের সরু গলি দিয়ে ঢুকলো একটি জ্বলন্ত মশাল। অথচ অলিম্পিকের টর্চ-বেয়ারার নেই। সুদ্দুমাত্র মশালটাই যেন স্বাবলম্ব হয়ে, গলি পেরিয়ে, আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে, ঠাকুরমার ঘরে ঢুকলো।

সেই মশাল শহর-ইয়ার। আপনাকে বলি নি, অগ্নিশিখা ?’

আমি শুধালুম, ‘কেন এসেছিল ?’

‘আজ্ঞে—’

এমন সময় ঠাকুমা আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে পাথরের ধালা। খান ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত দিলে, এখন আর ও-কাহিনী বলা চলবে না।

উনিশ

এত দিনে বুঝতে পারলুম, শহূর্-ইয়ারকে আমি চিনি নি, চেনবার চেষ্টাও করি নি। কোনো মানুষকে দিনের পর দিন দেখলে, তার সঙ্গে কথা কইলেও তার একটা মাত্র দিক চেনা হয়। কারণ যার যে-রকম প্রবৃত্তি, সে সেই রকম ভাবেই অল্প জনকে গ্রহণ করে। শহূর্-ইয়ার মজ আমার মনের পাত্র যখন পূর্ণ করলো তখন সে শেপ্-নিল আমার মনের গেলাসেরই শেপ্। কিন্তু সেইটেই যে তার একমাত্র শেপ্-নয় সেটা আমি আনমনে ভুলে গিয়েছিলুম। এমন কি তার স্বামী, ডাক্তার তাকে কি শেপ্-এ নিয়েছে সেটাও আমি ভেবে দেখি নি। এবং সে-ই বা তার গড়া—অবশ্যই তার মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া শহূর্-ইয়ারকে যে শেপ্-দিয়েছে সে নিয়ে আমার সঙ্গে 'ডিপ্লোমেটিক ডিস্‌প্যাচ একশ্‌চেঞ্জ' করতে যাবে কেন ?

এইবারে একটি 'তৃতীয় পক্ষ' পেলুম যে শহূর্-ইয়ারকে দেখেছে, একটুখানি দূরের থেকে—এবং তাতে করেই পেয়েছিল বেস্ট্‌ পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌—এবং তারই ভাষায়, সেই 'অগ্নিশিখাকে' সাইজ্‌ অপ্‌ করতে গিয়ে একদম বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। আমিও মনে মনে বললুম অগ্নিশিখা তো তরল দ্রব্য নয় যে তাকে তোমার মনের পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে আপন শেপ্-দেবে !

ঠাকুমা চলে যেতেই ভূতনাথ দরজাতে ডবল খিল দিলে।

হেঁড়া কথায় খেই তুলে নিয়ে বললে, 'জ্যোপদী, মশাই, সাক্ষাৎ জ্যোপদী !'

আমি শুধালুম, 'জ্যোপদীর সঙ্গে তুলনা করছো কেন ?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন, স্মরণ, আপনিই তো হালে একখানা গবেষণাপূর্ণ রসরচনা ছেড়েছেন যাতে দেখিয়েছেন, এ-সংসারে একটি

প্রাণী, তাও-রমণী, কি করে পাঁচ পাঁচশ'টা মদ্দাকে তর্কযুদ্ধে চাটনি বানাতে পারে। সেই নারীই তো দ্রৌপদী। ছঃশাসন যখন তাঁকে জোর করে কুরুসভাস্থলে টেনে এনে হাজির করলো তখন তিনি যে স্বাধীনা, তাঁকে যে তাঁর অনিচ্ছায় প্রকাশ-সভাস্থলে টেনে আনা সম্পূর্ণ বে-আইনী, আজকের আদালতী ভাষায় যাকে বলে 'আলট্রা ভাইরীস,' তাঁর সেই বক্তব্য যখন তিনি অকাট্য যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে পেশ করতে লাগলেন, ভুল বললুম, পুশ্ করতে লাগলেন, সজোরে কড়া কড়া যুক্তিসহ—তখন কী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব, কী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাচারী দ্রোণাচার্য কেউ কি কোনো উত্তর দিতে পেরেছিলেন?...তার এক হাজার বছর পরে সোক্রাতেস—না? তারপর এ তাবৎ ব্লাস্কো! না—?

আমি অধৈর্ষ হয়ে বললুম, 'ধাক! তোমার কচকচানি খামাও। শহূ-ইয়ারের কথা কও!'

পূর্বেই বলেছি শ্রীমান ভূতনাথ রূপা তর্ক করে না। ঘাড় নেড়ে বললে, 'শহূ-ইয়ারের কথাই তাবৎ শহূরের ইয়ার—অথবা হঙগা উচিত।

ভেবে দেখুন, ঠাকুমা একা। শহূ-ইয়ার একাই একশ' দ্রৌপদী। ঠাকুমা পারবেন কেন? শহূ-ইয়ার কি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সে আমার জানা নেই, কারণ আমার কলিজাতে পূর্ব খোঁড়ার ভয় দেখালেও তখন আমি সে-সভাস্থলে যেতে রাজী হতুম না। ঠাকুমা একে মেয়েছেলে তরুণির বুদ্ধা। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু আমি মদ্দা। আমাকে ঐ দ্রৌপদী চাঁবয়ে গিলে ফেলত না—যদিশ্চাৎ তার মনে ক্ষণতরেও সন্দেহ হতো, আমি ঠাকুমার পক্ষ সমর্থন করতে এসেছি।'

আমি সত্যিই তাজ্জব মানলুম। শহূ-ইয়ারকে তো আমি চিনি, শাস্তা, স্নিঙ্কা কল্যাণীয়া রূপে। সে যে তর্কাজ্ঞানে রণরঞ্জিনী হয়ে তার রুদ্রাণী রূপ দেখাতে পারে সে কল্পনা তো আমি কখনো

করতে পারি নি।...তাই তো বলছিলুম, 'তৃতীয় পক্ষের' মতামত অবর্জনীয়।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ষাড় চুলকে চুলকে বললে, 'পরে আমার কানে কি একটা ঐতিহাসিক যুক্তিও এসেছিল। 'বেগম্ শহর-ইয়ার' যা বলেছিলেন তার মোদা নির্ধাস ছিল :

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ শ্রমণকে একাসনে বসিয়ে বার বার বলতেন, "ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ।"

তার বহু শত বৎসর পর, বৌদ্ধধর্ম যখন এদেশ থেকে লোপ পেল তখন সর্বশেষে, এই শ্রমণরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং হিন্দু ধর্মানুযায়ী বিবাহাদি করলেন। তাঁদেরই বর্তমান বংশধর বৈষ্ণবসম্প্রদায়। অতএব তাঁরা ব্রাহ্মণদেরই মত 'কুলসম্মান' ধারণ করেন। একদা তাঁরা শ্রমণরূপে লোকসেবার জ্ঞান আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতেন, হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁরা সেই বৈষ্ণ-বিষ্ণাই জীবিকারূপে গ্রহণ করলেন। তারপর—'

আমার কান তারপর ভূতনাথের আর কোনো কথাই গ্রহণ করে নি। কারণ আমার মন তখন 'বিশ্বয়বিমূঢ়'। আমি ভালো করেই জানতুম, শহর-ইয়ার ইহজন্মে কখনো কোনো প্রকারের গবেষণা করে নি।...এমন কি তার স্বামী যে মেডিকাল রিসার্চে আটচল্লিশ নিমজ্জিত সেটাও সে বোধহয় হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য সে এ যাবত ইতালির লেওনে কাএতানির স্ত্রীর মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি।

তবে কি তাবৎ সমস্তা এভাবে দেখতে হবে যে, কাএতানির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, আর শহর-ইয়ার স্বামীকে ত্যাগ না করে ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে!

ভূতনাথ বললে, 'সে বিয়ে তো নির্বিন্দে হলো। কিন্তু আমার মনে হয়, বীবি শহর-ইয়ার ঠাকুমাকে কাবু করেছিলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। "ব্যক্তিত্ব" বা পার্শ্বনলাটি বললে অল্পই

বলা হয়। বরঞ্চ ঐ যে আমি বললুম, “অগ্নিশিখা”—সেই অগ্নিশিখা যেন আগুনের পরশমণি হয়ে ঠাকুরমাকে—’

হঠাৎ ভূতনাথের ভাব পরিবর্তন হলো। আপন উৎসাহের আবেগ আতিশয্যের ভাটি গাঙে এতক্ষণ অবধি সে এমনই ভেসে চলেছিল যে শহর-ইয়ার সম্বন্ধে আমার কোঁতূহলটা কেন সে-সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন হয় নি। এখন যেন হঠাৎ তার কানে জ্বল গেল।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ঈষৎ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে—অবশ্য পরিপূর্ণ লালবাজারী ডবল ব্যারেল বন্দুকের ছ’নাল উঁচিয়ে নয়—জিজ্ঞেস করলে, ‘শ্বর, আপনি কি ওনাকে চেনেন?’

‘হ্যাঁ।’

বেচারী ভূতনাথ! অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, ‘মাক করবেন, শ্বর, প্লীজ। আপনার সামনে হুঁর সম্বন্ধে আমার এটা-ওটা বলাটা বডুই বেয়াদবী হয়ে গিয়েছে।’

আমি বললুম, ‘সে কি কথা! তুমি তো এখনো তার কোনো নিন্দে করো নি। এবং ভবিষ্যতে করবে বলেও তো মনে হয় না। এটাকে তো পরনিন্দা পরচর্চা বলা চলে না।...আর আমি জানতে চেয়েছিলুম বলেই তো তুমি আমাকে এ সব বললে। আর, এগুলো আমার কাজে লাগবে।’

যেন একটুখানি শঙ্কিত হয়ে খান শুধোলে, ‘এনি ট্রবল, শ্বর?’

আমি বললুম ‘ইয়েস্। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তুমি যা বলছিলে, বলে যাও।’

কথঞ্চিৎ শাস্তি পেয়ে ভূতনাথ বললে, ‘বলার মত তেমন আর বিশেষ কিছু নেই! পূর্বেই বলেছি, বিয়ে হয়ে গেল। চতুর্দিকে শাস্তি। শহর-ইয়ার ঠাকুমাকে দেখতে আসেন কি না তাও জানিনে।...ইতিমধ্যে ঠাকুমা যখন নিশ্চিন্দ মনে ওপারে যাবার জ্ঞান যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছেন তখন তাঁর জীবনসঙ্কায় এল একটা ছুঁর্ঘটনা। তাঁর এক পিঠাপিঠো ছোট ভাই বহু বৎসর ধরে

হিমালয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, 'ছ'তিন মাস অন্তর অন্তর দিদিকে পোস্টকার্ডও লিখতেন ।

হঠাৎ একদিন এক চিঠি এল সেই ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে —তিনিও তাঁর সঙ্গে হিমালয় পৰ্বতন করতেন । চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, মাস তিনেক ধরে সেই ভাইয়ের সন্ধান নেই ।

ঠাকুমার আদেশে আমাকেই যেতে হলো হিমালয়ে তাঁর খোঁজে । সে দীর্ঘ নিষ্ফল কাহিনী আপনাকে আর শোনাবো না । তিন মাস পর ঠাকুমার আদেশে কলকাতায় ফিরে এলুম ।

এসে দেখি, যা ভেবেছিলুম ঠিক তার উল্টো ।

ঠাকুমা শাস্ত প্রশাস্ত ।

আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম, ইতিমধ্যে ঐ শহর-ইয়ার বীবী নাকি ঠাকুমাকে কোন্ এক পীরের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি মনের শাস্তি পেয়েছেন । সে তো খুব ভালো কথা । দেহ মনের শাস্তিই তো সর্বপ্রধান কাম্য । কিন্তু আপনি জানেন, আমি এ সব গুরুপীর কর্তাভজ্ঞাদের একদম পছন্দ করিনে ।'

আমি বললুম, 'আমিও করি না ।'

ভূতনাথ বললে, 'কিন্তু অনুসন্ধান করে জানলুম, শহর-ইয়ার নাকি ঠাকুমাকে পীরের আস্তানায় নিয়ে যাবার পূর্বে পাকাপাকিভাবে বলেছে, "পীর সাহেব আপনার ভাইকে হিমালয় থেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসবেন না । কিন্তু আমি আশা রাখি, তিনি আপনাকে কিছুটা মনের শাস্তি এনে দিতে পারবেন—আল্লার কৃপায়" ।'

ভূতনাথ খান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাই তো এই মহিলার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা ।'

কুড়ি

কলকাতা মহানগরীর কোনো কোনো অঞ্চলে মধ্যরাত্রে যে নৈস্তুক্য উপভোগ করা যায় গ্রামাঞ্চলে সেটা অত্থানি সহজলভ্য নয়। যত্তুপি কবিরা ত্তিন্ন মত পোষণ করেন। জনপদবাসী দুপুর রাত্রে কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে জানে না। এ বাড়ি থেকে নিদ্রাহীন বৃদ্ধের কাশির শব্দ, ও বাড়ি থেকে চোর সস্থন্ধে মাত্ৰাধিক সচেতন মরাই-ভরা ধানের গেরেমভারী মালিকের গলার্থাকরি, চিকিৎসাভাবে কাতর জ্বরাত্তর শিশুর নিজ্জীব গোঙরানো এসব তো আছেই, তার উপর পশুপক্ষীর নানা রকমের শব্দ। তারা যেন মধ্য রাত্রে একাধিক শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত। অধচ বেশ লক্ষ্য করা যায়, এদের ত্তিতর তখন এক রকমের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা দেখা দেয়। হঠাৎ মোরগটা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ষেউ ষেউ করে উঠলো, ছাগলটা ম্যা ম্যা করলো, সর্বশেষে পাশের গোয়ালের গাইটা একটুখানি ষড়ষড় করলো,—খুব সম্ভব চেক্ অপ্ করে নিলো, অধুনা প্রসবিত তার বাছুরটি পাশ ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি তো!

একমাত্র ব্যত্যয় আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার'। সে ঐ ঐকতানে কস্মিনকালেও যোগ দেয় না, যদিও তার কঠই এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গ্রাস্তারী। সোজা বাঙলায়, গস্তীর অস্থরে যথা নাদে কাদস্থিনী! তার কারণে সে তার আচার আচরণে অনুকরণ করে আমাকে। আমি নীরব থাকলে সেও নিশ্চুপ। আমিও তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি—সর্বোপরি তারি ধৈর্ষ আর সহিষ্ণুতা। কিন্তু এ-নীলে সে আমাকে রোজই হার মানায়।

হঁ। ঠিক। শহর-ইয়ারকে আমি একটি আলসেশিয়ান-ছানা দগুগাং দেব।

হঠাৎ একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'হুজুর, মাফ করবেন। এই তো আমাদের বাড়ি।'

ওঃ হো! তাইতো। আমি এ-বাড়ি ছাড়িয়ে বেখেয়ালে কহঁ কহঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, কে জানে।

অর্থাৎ এই লোকটিকে মোতায়েন করা হয়েছে, আমি যদি রাত গাড়ে তেরটার সময় বাড়ির সামনে চকর খাই তখন সে যেন আমাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটাকে মোতায়েন করল কে? ডাক্তার? তার তো অতখানি কমন্স সেন্স নেই। শহর-ইয়ার? সে তো পীরের আস্তান থেকে ফেরে অনেক রাতে।

দীর্ঘ চহর পেরিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকলুম, তখন দেখি আরো দুটি লোক জেগে বসে আছে। স্পষ্টতঃ আমার-ই জগু। আমি লজ্জা পেলুম। তিন তিনটে লোককে এ-রকম গভীর রাত অবধি জাগিয়ে রাখা সতাই অস্বাভাবিক।

এ-পাপ আর বাড়ানো নয়। চুপিসারে আপন ঘরে ঢুকে অতিশয় মোলায়েমসে খাটে শুয়ে পড়বো। আলোটি পর্যন্ত জ্বালবো না। সুইচের ক্লিক-এ যদি ডাক্তার, শহর-ইয়ারের ঘুম ভেঙে যায়, আর আমার ঘরে হামলা করে!

এক কথায়, মাতাল যে-রকম গভীর রাতে বাড়ি ফেরে।

অতিশয় সন্তর্পণে দরজার হাণ্ডিলটি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে আমি অবাক! ঘর আলোর আলোময়। আমার খাটের পৈধানের কাছে যে কেদারা তার উপর বসে আছে শহর-ইয়ার!

কিছু বলার পূর্বেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি আমাকে আর কত সাজা দেবেন?'

আমার মুখে কোনো উত্তর জোগালো না। কিসের সাজা? ওকে দেব আমি সাজা। ওর মত আমার আপন জন এ-দেশে আর কে আছে!

এ-স্থলে সাধারণজন যা বলে, তাই বললুম, 'বসো !'

কিন্তু শহুর্-ইয়ার যেন লড়াইয়ে নেমেছে।

তার চেহারা দেখে কেচ্ছা-সাহিত্যের ছুটি লাইন আমার মনে পড়ল :

রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরান।

নাকের শোওয়াস যেন বৈশাখী তুফান ॥'

কিন্তু আমি কোনো মতামত প্রকাশ করার পূর্বেই সে বললে 'আমি খুব ভালো করেই জানি, কলকাতার রাস্তাঘাট আপনি একদম চেনেন না। ওদিকে গাড়ি-ড্রাইভার দিলেন ছেড়ে। এদিকে রাত একটা। তখন কার মনে ছুঁচিন্তা হয় না, বলুন তো।'

এ-সব অভিযোগ সত্ত্বেও আমার হৃদয় বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছে কারণ, এতক্ষণে আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কার রাত্রে, আজ সকালে তার চোখে অর্ধসুপ্ত, আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন যে-ভাবট ছিল সেটা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। সেই প্রাচীন দিনের শহুর্-ইয়ারের অনেকখানি—সবখানি না—যেন ফিরে এসেছে। এর কারণটা কি তখনো বুঝতে পারি নি। পরে পেরেছিলুম। সে-কথা আরো পরে হবে। কিন্তু উপস্থিত তার এই অবস্থা পরিবর্তনের পুরোপুরি ফায়দাট ওঠাতে হবে।

আমি গোবেচারী সেজে বললুম, 'তা তো বটেই। আমি কলকাতার রাস্তাঘাট চিনিনে সে তো ন'সিকে সত্য কথা। এঁ তো, আজ সন্ধ্যায়ই, আমি ট্যাক্সি ধরে গেলুম ধর্মতলা আর চৌরঙ্গী ক্রসিং-এ। আমি জানতুম, সেখানে ঠনঠনের কিংবা কালীঘাটে মা-কালীর মন্দির। ও মা! কোথায় কি! সেখানে দেখি টিপ্প মূলতানের মসজিদ। কি আর করি। ওজু করে ছ'রেকাৎ নফল নমাজ পড়ে নিলুম। তারপর বেরলুম দক্ষিণেশ্বর বাগে। সেখানে তো জানতুম, মৌলা আলীর দরগা—'

এতক্ষণে শহুর্-ইয়ারের ধৈর্যচ্যুতি হলো।

তবু, প্রাচীন দিনের শাস্ত্র কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আপনাদের কল্পনাশক্তি সাধারণজনের চেয়ে অনেক বেশী, ভাষা আপনাদের আয়ত্তে, স্টাইল আপনাদের দখলে। সেই ক্ষমতা নিয়ে আপনারা অনেক-কিছু করতে পারেন—লোকে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আপনি সে-সব শস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? সেটা কি উচিত? আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? আমরা—'

প্রাচীন দিনের শহুর-ইয়ার যেন নবীন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমি তারই সুযোগ নিয়ে মস্তব্য করলুম, 'বড় খাঁটি কথা বলেছ, শহুর-ইয়ার। এ-কর্ম বড়ই অসুচিত।...আমি তোমারই পক্ষে একটি উদাহরণ দি :—

আমাদের শাস্ত্রনিকেতনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। তার জন্তে কে দায়ী আমি সঠিক জানিনে। হয় জনৈক অধ্যাপক, নয় ছাত্ররা। তখন শাস্ত্রনিকেতনবাসী জনৈক প্রখ্যাত লেখক ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর কঠিন মস্তব্যপূর্ণ পত্র খবরের কাগজে প্রকাশ করেন।...তুমি এখুনি যা বললে, তারই স্বপক্ষে আমি এ-ঘটনাটার উল্লেখ করছি।...তখন ছাত্ররা করে কি? সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের শাণ্ডে তরবারীর বিরুদ্ধে লড়াই যাবে কে? তারা ফোর্থ-ইয়ার ফিফথ-ইয়ারের ছাত্র। তাদের ভিতর তো কেউ সাহিত্যিক নয়।...সিংহ লড়াইবে সিংহের সঙ্গে, বাঁদর—'

আমি থেমে গেলুম। কিন্তু শহুর-ইয়ার চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আমি আন্তে আন্তে আপন মনে বুঝে গিয়েছি, শহুর-ইয়ার কেন আপন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।

অবশ্য নিঃসন্দেহ, নিঃসন্দেহ কোনো-কিছু বলা কঠিন।

সে ভয় করেছিল, তার পীরেতে আমাতে লাগবে লড়াই।

ফলে সে হারাবে পীরকে, নয় আমাকে।

এই দ্বন্দ্বের সামনে পড়ে কাল সন্ধ্যায় সে ডুব মেরেছিল ধ্যানের

গভীরে। সেই ধ্যানের পথ সুগম করার জন্তু অনেকেই বহুক্ষণ ধরে জপ-জিক্রু করেন। শহূ-ইয়ার তাই কাল রাতে 'লতীফ, 'সুন্দরের' নাম জপ করেছিল। শুনেছি, বহু গোড়ীয় বৈষ্ণব সাধক জপ করতে করতে 'দশা' (আরবীতে 'হাল') প্রাপ্ত হন।

এ-নিযে তো দিনের পর দিন আলোচনা করা যায়, এবং আমি কিছুটা করেছিও, শহূ-ইয়ারের পীরের সঙ্গে বরদায়। কিন্তু এ-সব করে আমার কি লাভ? আমি চাই শহূ-ইয়ারের মঙ্গল, ডাক্তারের মঙ্গল এবং আমরা তিনজন এতদিন যে-পথ ধরে চলেছি—সুখেহুখে হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে—সে-পথ দিয়েই যেন চলতে পারি। এর মধ্যে একজন ছিটকে পড়ে যদি স্বয়ং পরব্রহ্মকেও পেয়ে যায় তাতে ডাক্তারের কি লাভ, আমারই বা কি লাভ? বুদ্ধদেব বৈরাগ্য আর সন্ন্যাস দিয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন; কিন্তু সে ধন কি পিতা তথা রাজা শুদ্ধোদনকে আনন্দ দান করতে পেরেছিল? তিনি তো কামনা করেছিলেন, পুত্র যেন যুবরাজরূপে দিগ্বিজয় করে। এবং গোপা-যশোধরা? তিনিও তো চেয়েছিলেন, একদিন রাজমহিষী হবেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ রাহুলের রাজমাতা হবেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম :

পীরেতে আমাতে কোনো ঝগড়া-কাজিয়া তো হলোই না, বরঞ্চ প্রকাশ পেল, দুজনকার বহুদিনের হুছতা। শহূ-ইয়ারের যেন একটা হুঃস্বপ্ন কেটে গেল, তার যেন দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।

* * *

হঠাৎ না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললুম, 'আচ্ছা, শহূ-ইয়ার, এখন রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তোমাকে আনন্দ দেয়?' 'এখন' শব্দটাতে বেশ জোর দিলুম। 'আগে তো তুমি পছন্দ করতে না।'

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না।'

আমি বললুম, 'সে কি? এখন তুমি যে-পথে চলেছ সেখানে তো

তার ধর্মসঙ্গীত তোমাকে অনেক-কিছু দিতে পারে, তোমার একটা অবলম্বন হতে পারে ।’

মাথা নিচু করে বললে, ‘হলো না । কাল ছুপুরেই—আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না—আবার কিছু রেকর্ড বাজালুম । অস্বীকার করছিলেন, খুব সুন্দর লাগল । ভাষা, ছন্দ, মিল সবই সুন্দর । এমন কি আল্লাকে নূতন নূতন রূপে দেখা, নূতন নূতন পন্থায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সবই বড় সুন্দর । আমার মন যে কত বার নেচে উঠেছিল, সে আর কী বলবো !...কিন্তু, কিন্তু, আমার বুকের ভিতরে কোনো সাড়া জাগলো না ।’

আমি বললুম, ‘আমার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে । বুঝিয়ে বলো ।’

এবারে একটুখানি মধুরে উচ্চহাস্য করলো—‘আপনাকেও বোঝাতে হবে ?’

উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল ।

আহ্ । বাইরে কী নিরঙ্ক নৈস্ক্য্য । গ্রামে নয়, কলকাতাতেই এটা সম্ভবে ।

বন্ধ জানলা খুলে দিলে বাইরের বাতাস যে রকম কামরাটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়, ছবছ সেই রকম বাইরের নিস্তরতা যেন আমাদের তর্কালোচনাটাকে শীতল করে দিল ।

শহুর-ইয়ার বললে, ‘জানলার কাছে আসুন । আরাম পাবেন !’

আমি শয্যা ত্যাগ করে সেই প্রশস্ত জানলার অগ্ন প্রান্তে দাঁড়ালুম ।

শহুর-ইয়ার ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো । আমার ছু’হাত তখন জানলার আড়ের উপর । সে তার ডান হাত আমার বাঁ হাতে বুলোতে বুলোতে বলল, ‘এই নিচের আঙিনার দিকে তাকান । এখানে ভোর-সাঁঝ ভিথিরি-আতুর আসে । তাদের জঙ্গ ব্যবস্থা আছে এ-বাড়ি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই । কিন্তু এ-আঙিনায়

সব চেয়ে বেশী আদরযত্ন করা পায় জানেন ? খঞ্জনি-হাতে বোষ্টমি, একতারা-হাতে বাউল, সারেসঙ্গী-হাতে ক্ষকীর। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরা সদাই শুধু আধ্যাত্মিক পরলৌকিক, 'এ-সংসার নখর', এই সব নিয়েই গীত গায়—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'মোটাই না, এরা বহু ধরনের গীত জানে।'

ভারী খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছেন। অবশ্য আমি ভালো করেই জানতুম, আপনার কাছে এ-তত্ত্ব অজানা নয়। তাই আপনাকে একটুখানি খুঁচিয়ে আমি সুখ পাই। কিন্তু সে-কথা থাকুক।

আমার বিয়ের রাতে, গভীর রাতে, এই আঙিনাতেই তারা অনেক মধুর মধুর গান আমাকে ডাক্তারকে শুনিয়ে গিয়েছিল। তারই একটি ছত্র আমার কানে এখনো বাজে :

“শ্যামলীয়াকে দরশন লাগি পরহু” কুমুদী সাজী”

বুঝুন, কী অদ্ভুত কালার-কনট্রাস্ট-দেন্স। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামল। তাই শ্রীরাধা তাঁর শ্যামবর্ণের কনট্রাস্ট করার জন্ত হলেদে রঙের—কুমুদী রঙের শাড়ি পরে অভিসারে বেরিয়েছেন।

কিন্তু মোদা কথাটা এইবারে আপনাকে বলি।

আমি সেই বিয়ের রাত্রির পর থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে শতসহস্র বার এদের গীত—বিশেষ করে ধর্মসংগীত শুনেছি। বরঞ্চ এদের এই সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব অলঙ্কার বিবর্জিত ভক্তিগীতি মাঝে মাঝে আমার বুকে সাড়া জাগিয়েছে, এমন কি তুফান তুলেছে,—মনে হঠাৎ-চমক লাগায় নি শুধু। তার কারণ, অস্তুত আমার মনে হয়, এদের অভাবের অস্ত নেই, এরা গরীব-ছঃখী অনাথ-আতুর। খুদাতালা ছাড়া এদের অস্ত কোনো গতি নেই। তাই এদের গীতে থাকে আন্তরিকতা, ডীপেস্ট সিনসিয়ারিটি।

কিন্তু বিশ্বকবি, আবাব বলছি, সর্ববিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ তো এই হতভাগাদের একজন নন। তিনি তো অনাথ আতুর নন। তাঁর

ভক্তিগীতিতে ওদের মর্মান্তিক ঐকান্তিকতা, সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের মূর বাজবে কি করে ? তিনি—'

আর আমি থাকতে পারলুম না। বাধা দিয়ে বললুম, 'এ তুমি কী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে শহূর্-ইয়ার! অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব—এইগুলোই বুঝি ইহজীবনের পরম দুর্দৈব, চরম বিনষ্টি ? রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ হতে না হতেই তাঁর যুবতী স্ত্রীর মৃত্যু হলো, তার পাঁচ বছরের ভিতর গেল তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের বয়স তখন কত ? এগারো, তেরো। অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় অকাল মৃত্যু। তাঁর বাল্য কৈশোরের কথা তুলতে চাইনে। সেই বা কিছুর কম ? ছেলেবেলায়ই ওপারে গেলেন তাঁর মা। সেই মায়ের আসন নিলেন তাঁর বৌদি। শুধু তাই নয়, সেই মাহয়সী নারীই কিশোর রবিকে হাতে ধরে নিয়ে এসে প্রবেশ করালেন জহান-মুশায়েরায়, বিশ্বকবিসম্মেলনাদানে।...আজ যদি আমাকে কেউ শুধায়, রবীন্দ্রনাথ কার কাছে সব চেয়ে বেশী খণী, তবে নিশ্চয়ই বলবো, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবো তার চেয়েও বেশী খণী তিনি তাঁর বৌদির কাছে।...সেই বৌদি আত্মহত্যা করলেন একদিন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কত ? বাইশ, তেইশ ? এই নারীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শিকা। তাঁর রুচি, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন তাঁর জীবনের প্রথম বারো বৎসর ধরে।

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব সব মানি। কিন্তু আবার শুধোই, এগুলোই কি শেষ কথা ? আত্মহত্যা, পর পর আত্মজনবিয়োগ এগুলো কিছুরই নয় ?

এই যে তুমি বার বার “অনাথ আতুর, অনাথ আতুর” বলছো, সেই সমাসটি তুমি কোথেকে নিয়েছ, জানো ? তোমার জানা-অজ্ঞাস্তে ?

সেও রবীন্দ্রনাথের !

“শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—

এসেছে তোমার দ্বারে, শূণ্য ফেরে না যেন ॥”

এ-গীতে কি রবীন্দ্রনাথ বিধাতার প্রধান মন্ত্রী?—তিনি যে হুজুরকে বলছেন, “মহারাজ, এই অনাথ আতুর জনকে অবহেলন করবেন না।” তিনি তখন স্বয়ং, নিজে, ঐ অনাথ আতুরদের একজন অবশ্য তাঁর অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রভু খৃষ্ট কি সর্বাপেক্ষা সার সত্য বলেন নি, মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না। ঈশ্বরের করুণা (ওয়ার্ড) তাঁর প্রধানতম আশ্রয়।

আর এও তুমি ভালো করে জানো, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অর্ধ-জীবন—১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ভিক্ষার বুলি কাঁধে নিয়ে বিশ্বম ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বিশ্বভিখারীদের তিনি ছিলেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন নম্বর ওয়ান। পৃথিবীর হেন প্রান্ত নেই যেখানে তাঁর ভিক্ষা করতে যান নি। তাঁর পূর্বে স্বামীজী। এবং দুজনা ফিরেছিলেন, ঐ গানের “শূণ্য ফেরে না যেন” প্রার্থনায় নিঃফল হয়ে

রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জন্ত। তিনি “বিশ্বপ্রেম “বিশ্বভারতী”—“বিশ্ব” শব্দ দিয়ে একাধিক সমাস নির্মাণ করেছেন আমি, অধম, তাঁরই সমাস নির্মাণের অনুকরণে তাঁকে খেতাব দিয়ে “বিশ্বভিক্ষুক”। এ হুক আমার কিছুটা আছে। রবীন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধি ঠাকুর। কিন্তু তাঁর বংশপরিচয় “পীরিলি” “পীর” + “আলী” দিয়ে। আশ্মো “আলী”। আমারও “পীর বংশ। কিন্তু থাক, এসব হাঙ্কা কথা।

তুমি হয়তো বলবে—তুমি কেন, অনেকেই বলবে—এসব শব্দে ভিত্তিরিগরি। আমি এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করতে চাইনে। কা স্ময়ং কবিই গেয়েছেন,

“এরে ভিখারী সাজায়ে

কী রঙ্গ তুমি করিলে,

হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥”

কিন্তু এহ বাহ।

আমি বার বার জোর দিতে চাই তাঁর মাথার উপর দিয়ে যে
মাঝহত্যা, যে-সব অকালমৃত্যুর ঝড় বয়ে গেল, তারই উপর।
সখানে তিনি অনাথের চেয়েও অনাথ, আতুরের চেয়ে আতুর।’

শহর-ইয়ার বড় শান্ত মেয়ে। কোনো আপত্তি জানালো না
দখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। বললুম, ‘আচ্ছা, রাশার সম্রাট
নার নিকলাসের নাম শুনেছ?’

‘না তো।’

‘কিছু এসে যায় না। এইটুকু যথেষ্ট যে তাঁর কোনো অভাব
ছিল না। ইয়োরোপের রাজা-সম্রাটদের ভিতর তিনিই ছিলেন
বচেয়ে বিস্ত্রশালী। দোদগু প্রতাপ। তাঁরই রচিত একটি কবিতার
শেষ দুটি লাইন আমার মনে পড়ছে, আবছা আবছা। ভুল করলে
অপরাধ নিয়ো না। সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

“কাতরে কাটাই

সারা দিনমান

কাঁদিয়া কাটাই নিশা।

সহি, দহি, ডাকি

ভগবানে আমি

শাস্তির নাহি দিশা ॥”

এর চেয়ে আন্তরিকতা ভরা, হৃদয়ের গভীরতম গুহা থেকে
উচ্ছ্বসিত কাতরতা ভরা আর্তরব তুমি কি চাও ?

না হয় রাশার জার-এর কথা থাক।

কুরান শরীফ এবং এদিক ওদিক নানা কেতাবে রাজা দাউদের—
King David-এর কাহিনী নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছ ? ইনি শুধু
প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহুই ছিলেন না, তিনি বাইবেল কুরান উভয়
কর্তৃক স্বীকৃত পয়গম্বর।

ভগবৎ-বিরহে কাতর এই রাজার Psalms বাইবেলে পড়েছ ?

“কতদিন ধরে, এমন করিয়া
ভুলিয়া রহিবে প্রভু ?”

“Why standest thou afar off, O Lord ? why hidest
thou thyself in times of trouble ?”

আরো শুনবে ?’

শহূর্-ইয়ার মাথা না তুলেই বললে, ‘আমার একটা কথা
আছে—’

আমি বললুম, ‘অনেক রাত হয়েছে। কাল সে-সব হবে।’

তারপর ছাড়লুম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ অগ্নিবাণ :

‘তোমারও তো ধনদৌলতের কোনো অভাব নেই। তবে তুমি
কেন সকাল-সন্ধ্যা ছুটছে। পীর সাহেবের বাড়িতে ? ভেবে চিন্তে
কাল বুঝিয়ে বলো।’

একুশ

কি একটা স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্ন কি, তার অর্থ কি, সে ভবিষ্যদ্বাণী করে কি না, এসব বাবদে এখনো মানুষ কিছুই জানে না। অনেক গুণী-জ্ঞানী অবশ্য অনেক-কিছু বলেছেন। আঁরি বের্গসন্ থেকে ফ্রয়েট সাহেব পর্যন্ত। পড়ে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি—অস্তুত আমার।

তবে এ-বাবদে একটি সাত বছরের ছেলে যা বলেছিল সেটা সব পাণ্ডিত্যে হার মানায়। অস্তুত, স্বপ্ন জিনিসটা কি, সে-সম্বন্ধে তার গাপন বর্ণনা। ডাক্তার তাকে শুণিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন দেখে কি না? পুট্ করে উত্তর দিল, 'ও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিনেমা দেখা? না?'

বেশ উত্তর। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। আমি এর থেকে একটা তত্ত্বও আবিষ্কার করেছি—কারণ একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ বলেছেন, স্বর্গরাজ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার শিশুদের। সেই তত্ত্বটি সূত্ররূপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়: আজকের দিনের বাঙলা ফিল্ম দেখে যেমন আসছে বছরে বাঙলার ভবিষ্যৎ কি হবে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, ঠিক তেমনি আজ রাতে আমি যা স্বপ্ন দেখলুম, তার থেকে তিন মাস পরে আমার কি হবে, সে-হদাঁস খোঁজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।...তার চেয়ে অনেক নিরাপদ, তাস ফেলে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী কার্য করা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, অচেনা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপের সংখ্যা জোড় না বেজোড়, গুণে গুণে সেটা বের করে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করা। জোড় হলে মোলায়েম কায়দায় কাজ হাসিল করার চেষ্টা—বেজোড় হলে লোকটার মাথায় সুপুঁরি রেখে খড়ম পেটানোর মত শাসন-চাঁকৎসায়।

কিন্তু আমি স্বপ্নটা দেখেছিলুম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে।

সেই বাচ্চাটার মত সিনেমা দেখি নি। আমার ফিল্মটা যেন 'যান্ত্রিক গোলযোগে' (অবশ্য তার জন্ম 'প্রোগ্রাম' শেষ মরমিয়া ভগ্নস্বরে কেউ ক্ষমা চায় নি) কেটে যায়। কিন্তু সিনেমার বাক্যজ্ঞটি বিকল হয় নি। সে যেন সাথীহারী বিধবার মত একই রোদন বার বার কেঁদে যাচ্ছিল : 'সবই বৃথা, সবই মিথ্যা, সবই বৃথা, সবই মিথ্যা।'...বোধহয় ফিল্মটা বাইবেলের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে তার রূপ বাণী পেয়েছিল। কারণ, তারই সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজিতে ঠিক ঐ একই সন্তাপ কানে আসছিল, 'ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিজ ; অল্ ইজ্ ভ্যানিটি।' যেন বৌদ্ধদের সেই 'সর্বং শূণ্যং, সর্বং ক্ষণিকম্।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে নী আশ্চর্য ! বহু, বহু বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতের 'অরুণাচলে' শোনা একটি সংস্কৃত মন্ত্র কানে আসছিল :

'কতু'রাদ্ভয়া
প্রাপাতে ফলম্'
কর্ম কিং পরং
কর্ম তজ্জড়ম্ ॥'

এর বাঙলা অনুবাদ আমার এমনই সুপরিচিত যে, স্বপ্নশেষে সেটিও আমার স্মৃতিপটে ধরা দিল :

'ঈশ্বরাজ্জাধীন কর্ম ফলপ্রসূ হয়।
জড় কর্ম সেই হেতু ঈশ বাচ্য নয় ॥'

অর্থাৎ কর্ম জিনিসটাই জড়।...ঐ একই কথা—তুমি যে ভাবছো, তোমার যে 'অহংকার', তুমি কর্ম করছো এবং সেই কর্ম থেকে ফল প্রসবিত হচ্ছে সেটা সর্বের মিথ্যা, সেটা ভ্যানিটি ('অহংকার')।

বলতে পারবো না, কটা ভাষাতে, গড়ে পড়ে, গড়ে পড়ে মেশানো ভাষায়, কত সুরে এই ফিলার্মনিক্ অর্কেস্ট্রা চলেছিল।

কিন্তু তখনো স্বপ্ন শেষ হয় নি।

শেষ হলো সেই অরুণাচলমের আরেকটি শ্লোক দিয়ে :

‘ঈশ্বরার্পিতং

নেচ্ছয়া কৃতম্ ।

চিন্তাশোধকং

মুক্তিসাধকম্ ॥’

পাঁজরে যেন গুস্তা খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম ।

স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশে আমি বিশ্বাস করিনে ! কিন্তু এবারে আমার ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে আস্ত একটা ট্রাকের চল্লিশ মণ ইট যে-ভাবে পড়লো তাতে অত্যন্ত বিমূঢ় অবস্থায়ও আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, আমার কর্ম দ্বারা কোনো-কিছুরই সমাধান হবে না, শহূর্-ইয়ার, ডাক্তার, পীর সাহেব—এদের জট ছাড়ানো আমার ‘কর্ম’ নয়, আমার ‘কর্ম’ ‘ঈশ্বর-অর্পিত’ নয় ।

অতএব এ-পুরী থেকে পলায়নই প্রশস্ততম পন্থা ।

*

*

*

তখনো ফজরের নামাজের আজান পড়ে নি । চন্দ্র অস্তে নেমেছে, কিন্তু তখনো রাত রয়েছে । পূর্ব দিকের অলস নয়নে তখনো রক্তভাতি ফুটে ওঠে নি ।

প্রথম একটা চিরকুট লিখলুম । তার পর হাতের কাছে যা পড়ে, নুন ময়লা ধূতি কুর্তা পরে, গরীবের যা রেশ তাই পকেটে পুরে চৌর এবং অভিসারিকার সম্মিলিত নিঃশব্দ চরণক্ষেপে নিচের তলার সদর দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা খোলা । আল্লা মেহেরবান্ । তখন দেখি, বুদ্ধ দারওয়ান শূন্য বদনা দোলাতে দোলাতে দরজা দিয়ে ঢুকছে । পরিষ্কার বোঝা গেল, বুদ্ধ ফজরের নামাজের পূর্বকাল তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে ।

মনে পড়ল, বছ বছ বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে, ‘নূতন বাড়িতে’ কয়েক মাসের জন্ম আমার আশ্রয় জুটেছিল । তখন অনিচ্ছাকাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাভ্যাগ

করে আমলকী গাছের তলায় পায়চারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাশ্র হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধু'র কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রাণ্ণে স্নানাদি সমাপন করে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকেও আমি শাস্তিনিকেতনের অশ্রু প্রাপ্তে ঐ একই আচার-নিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট; বড়বাবুর একাশি।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। কিন্তু এসব প্রাচীন দিনের কাহিনী বলার লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন। অনেকে আবার শুনতেও চায় যে।

* * *

ঘটিদের একটা মহৎ গুণ, তারা অহেতুক কোঁতুহল দেখায় না। যদিও আড়ালে আবড়ালে বসে তাকে তাকে থেকে আপনার হাঁড়ির খবর, পেটের খবর, যে সাদামাটা পোটকোলিও নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, বেরুলেন তার ভিতরকার খবর সব জেনে নেয়। আর বাঙালরা এ-বাবদে বুদ্ধু। বেমক্লা প্রশ্ন করে অশ্রু পক্ষকে সন্দিহান করে তোলে। ঘটি তখ্খুনি জিভে কানে ক্লরকর্ম টেলে, ঠোঁট ছুটো স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়ে সঁটে নিয়ে চড়চড় করে কেটে পড়ে।

তছপরি এ-বুদ্ধ দারওয়ান এ-বাড়ির অনেক-কিছুই দেখেছে। বেশীর ভাগই ছুংখের। যে-বাড়ি একদা গমগম করতো, সে এখন কোথায় এসে ঠেকেছে! ভুতুড়ে বাড়ি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সে জানে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে-সব উত্তর শুনতে হয়, তার অধিকাংশই অপ্রিয়।

আমি তার দিকে চিরকুটটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'সাহব, বেগম-সাহবকো দেনা।' 'খুদা-হাফিজ' 'অভী আয়া' (সেটা হবে মিথ্যে)

এ-সব তো বললুমই না ; বখশিশ্ দিলে তো এক মুহূর্তেই সর্ব
হামুফাজ ভঙুল হয়ে যাবে ।

চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমি বোলপুর চললুম ; সময়মত আবার
আসবো ।'

'যঃ পলায়তি স জীবতি ।' আমি শ্লেচ্ছ, দেব-ভাষা জানিনে ।
স জীবতি' না হয়ে 'যুবতী'ও হতে পারে । সতীত্ব রক্ষা করতে হলে
যুবতীকে পলায়ন করতে হয় বই কি !

*

*

*

প্রথম হাওড়াগামী ট্রামের জগ্রে মনে মনে অপেক্ষা করতে করতে
কদম কদম বাড়িয়ে হাওড়াবাগে এগিয়ে চললাম ।

ট্রাম এল ! উঠলুম । পাঁচ কদম যেতে না যেতেই বুঝলুম, 'তে
হি নো দিবসা গতাঃ ।' আমাদের ছেলেবেলায় ট্রাম গাড়ির কি-সব
যেন থাকতো স্থিপ্রাণ্ড, শক্-এব্জরবার আরে' কত কী । গাড়ি এমনই
মোলায়েমে যেত যে, মনে হতো ওয়াই এম সি এ'র বিলিয়াড টেবিল
পেতে এখানে ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ানশিপ দিবা খেলা যেতে পারে ।
বস্তুত তখনকার দিনে এরকম আরামদায়ক নিরাপদ বাহন কলকাতায়
আর দ্বিতীয়টি ছিল না । আর আজ ! প্রতি আচমকা ধাক্কাতে মনে
ভয় হলো, কাল রাত্রিতে যা খেয়েছি তারা বুঝি সব রিটার্ন টিকিট
নিয়ে গিয়েছিল, এই বুঝি সবাই একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে মোকামে ফেরৎ
এসে কণ্ডাকটরের কাছে 'গুহ কমিশনের রিপোর্ট' পেশ করবেন,
আমি ভোরবেলাকার বেহেড মাতাল ।

০৬৫০-এ বার্নাউনি প্যাসেঞ্জার ধরে নিবিঘ্নে বোলপুর ফিরলুম ।

কিন্তু বর্ধমানে চা জুটলো না । বর্ধমানে চা-যোগাড় করার
ভালুমতী খেল গুণীন্ একমাত্র শহর-ইয়ারই নব নব ইন্দ্রজালে নির্মাণ
করে দেখাতে পারেন । সে তো ছিল না ।

টেনে মাত্র একটি চিন্তা আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল ।

এই যে আমি কাউকে কিছু না বলে কয়ে সয়ে পড়লুম, এটাকে ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহাৰ্ণব পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন ‘পলায়ন-মনোবৃত্তি’ না কি যেন—বোধহয় ‘এস্কেপিজম’—রাজভাষায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃত ‘পাণ্ডিত্যের’ দ্বিরদরদস্তস্তের উচ্চাসনে বসে যে তত্ত্ব প্রচার করেন—ইংরেজ ‘পণ্ডিতরা’ তো বটেনই, এবং তাদেরই নুন-নেমক-থেকোহনুকরণকারী জৰ্মন ফরাসি ‘পণ্ডিতের’ও একাধিক জন—সে তত্ত্বের নিৰ্বাস : ‘ভারতীয় সাধুসন্ত, গুণীজ্ঞানী, দার্শনিক-পণ্ডিত সবাই, সকলেই অত্যন্ত স্বার্থপর, সেল্ফিশ্। তারা শুধু আপন আপন মোক্ষ, আপন আপন নিৰ্বাণ-কৈবল্যানন্দ লাভের জন্ত অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। বিশ্বসংসারের আতুরকাতরজনের জন্ত তাদের কণামাত্র শিরঃপীড়া নেই, নো হিউমেন সিম্পেথি, নো পরোপকার প্রবৃত্তি। এই ভারতীয়দের দৰ্শন—কি সাংখ্য, কী বেদান্ত, কী যোগ—সর্বত্রই পাবে এক অনুশাসন, “আত্মচিন্তা করো, আ প ন মোক্ষচিন্তা করো।” মোস্ট্ সেল্ফিশ্ এগোইস্টিক ফিলসফি।’

এসব অর্ধভুক্ত বমননিঃসৃত ‘আশুবাচ্য’ যুক্তিতর্কদ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ভূতকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করা যায় না। সেখানে দরকার—জৈসন কে তৈসন—তেজী সরষে ঝাজালো লক্ষ পোড়ানো।

সে মুষ্টিযোগ রপ্ত ছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের। এ-স্থলে তিনি প্রয়োগ করলেন ঝাজালো লক্ষা-পোড়া। অর্থাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রোপ অতিশয় সিদ্ধহস্তে। অথচ সে পুণ্যশ্লেষক রচনা এমনই সুনিপুণ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ভরা যে, আজো, অর্ধশতাব্দীধিক কাল পরও এখনো কোনো কোনো ‘ভারতপ্রেমী’ ‘হিন্দুসভ্যতা তথা মর্ষাদা রক্ষণ কর্ণেওয়ালো বামনাবতার মন্ডলী’ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ বুঝতে না পেয়ে ‘বঙ্কিম মূর্দাবাদ, বঙ্কিম মূর্দাবাদ’ জিগির তুলে গগনচুম্বী লক্ষপ্রদানে উদ্যত হন।

বঙ্কিমের সেই ‘রামায়ণ সমালোচনার’ কথা ভাবছি।

অবশ্য এ-সব বাঙ্গ ছাড়াও এদেশের পণ্ডিতগণ দার্শনিক পদ্ধতিতেও ইয়োরোপীয় ‘পণ্ডিতদের’ মুখ-তোড় উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু হায়, দর্শনশাস্ত্রে আমার আলিফের নামে ঠ্যাঙ। আমি অশ্রু দৃষ্টি অশ্রু দর্শনের আশ্রয় নি।

অপবাদটা ছিল কি? আমরা নাকি বডুই স্বার্থপর, নিজের মোক্ষচিন্তা ভিন্ন অশ্রু কারো কোনো উপকার বা সেবার কথা আদৌ ভাবিনে।

এস্থলে আমার বক্তব্যটি—তার মূল্য অসাধারণ কিছু একটা হবে না জানি—সামান্য একটি পর্ষবেক্ষণ দিয়ে আরম্ভ করি। এই বাঙলা দেশে সবচেয়ে বেশী কোন্ গ্রন্থখানা পড়া হয়? অতি অবশ্যই মহাভারত। মূল সংস্কৃত, মহাত্মা কালীপ্রসন্নের অনুবাদ, বা রাজশেখরীয়, কিংবা কাশীরামের বাঙলায় রূপান্তরিত মহাভারত কিছু-না-কিছু-একটা পড়ে নি এমন বাঙালী পাওয়া অসম্ভব। এই হিসেবের ভিতর বাঙালী মুসলমানও আসে। প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্য নিবেদন করি। দেশ-বিভাগের প্রায় পনেরো বৎসর পর আমি একটি পাকিস্তানবাসিনী মুসলিম ইনস্পেকট্রেস্ অব্ স্কুলস্কে শুধোই, ‘আপনাদের দেশে কাচ্চাবাচ্চাদের ভিতর এখন কোন্ কোন্ বই সবচেয়ে বেশী পড়া হয়?’ ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললেন, ‘রামায়ণ-মহাভারত—বরঞ্চ বলা উচিত মহাভারত-রামায়ণ—কারণ মহাভারতই কাচ্চাবাচ্চারা পছন্দ করে বেশী। তবে তারা প্রামাণিক বিরাট মহাভারত পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু পরিবারে এগনো কাশীরাম, কিন্তু বাচ্চারা পড়ে “মহাভারতের গল্প” এই ধরনের সাদা-সোজা চটি বই।’ তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, ‘অবশ্য ব্যতায়ও আছে। আমার বারো বছরের ছেলেটা ইতিমধ্যেই তার মামার মত “পুস্তক-কীট” হয়ে গিয়েছে। তাকে কালীপ্রসন্ন আর রাজশেখর দুইই দিয়েছিলুম। মাস দুই পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, “রাজশেখর-বাবুর ভাষাটি বড় সহজ আর সুন্দর। কিন্তু সব-কিছুর বড় ঠাসাঠাসি।

কালীপ্রসন্নবাবুরটা বেশ ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে লেখা। আরাম করে ধীরে ধীরে পড়া যায়।’ এরপর মহিলাটি একটু হেসে বললেন, ‘জানেন, —বয়স্ক মুসলমানদের কথা বাদ দিন, তাঁরা তো দেশ-বিভাগের পূর্বেই কারিকুলাম মাসিক রামায়ণ-মহাভারত অন্নদামঙ্গল মনসামঙ্গল এ-সবেরই কিছু কিছু পড়েছিলেন—কিন্তু পার্টশনের এই পনেরো বৎসর পরও আমাদের মুসলমান নাচারী “দাতাকর্ণ”—কে চেনে বেশী, কর্ণের অপজিট নাম্বার আরব দেশের দাতাকর্ণ হাতিম তাঁঙ্গি-কে চেনে কম।’

এই মহাভারতটি যখন বালবৃদ্ধবনিতার এতই সুপ্রিয় সুখপাঠ্য, তখন দেখা যাক, এ-মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ উপদেশ কি—ভুল বললুম, ‘উপদেশ’ নয়, আপন আত্মবিসর্জনকর্মদ্বারা দৃষ্টান্ত-নির্মাণ, আদর্শ নির্দেশ—সেটি কি ?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শ্রাণাধিক প্রিয় চারি ভ্রাতা, মাতা কুন্তীর পরই যে নারী তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত, যার শপথ রক্ষার্থে এই শান্তিপ্ৰিয় যুধিষ্ঠির নশংস কুরুক্ষেত্রের সমরাজনে অবতীর্ণ হলেন, সেই নারী, এবং পরস্পর তাঁর চার ভ্রাতা মহাপ্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হিমালয় অতিক্রম করার সময় একে একে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন পরম স্নেহশীল যুধিষ্ঠির তাঁদের জন্ম ক্ষণতরেও শোক করেন নি, কারো প্রতি মুহূর্তেক দৃষ্টিপাত না করে সমাহিতচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ-সময় সে-ই কুকুর, যে হস্তিনাপুর থেকে এঁদের অনুগামী হয়েছিল, সে-ই শুধু যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে।

এমন সময় ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল রথশব্দে নিনাদিত করে দেবরাজ স্বর্গরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে বললেন, ‘মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হয়ে স্বর্গারোহণ করো।’

এর পর উভয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। আমার ভাষায় বলি, বিস্তর দর কষাকষি হলো। শেষটায় সমঝাওতা ভী হলো। ঐ যে-রকম দেশ-বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস লীগে হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনার

এখানেই সমাপ্তি। ইতিমধ্যে চতুর্পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছেন।

এর পর, পুনরায় আমার নগণ্য ভাষাতেই বলি, বখেড়া লাগল সেই নেড়ি কুত্তাটাকে নিয়ে। যুধিষ্ঠির ফরিয়াদ করে বলছেন, 'এ কুত্তাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। একে এখানে ছেড়ে গেলে আমার পক্ষে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ হবে।'

সরল ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, এ তো মহা ক্যান্দাদ। এই যুধিষ্ঠিরটা তো আপন স্বার্থ কখনো বোঝে নি, এখনও কি আপন কল্যাণ বোঝে না? প্রকাশে বললেন, 'ধর্মরাজ, আজ তুমি অতুল সম্পদ, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করবে। এই 'স্বরূপত্ব লাভ'টা আমি অজ্ঞো বুঝতে পারি নি; মরলোকের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তো স্বর্গলোকে তাঁর স্বরূপত্ব লাভ করবেন স্বর্গের ধর্মরাজ মমরাজার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে—ইন্দ্রের স্বরূপত্ব লাভ করবেন তো তাঁর পুত্র অজুন!)। এসব বিদকুটে বয়নাঙ্ক্য করো না। আমার এই অতি পুত্র, হেভেনলি বেহেশতের রথে ঐ নেড়ি, যেয়ো অতিশয় অপবিত্র কুকুর—আর হাইড্রফবিয়া থাকাকালি কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—কি করে ঢুকতে পারে?'

*

*

*

এ-সব তাবৎ কাহিনী সকলেরই জানা। আমি শুধু আমার আপন ভাষাতে কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। কেউ যেন অপরাধ না নেন। যুগ যুগ ধরে আসমুদ্র-হিমাচল সবাই আপন আপন ভাষাতে মহাভারত নয়! নয়! করে লিখেছে। আমি যবন। আশুত্বাক্য বেদে আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। কিন্তু মহাভারতে অতি অবশ্যই আছে। সাবধান! বাধা দেবেন না। কমুনাল রায়েট লাগিয়ে আপন হক্কে কেড়ে নেব।

কিন্তু এহ বাহা।

ইয়োরোপীয়রা বলে আমরা স্বার্থপর। তবে আমাদের এই যে

সর্বপরিচিত সর্বজনসম্মানিত গ্রন্থে যুধিষ্ঠির বলছেন, তাঁর স্বর্গসুখের
তরে কোনো লোভ নেই, তিনি মোক্ষলুক নন, এমন কি স্বর্গে না
যেতে পারলে তিনি যে তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, কুন্তী, পাঞ্চালীর সঙ্গসুখও
পাবেন না, তাতেও তাঁর ক্ষোভ নেই—কিন্তু, কিন্তু, তিনি

এই ‘ভক্ত শরণাগত’ কুকুরটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে
পারবেন না ।

* * * *

ট্রেনে কলকাতা থেকে আসতে আসতে এই সব কথা ভাবছিলম ।
স্বপ্নে যে শুনেছিলম, যার মোদা ছিল,

‘ওরে ভীক, তোমার উপর নাই ভুবনের ভার ।

হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥’

‘তুই কলকাতা ছেড়ে পালা’ । না, যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে সেই
পন্থা অবলম্বন করবো ?—অবশ্য আমি যুধিষ্ঠির নই বলে, আমার
যেটুকু সঙ্গতি আছে সেইটুকু সম্বল করে নিয়ে ।

হজরৎ নবী প্রায়ই বলতেন, ‘আল্লার উপর নির্ভর (তওয়াক্কল)
রেখো ।’ একদা এক বেতুইন শুধোলো, ‘তবে কি, হজর, দিনান্তে
উটগুলোকে দড়ি দিয়ে না বেঁধে মরুভূমিতে ছেড়ে দেব—আল্লার
উপর নির্ভর করে ?’ পয়গম্বর মূঢ়হাস্য করে বলেছিলেন, ‘না । দড়ি
দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে আল্লার উপর নির্ভর রাখবে ।’ অর্থাৎ বাধার
পরও ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে, দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, চোর এসে
দড়ি কেটে উট চুরি করে নিয়ে যেতে পারে—ঐ সব অবোধ্য দৈব
দুর্বিপাকের জন্ম আল্লার উপর নির্ভর করতে হয় ।

তবে কি আমার কলকাতাতে রয়ে গিয়ে যেটুকু করার সেইটুকু
করাই উচিত ছিল—আল্লার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ ‘মা ফলেষ
কদাচন’ করে ?

* * * *

শুতে যাবার সময় হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপন মনে একটু হাসলুম।

সেই পাকিস্তানী মহিলাকে শুধিয়েছিলুম, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই নাপাক কুকুরটা মহাভারতে ঢুকলো কেন ?

তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখেছি কথাটা।...আসলে কি জানেন, মহাভারত সব বয়সের লোকের জন্মই অবতীর্ণ হয়েছে— বাচ্চাদের জন্মও।

তারা কুকুর বেরাল ভালোবাসে। তাই তারা কুকুরের জন্ম সর্বস্ব ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়। ঐটেই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগ।'

বাইশ

কলকাতা,

হাজার হাজার আদাব তসলিমাৎ পর পাক জনাবে আরজ এই,
সৈয়দ সাহেব,

আমি ভেবেছিলাম, ছ'একদিনের ভিতর আপনাকে সব-কথা খুলে বলার সুযোগ পাব, কিন্তু আপনি হঠাৎ চলে গেলেন। আপনার ডাক্তার বিস্মিত ও ঈশৎ নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলুম, এই ভালো। আপনার সামনে আমার বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন সব আপত্তি, প্রতিসমস্যা তুলতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার কোনো-কিছুই বলা হয়ে উঠতো না। তাই চিঠিই ভালো। কে যেন আপন ডায়েরি লেখার প্রারম্ভেই বলেছেন, মানুষের চেয়ে কাগজ চের বেশী সহিষ্ণু।

অবশ্য এ-কথা আবার অতিশয় সত্য যে পত্র লেখার অভ্যাস আমার নেই। ভাষার উপর আমার যেটুকু দখল সেও নগণ্য। তাই যা লিখব তা হবে অগোছালো। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও বলি; আমার ভাবনা চিন্তা সবই এমনই অগোছালো যে অগোছালো ভাষাই আমার অগোছালো মনোভাবকে তার উপযুক্ত প্রকাশ দেবে। তত্বপূর্ণ আমি জানি, আপনি গোছালো অগোছালো সব রাবিশ সব সারবস্তু মেশানো যে ঘ্যাট, তার থেকে সত্য নির্ধাসটি বের করতে পারেন।

আপনি হয়তো অধৈর্ষ হয়ে উঠেছেন। আমি মোদ্দা কথায় আসছি না কেন? সেটাতে আসবার উপায় জানা থাকলে তো অনেক গণ্ডগোলই কেটে যেত।

আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত আমার বুক তুকান

তোলে না, সে কথা আপনাকে আমি বলেছি। এখনও ফের বলছি—আপনার সে-রাত্রে দীর্ঘ ডিফেন্সের পরও। অথচ এ-স্থলে আমাকে তাঁরই শরণ নিতে হলো।

গানটি আপনি নিশ্চয়ই জানেন :

‘যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা

তোমায় জানাতাম।’

এ-স্থলে আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, যে, কবিগুরুর তুলনায় আমি শোকছুঃখ পেয়েছি অনেক অনেক কম। আপনি সে-রাত্রে তাঁর একটার পর একটা ছুঁদেবের কাহিনী বলার পূর্বে আমি সেদিকে ও-ভাবে কখনো খেয়াল করি নি। আপনার এই সুদুর্মাত্র তথ্যোল্লেখ আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আমি ভাবছিলুম, রবীন্দ্রনাথ পর পর এতগুলো শোক পাওয়ার পরও কি জানতে পারলেন না, তাঁর ‘কিসের ব্যথা’, তাঁর শোকটা কোন্ দিক থেকে আসছে ?

তাই অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আমি এখনো ঠিক ঠিক জানিনে, ‘আমার কিসের ব্যথা’, আমার অভাব কোন্ খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন আমাকে অশান্ত করে তুলেছিল।

কিন্তু এখানে এসেই আমার বিপত্তি—যে-বিপত্তি এতদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে। এবং সত্য বলতে কি, তার অনেক আগের থেকেই। কিশোরী অবস্থায় যখন প্রথম পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ হয় তখন থেকেই। পুরুষ কথাটার উপর আমি এখানে জোর দিচ্ছি।

আমার বিপত্তি, আমার সমস্যা—পুরুষ মানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে ? সাহিত্যজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিতরা বলেন, সার্থক সাহিত্যিকের ঐ তো কর্ম, ঐ তো তার সত্যকার সাধনাজিত সিদ্ধি। জমিদার রবীন্দ্রনাথ গরীব পোস্টমাস্টার, ভিন্দেশী কাবুলীওলার বুকের ভিতর প্রবেশ

করে তাদের হৃদয়ানুভূতি স্পন্দনে স্পন্দনে আপন স্পন্দন দিয়ে অনুভব করে তাঁর সৃজনীকলায় সেই অনুভূতিটি প্রকাশ করেন। যে কবি, যে সাহিত্যিক আপন নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মরণ করে, অপরের সত্তায় বিলীন হয়ে যত বেশী গ্রহণ করে আপন সৃজনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই তত বেশী সার্থক কবি, সাহিত্যিক।

এ-তত্ত্বটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস, পুরুষ কবি, পুরুষ সাহিত্যিক কখনো, কস্মিনকালেও নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি, পারবেও না; তার কারণ কি, কেন পারে না, সে নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো সন্তুস্তর পাই নি।

যদিও কিঞ্চিৎ অবাস্তব তবু এই প্রসঙ্গে একটি কথা তুলি। নারী-হৃদয়ের স্পন্দন এবং পুরুষ-হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের আলোচনা নয়; নারী পুরুষের একে অঙ্কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার যে চিন্ময় প্রেম সেটাও নয়। আমি নিতান্ত মূগ্ময়, শারীরিক যৌন সম্পর্কের কথা তুলছি। আজকাল সাহিত্যিক, তাঁদের পাঠকসম্প্রদায়, খবরের কাগজে পত্র-লেখকের দল সবাই নির্ভয়ে এ-সব আলোচনা সর্বজন-সমক্ষে করে থাকেন। আমার কিন্তু এখনো বাধো বাধো ঠেকে। কত হাজার বৎসরের 'না, না'-র taboo আজ অকস্মাৎ পোন্নয়ে যাই কি প্রকারে?

তবে আমার এইটুকু সাস্ত্যনা, যাঁর আপ্তবাক্যের শরণ আমি নিচ্ছি, তিনি আপনার গুরু গুরু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে 'দেশ'-পত্রিকার সঙ্গে আপনি বহু বৎসর ধরে বিজড়িত সেই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল তাঁর একথানা চিঠি। আমার শব্দে শব্দে মনে নেই। তবে মূল তত্ত্বটি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

কে যেন তাঁকে শুধিয়েছিল, পুরুষ যখন কখনো কোনো রমণীকে দেখে কামতুর হয় (এখানে দেহাতীত স্বর্গীয় প্লাতনিক প্রেমের কথা হচ্ছে না), তার কামকে উত্তেজিত করে রমণীর কোন্ কোন্ জিনিস?

তার মুখমণ্ডল, তার ওষ্ঠাধর, তার নয়নাগ্নি, তার কুচদ্বয়, তার
নিতম্ব, তার উরু ।

এই বারে প্রশ্ন, কোনো পুরুষকে দেখে যখন কোনো রমণী
কামাতুরা হয় তখন কি দেখে তার কামবহি প্রজ্বলিত হয় ?

যে-ভদ্রলোক দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে এ-প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন তাঁর
পত্র 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি । কিন্তু 'দেশে' প্রকাশিত
দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রোত্তর থেকে সে-প্রশ্নের মোটামুটি স্বরূপ অনুমান
করা যায় ।

আবার বলছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটি আক্ষরিক,
হুবহু আমার মনে নেই । তিনি যা লিখেছিলেন তার মোদ্দা তাৎপর্য
ছিল ; তিনি যে এ-সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেন নি, তা নয় । কিন্তু
কোনো সহুত্তর খুঁজে পান নি ।

তারপর ছিল ইংরিজি একটি সেন্টেন্স । যতদূর মনে পড়ছে,
তিনি লিখলেন, *But why ask me ? Ask Rabi. He
deals in them.* অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দার্শনিক,
এ-সব ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ নন ; তবে লাকিলি তাঁর ছোট
ভাইটি এ-বাবদে স্পেশালিস্ট ; তিনি প্রেম, কাম, নিষ্কাম প্রেম
সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারেন ।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব, পীর সাহেব, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কনিষ্ঠ
ভ্রাতাটিও এ-বিষয়ে খুব বেশী ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন না । প্রথম
যৌবনে তিনি এ-সব নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বোলপুরে
ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি--যাকে বলে হট্-স্টাফ্—
সেটাকে তাঁর গানের বিষয়বস্তু করেন নি । বোধহয় ভেবেছিলেন,
তাঁর রচিত হট্-স্টাফ্‌ গান আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীরা দিনের
পর দিন শুনবে, এটা কেমন যেন বাঞ্ছনীয় নয় । এবং এগুলো তো
আর ওয়াটার-টাইট কমপার্টমেন্টে বন্ধ করে খাস কলকাতার
বয়স্কদের কন্‌জাম্প্‌শনের জঙ্ঘা চালান দেওয়া যায় না । এগুলোর

বেশ কিছু ভাগ বুঝতে মত ফিরে আসবে সেই বোলপুরেই—
প্রথম যুগে গ্রামোফোন রেকর্ডের “কল্যাণে”, পরবর্তী যুগে বেতার
ভো ঘরে ঘরে ।

অযথা বিনয় আমার নয় না । আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভালো
করেই চিনি, অবশ্য বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের মত তাঁর গানের
“ফুলস্টপ-কমা স্পেশালিস্ট” নই । তাই হফ্ হ্যান্ড্ বলছি তাঁর
শেষের দিকের গানের একটিতে হট্-স্টাক্‌ফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে—

“বাসনার রঙে লহরে লহরে

রঙিন হল ।

ককণ তোমার অকণ অধরে

তোলো হে তোলো ।”

আর বার বার বলছেন, “পিযো হে পিযো ।” সর্বশেষে বলছেন,
আমার এই তুলে-ধরা পান-পাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন
(আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায় ।

এই যে প্রিয়ার “নবীন উষার পুষ্পসুবাসের” মত নিশ্বাস, একে
নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্লাইম্ কাম আর কী হতে পারে ?

কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি, রবীন্দ্রভক্তদের ভিতর এ-গানটি
খুব একটা চালু নয় । অথচ দেখুন, সিনেমা এটা নিয়েছে, গ্রামোফোন
এটা রেকর্ড করেছে । মাক করবেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়,
এইসব তথা-কথিত রবীন্দ্রভক্তদের চেয়ে ব্যবসায়ী সিনেমা, গ্রামোফোন
কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে বহু বহু বার অধিক ৩র সম্মান দেখিয়েছে,
নিজ্জদের শ্রুতিচর পরিচয় দিয়েছে ।

হ্যাঁ, আগে ভাবি নি, এখন হঠাৎ মনে পড়ল আরেকটি গানের
কথা । এটি অবশ্য হট্-স্টাক্‌ নয়, কিন্তু আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে
এর যোগ রয়েছে ।

“ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো

আমার মুখে র আঁচলখানি ।

ঢাকা থাকে না হয় গো,
 তারে রাখতে নারি টানি ॥
 আমার রইল না লাজলজ্জা,
 আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা-
 তুমি দেখলে আমারে
 এমন প্রলয়-মাঝে আঁজি
 আমায় এমন মরণ হানি ॥”

আচ্ছা, চিন্তা করুন তো এ-গানটি কোন্ সময়ের রচনা? ভাষার পারিপাটা, পতঃস্মৃতি মিলের বাহার, আরো কত না কাব্যকাব্য—যেগুলো চোখে পড়ে না, কারণ প্রকৃত সার্থক কলার ভিতরে তারা নিজেদের একাটলেসলি বিলীন করে দিয়েছে— এগুলো তো ঐ গানের পরবর্তী শ্লোকের ভাষায় “আকাশ উজলি” লাগিয়ে বিজুলি আমাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে, গানটি কবির পরিপক্ব বয়সের অত্যন্তকৃষ্ণ সৃজন। নিশ্চয়ই এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে।

কিন্তু যে গুণী আমাকে এ-গানটি শুনিয়েছিলেন এবং শেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি “গীতবিতানে” যে মুদ্রিত পাঠ আছে তার থেকে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে গানটি গেয়েছিলেন। ছাপাও আছে, ঝড়ের ছুঁদাফু বাতাসে কে যেন আর্তবব করছে, তার ‘মুখে র আঁচলখানি উড়ে যাচ্ছে।’

গুণী বলেছিলেন, ‘১৯২০-১৯৩০-এ মুখে র আঁচল উড়ে যাওয়াতে কোন্ মেয়ে এরকম চিল-চাঁচানো চেলাচেল্লি পাড়া-জাগানো হৈ হুল্লোড় আরম্ভ করবে? তার নাকি “সাজসজ্জা লাজলজ্জা” বেবাক কপ্পুর হয়ে গেল। (এস্থলে বলি, ঐ গুণীটি আপনার ভাষার অনুকরণ করেন।) আর শুধু কি তাই? তাকে “প্রলয় মাঝে আনি/এমন মরণ হানি”—“তুমি দেখলে আমারে!”—’

গুণী বললেন, ‘এটা হতেই পারে না। আসলে গানটি কি ছিল

জানেন ? সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে ছিল তখন উলঙ্গ । সে গান ছিল,

“ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো

আমার বুকে র

বসনখানি”

অর্থাৎ ঝড়ে মুখের “আচলখানি” যায় নি, গেছে “বুকের বসনখানি ।”

কিন্তু গানটি প্রথমবার গাওয়া মাত্রই য়ারা সে নিতান্ত ঘরোয়া জলসাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেমন যেন অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব প্রকাশ করে কেউ বা জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কেউ বা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগলেন । রবীন্দ্রনাথ নূতন গান প্রথমবার সর্বজনসমক্ষে গাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই আপন প্যাসনে চশমাটি পরে নিয়ে সঙ্কলের মুখের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিতেন এবং বুঝে যেতেন, নূতন গানটি শ্রোতাদের হৃদয়মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে । এবারে তিনি বুঝে গেলেন, কোনো কিছুতে একটা খটকা বেধেছে—যেটা অবশ্য ছিল বড় বিরল । তাই কাকে যেন শুধোলেন—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ব্যাপারটা কি ? কারণ আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গানটি অপূর্ব ।

তখন কে যেন একজন সভয়ে বললেন, “ঐ বুকের বসন” কেউ কেউ মিসআণ্ডারস্টেণ্ড করতে পারে হয়তো ।”

রবীন্দ্রনাথ এ-সব রসের আসরে তর্কাতর্কি করতেন না । চুপ করে একটুখানি ভেবে বললেন, “আচ্ছা দেখাছ ।”

আশ্রমে রাত্রে খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল । সভা ভঙ্গ হলো ।

তার পর দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো । তার কিছুদিন পরে ছাপাতে দেখি,—গানটি কোথায় যেন বেরিয়েছিল—“বুকের বসনের” বদলে “মুখের আচল” এই বিকল্প নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ।

শুণী কিছুটা সহানুভূতিমাখা সুরে আপন বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, “অর্থাৎ সেই নগ্ন নবজাত শিশু গানটির উপর রবীন্দ্রনাথ পরিয়ে দিলেন চোগা-চাপকান—পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে।...এ-সম্বন্ধে আমার মতামত তো বললুম, কিন্তু কবি, সুরকার, নব নব রাগরাগিণীর সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করার—নিন্দাবাদ দূরে থাক—আমার কী অধিকার! আমার অতি নগণ্য রসবোধ যা বলে, সেইটেই প্রকাশ করলুম মাত্র।”

কিন্তু প্রিয় সৈয়দ সাহেব, এই যে মুখের আঁচল, বুকের বসন নিয়ে কাহিনীটি ঐ শুণী কীর্তন করেছিলেন সেটা নাসিবে লিজেগুয়ারি বা—আপনাদের রকের ভাষায় গুলও হতে পারে, কিংবা এর ভিতর সিকি পরিমাণ সত্যও থাকতে পারে। কারণ ঐ শুণী প্রধানত গাইতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সেখানে তাঁকে ক্রমাগত ইম্প্রভাইজ করতে হয়, নব নব রস সৃষ্টি করার জন্ত নব নব কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। সেটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদদের নিয়ে এত গণ্ডায় গণ্ডায় লিজেগু। হয়তো তিনি সেটা নিছক কল্পনা দিয়ে রঙে রসে জাল বুনেছেন, এবং বার বার একে ওকে সেটা বলে বলে, সেই “রেওয়াজের” ফল স্বরূপ লিজে ই এখন সে-কাহিনী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

আপনিই না এক দিন বলেছিলেন, “পরিপূর্ণ পাক্কা মিথ্যাবাদী হওয়ার পথে যেতে যেতে যারা উত্তম সুযোগ না পেয়ে দড়কচ্চা মেরে গেল, অর্থাৎ যাদের গ্রোথ্ স্ট্যান্টেড্ হয়ে গেল, তারাই আর্টিস্ট, সাহিত্যিক, কবি, আরো কত কী!

তবে ঐ বে-লিজেগুটির কাহিনী এই মাত্র বললুম, সেটা সত্য না হলেও হওয়া উচিত ছিল,—এবং যাই হোক, যাই থাক—কাহিনীটি ক্যারেক্টারিস্টিক এবং টিপিকাল।

কিন্তু আপন এতক্ষণে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—আবার ভাবছেন, আপনাকে আমার এ-চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটা কি? এখখুনি বলছি।

আমার বক্তব্য, কী রবীন্দ্রনাথ, কী কালিদাস, কী বুদ্ধদেব—কেউই রমণীরহস্য এ যাবত আদৌ বুঝে উঠতে পারেন নি। মহত্ব বৎসরের এই সাধনার ধন পুরুষ মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শুধু খুঁজেছে কিন্তু সন্ধান পায় নি।

প্রশ্নটা তো অতি সরল। যা দিয়ে আমি এ-চিঠি আরম্ভ করেছি। উপাখ্যাত কঠিনতর সমস্যা, রহস্যগুলো বাদ দিন। সেহ যে আঁতশয় সাদামাটা প্রশ্ন: পুরুষের কি দেখে রমণী কামাতুর হয়? এবং সেটা শুধু নারী পুরুষেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গও সেটা সমানভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ অবজেক্টিভ্ স্টাডি করারও পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

অথচ কিমার্শ্চর্মতঃপরম্। হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করেও পুরুষজাত যখন এর সমাধান বের করতে পারে নি, তখন এই ভেড়ার পাল, এই পুরুষজাত—অপরাধ নেবেন না—বের করবে জীর্চারিত্রের রহস্য, গাদের প্রেমের প্রহেলিকা—যেটা শারীরিক সম্পর্কের বহু বহু উর্ধ্বে—তাদের হৃদয়ের আধা-আলো-অন্ধকারের কুহেলিকা!

তাই নিবেদন, এই পুরুষজাতকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ডাক্তার না, পীর না, আপানও না।

পুরুষজাতটা যে মেয়েদের ভুলনায় মূর্খ এবং আপন মজল কোন্ দিকে নেটা না বুঝে বাঁদরের মত যে-ডালে বসে আছে সেহ ডালটাই কাটে কুড়িয়ে-পাওয়া করাত দিয়ে। নইলে এই সাত হাজার বছর ধরে এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত! আমার নিজের বিশ্বাস, জীজাতি যদি এ-সংসারের সর্ব গবর্নমেন্ট চালাতো, কিংবা এখনো চালায় তবে ও-রকম ধারা হবে না। আজো যদি ইউনাইটেড নেশন্স থেকে সব কটা পুরুষকে কোঁটিয়ে বের করে দিয়ে নারীসমাজকে প্রতিষ্ঠিত

করা হয়, তবে তারা ন'মাস দশদিনের ভিতর মার্কিন-রুশ-মৈত্রী প্রসব করবে! আমি আপনার মত দেশবিদেশ ঘুরি নি; যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, শিলঙের খাসিয়া সমাজে বাস করে—কারণ সে-সমাজ চালায় মেয়েরা। শুনেছি বর্মার সমাজব্যবস্থাও বড়ই সহজ সরল পদ্ধতিতে গড়া।

আরেকটা কথা : হজরৎ মুহম্মদ নবী ইসলাম স্থাপনা করেন। এবং সে শুভকর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গলশঙ্খ কাকে দিয়ে বাজালেন? কাকে তিনি সর্বপ্রথম এই নবীন ধর্মে দীক্ষিত করলেন? তিনি তো বীবী খাদিজা—নারী। তার পর আসেন পুরুষ সম্প্রদায়, হজরৎ আলী, আবু বকর, ওমর ইত্যাদি। তা হলে দেখুন, আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান, অন্ততঃ আমাদের স্বীকার করতে হবে, যে সর্বস্ত্র আল্লাতলা—যিনি সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ—তিনিই তাঁর শেষ-ধর্ম প্রচারের সময় একটি নারীকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার জন্তু আইয়ুব সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন কলকাতার কোনো কোনো মুসলমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, তিনি নারী। আমি তখন বলেছিলুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেয়ে মুসলিম জাহানে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে দীক্ষিত হওয়ার শ্লাঘাগৌরব অনেক অনেক বেশী—কোনো তুলনাই হয় না। সেই সম্মান যখন একটি নারী তেরশ' বছর পূর্বে পেয়েছে তখন আরেকটি আজ প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না কেন?

তখন তাঁরা তর্ক তোলেন, কিন্তু হজরৎ নবী তো পুরুষ।

আমি বলি, তিনি তো আল্লার বাণী—যার নাম ইসলাম—আল্লার কাছে মিশন রূপে পেয়ে বীবী খাদিজাকে সেইটে দিলেন। স্বয়ং নবী তো এ-হিসেবের মধ্যে পড়েন না। (এ-স্থলে আমার মনের একটি ধোঁকা জানাই। উত্তর চাইনে। কারণ পূর্বেই বলেছি, আপনাদের কাউকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে লিখতে হবে না, কারণ সেটি আমি পাবো

না।...ব্রাহ্মধর্মের সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম কে? প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন? তবে তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করল কে?...কিংবা নিন্দুদেব। তিনি স্বয়ং কি বৌদ্ধ? তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলো কে? অগ্নদের বেলা, যেমন খৃষ্ট, রামমোহনের বেলা অনুমান করতে পারি, স্বয়ং গড্ (যাহুভে) বা পরব্রহ্ম খৃষ্টকে খৃষ্টধর্মে, রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু বুদ্ধের বেলা? তিনি তো ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং বলেছেন তিনি, তাঁরা (দেবতারা থাকলেও তাঁরা মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে অশক্তি। তা হলে?... এবং আজকের দিনের ভাষায় মার্ক্‌স্ কি মার্কসিস্ট? লেনিন অবশ্যই মার্কসিস্ট, কিন্তু লেনিন কি লেনিনিস্ট?

কিন্তু একটা কথা পুরুষমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে।

আল্লার হুকুমেই দৃশ্য অদৃশ্য সব-লোকই চলে, কিন্তু মানুষের কৃতিত্বও তো মাঝে মাঝে স্বীকার করতে হয়।

“অত্মপিও মধ্যে মধ্যে পুণ্যবান হয়।

নারীকে স্বীকার করি জয় জয় কয়।”

হজরৎ নবী ঐদেরই একজন। বড় বিরল, বড় বিরল, হেন জন যে নারীকে চিনে নিয়ে তার প্রকৃত গ্ৰায্য স্বীকৃতি দেয়। তাই হজরৎ বলেছিলেন,

“বেহেশৎ মাতার চরণপ্রান্তে।”

এবং নিশ্চয়ই তখন একাধিক দীক্ষিত মুসলমানের অমুসলমান মাতা ছিল। হজরৎ এ-স্থলে কোনো ব্যত্যয় করেছেন বলে তো জানিনে। এবং এ-কথাও জানি হজরৎ শিশুকালেই তার মা'কে হারান।

আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনার উদ্দেশে লেখা এই চিঠিই আমার শেষ চিঠি।

আপনি নিশ্চিত থাকুন। পূর্বেই বলেছি, এ-চিঠির উত্তরও আপনাকে লিখতে হবে না।

আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন, যখন আপনার কোনো পাঠক বহুসমস্ত্রাবিজড়িত, নানাবিধ প্রশ্নসংবলিত দীর্ঘ পত্র লিখে, দকে দকে তার প্রতিটি প্রশ্নের সজুত্তরসহ দীর্ঘতর উত্তরের প্রত্যাশা করে তখন আপনি মনে মনে স্মিতহাস্য করে বলেন ভদ্রলোক যা জানতে চেয়েছেন, সেগুলো একটু গুছিয়ে রম্যরচনাকারে “দেশ” বা “আনন্দবাজারে” পাঠিয়ে দিলে তো আমার দিব্য ছ’পয়সা হয়। আর লেখা জিনিসটা নাকি আপনার পে শা। ওটা আপনার নেশা নয়। এবং পেশার জিনিস তো কেউ ফ্রী বিলিয়ে বেড়ায় না। আমি তাই আপনার কাছে কোনো-কিছু মুক্তে চাইনে।

(শহুর্-ইয়ারের চিঠি এতখানি পড়ার পর অকস্মাৎ “শংখচূড়ের ডংশনের” মত আমাকে সে-চিঠি স্মরণে এনে দিল, আমি এমনই পাশ্বে যে, যবে থেকে, পোড়া পেটের দায়ে লেখা জিনিসটাকে পেশা রূপে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই থেকেই শহুর্-বর্ণিত ঐ কারণ বশতই আপন বউকে পর্যন্ত দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখি নি। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলুম, সেই যে স্মাকরা যে তার মায়ের গয়নায় ভেজাল দিয়েছিল আমি তার চেয়েও অধম। স্মাকরা তবু ভালো মন্দ যাহোক মাঁকে এক-জোড়া কাঁকন তো দিয়েছিল, আমি সেটিও প্রকাশক সম্পাদককে পাঠাচ্ছি! এই অনুশোচনার মাঝখানে আমার মনে যে শেষ চিন্তাটির উদয় হলো সেটি এই: এ-হেন নির্মম আচরণে হয়তো আমিই একা নই। নেই-বনে হয়তো আমি একাই খাটাশ হয়েও বাঘের সম্মান পাচ্ছি। আরো ছ’চারটে খাটাশ আছেন। কিন্তু হায়, তাঁরা তো আমাকে পত্র লিখে তাঁদের হাঁড়ির খবর জানাবেন না!)

*

*

*

আত্মচিন্তা স্বদেহ-‘ডংশন’ স্থগিত রেখে আবার শহুর্-ইয়ারের

চিঠিতে ফিরে গেলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি, নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি, অকস্মাৎ পুরুষবিদ্বেষে রূপান্তরিত এ-রমণীর জাতক্রোধে পরিপূর্ণ এই পত্রখানা আমার খুব একটা মন্দ লাগছিল না।

এর পর ইয়ার লিখছে,—

আদিখেত্তা, না, আদিখেত্যা ? কিন্তু আপনি এই মেয়েলি শব্দটি বুঝবেন। আপনি ভাবছেন, আমি আদিখেত্তা, বা আপনাদের ভাষায় “আধিক্যতা” করছি। কিন্তু আপনি তো অস্তুত এইটুকু জানেন—যদিও, অপরাধ নেবেন না, স্ত্রী-চরিত্রে আপনার জ্ঞান এবং অনুভূতি ঠিক ততটুকু, যতটুকু একটা অন্ধ এঙ্কিমোর আছে, হুগালি নদীর অগভীর বিপদসঙ্কুল ধারায় পাইলট জাহাজ চালাবার— আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ-হাহাকারদৈত্তের মরুভূমিতে আমি একা নই, আমার মত বিস্তর রমণী রয়েছে যাদের জীবন শূণ্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ— বিশেষ করে হিন্দু রমণী—সেটা জীবনভর এমনিই আশ্চর্য সঙ্গেপনে রাখে যে তাদের নিকটতম আত্মজনও তার আভাসমাত্র পায় না। গুরুর গানে আছে তাঁর বেদনার

“ভরা সে পাত্র তারে বৃকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে।”

আর এই রমণীদের বেলা তাদের বেদনার

“ভরা সে পাত্র তারে বৃকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা আ যু ধরে।”

ঐ যে আপনার ‘ভক্ত’ খানের ঠাকুরমা। তিনি যে তাঁর সমস্ত জীবন শূণ্যে শূণ্যে কাটিয়েছেন তার আভাস কি তার জাছ ভূতনাথ (হোয়াট এ নেম ! আমার বিশ্বাস ওর বাপমা তার নাম রেখেছিলেন ‘অনিন্দ্যাসুন্দর খান’ এবং বড় হয়ে, আজ এ প্রটেস্ট্, সে অণ্ড একস্টিমে গিয়ে এফিডেভিট দিয়ে ‘ভূতনাথ’ নাম নেয়) পর্যন্ত পেয়েছে ?

ঐ ঠাকুরমার শূন্যতা এবং আমার শূন্যতা যেন হংসমিথুনের মত আমাদের একে অঙ্কে কাছে টেনে নিয়ে আসে। ওদিকে উনি নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী এবং আমিও গরবিনী মুসলমানী। শুনেছি, প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময় একই গাছের গুঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, নকুল, গোসাপ নিরাপদ তীরের আশায় ভেসে ভেসে যায়। কেউ তখন কারো শক্রতা করে না, এমন কি আপন অসহায় ভক্ষ্য প্রাণীকেও তখন আক্রমণ করে না। আর আমাতে ঠাকুমাতে তো পান্নাসোনায়ে মিল্টি মানানসই। আমরা দুজনা বসে আছি একই নৌকায়! একমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা বলে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা অহিনকুলের—আজকের দিনের ভাষায় বুজুয়া প্রলে-তারিয়ার); আর আমাদের উভয়ের সামনে,

“চেণ্ড ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আধার
পার আছে কোন্ দেশে ॥...”

হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে ॥

পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে!”

ঐ তো আমার ‘দোষ’! কোনো-কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসন নেয় রবিঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপাণ আসন জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন। আর লোকে ভাবে—হয়তো ঠিকই ভাবে—আমার নিজস্ব কোনো ভাব-ভাষা নেই, আমি “চালিতা গর্ভা”—রবিবাক্যের গামলার নীল রঙে আমার ধবলকুষ্ঠের মত সাদা চামড়াটি ছুপিয়ে নিয়ে নবজলধরশ্যাম কলির মেকি কেটে হয়ে গিয়েছি!

কিন্তু আপনি জানেন, আপনাকে অসংখ্য বার বলেছি, আমি রাজা পিগমালিয়োন—এস্থলে রবীন্দ্রনাথ নিমিত মর্মরমূর্তি। বরঞ্চ তারো বাড়া। পিগমালিয়োন তাঁর গড়া প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণসঞ্চায় করতে

অক্ষয় ছিলেন বলে দেবী আফ্রোদিতে'কে প্রার্থনা করেন, তাঁর সেই মূর্তিটিকে জীবন্ত করে দিতে। দেবীরা—পূর্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে আবার বলছি, পুরুষের তুলনায় তাঁরা চিরন্তনী কারুণাময়ী। “ধন্য মা মেরি, তুমি, মা, পূর্ণা করুণাময়ী” সর্বদেবীর সর্বশেষ সর্বাঙ্গসুন্দরী মাজননী—দেবী আফ্রোদিতে রাজার বর পূর্ণ করে দিলেন। এ-স্থলে দেবীর এমন কী কেরামতি, কী কেরদানি! পক্ষান্তরে দেখুন, আমার এই মূর্তদেহ নির্মাণের জন্ত, প্রশংসা হোক, নিন্দা হোক, সেটা পাবেন আমার জনকজননী। কিন্তু সে-দেহটাকে চিন্ময় করলো কে? গানে গানে রসে রসে, রামধনুর সপ্তবর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে উড়ে-যাওয়া নন্দনকানন-পারিজাত রঙে রঞ্জিত প্রজাপতির কোমল-পেলব ডানা ছুটির বিচিত্র বর্ণে, নবীন উষার পুষ্পস্বাসে, প্রেমে প্রেমে, বিরহে বিরহে, বেদনা বেদনায় কে নিরমিল আমার হৃদয়, আমার স্পর্শকাতরতা, কোণের প্রদীপ যে-রকম জ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়ে যায় ছবছ সেই রকম সৌন্দর্যমাগরে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আমার নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবার জন্ত স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা—এটি নির্মাণ করলো কে? মহাপ্রভুর বর্ণ দেখে কে যেন রচোঁছিলেন—শব্দে শব্দে মনে নেই—

“চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো,

কে মাজিল গোরার দেহখানি!

ভারী সুন্দর! আকাশের চাঁদ আর পৃথিবীর চন্দন—অথাৎ স্বর্গের দেবতা চন্দ্র আর এই মাটির পৃথিবীর চন্দন দিয়ে, ক্রন্দগী দ্বারা স্বর্গমর্ত্যের সমন্বয়ে মাজা হল গোরাক্ষের দেহখানি! কিন্তু মহাপ্রভুর ভাষাতেই বলি এহ বাহ। ‘দেহ’ তো বাইরের বস্তু।

বার্নার্ড শ' রাজা পিগমালিয়োনকে অবশ্যই ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর মূর্তি এলাইজাকে দিলেন, সুমিষ্ট ভাষা এবং সুভদ্র বিষয় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে আলোচনা করার অনবগুদক্ষতা।

শ'কে ছাড়িয়ে বহু বহু সম্মুখে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ।
আমার চিত্তময় হৃদময় জগৎ নির্মাণ করে তিনি আমাকে 'যে বৈভব
দিয়েছেন, শ'র সৃষ্টি তার শতাংশের একাংশও পায় নি ।

আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার সম্মুখে শেষবারের মত
আমার শেষ গুরুদক্ষিণা নিবেদন করে গেলুম ।

*

*

*

কিস্ত মেয়েদের এই শূণ্যতা, দীনতা, ফ্রাস্ট্রেশনের জগ্ন দায়ী কে ?
নারী হয়েও বলবো, তার জগ্ন সর্বাগ্রে দায়ী রমণীকুল ।
প্রধানতঃ ।

আপনারই গুরু স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের "দেশে" প্রকাশিত
রচনাতে একটি সুভাষিত পড়েছিলুম,

"কুঠারমালিনঃ দৃষ্ট্বা

সর্বে কম্পাঘিতা ক্রমাঃ ।

বুদ্ধ ক্রমো বক্তি, "মা ভৈঃ

না সন্তি জ্ঞাতয়ো মম" ॥

"কুঠারমালাধারীকে দেখে সমস্ত গাছ যখন কম্পাঘিত তখন বুদ্ধ
একটি গাছ বললে, 'এখনই কিসের ভয় ? এখনো আমাদের (জ্ঞাতি)
কোনো গাছ বা বৃক্ষাংশ ওর পিছনে এসে যোগ দেয় নি' ।"

শহূর্-ইয়ার লিখছে, বড় হক্ কথা । কামারের তৈরি কুড়োলের
সুদুমাত্র লোহার, অংশটুকুন দিয়ে কাঠুরে আর কি করতে পারে,
যতক্ষণ না কাঠের ঠুকরো দিয়ে ঐ লোহার ঢুকিয়ে হ্যাণ্ডল বানায় ।
পুরুষজাত ঐ লোহা ; সাহায্য পেল মেয়েদের সহযোগিতার কাঠের
হ্যাণ্ডল । তাই দিয়ে যে-মেয়েরই একটু 'বাড়' হয় তাকে কাটে, আর
যেগুলো নিতাস্ত নিরীহ ঠান্ডা গাছ বা যে-সব বছর-বিয়ানীরা গণ্ডায়
গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বিইয়ে জীবন্মৃত তাদের রেহাই দেয় ।

এই সব অপকর্মে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে মেয়েরাই ।

শুনেছি, সতীদাহের পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য বিধবাকে প্ররোচিত করেছে সমাজাগ্রগণ্য নারীরাই ।

এত দিন বলি নি, এইবারে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলা বলি, এই কলকাতার মুসলমান মেয়েরা—ছ'চারটি হিন্দুও আছেন—আপনার সঙ্গে আমার অবাধ মেলা-মেশা দেখে টিডিটাকার দেয় নি ? বেহায়া বেআক্ৰ বেপর্দা বেশরম, তওবা তওবা বলে নি ? তবে কি না, আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, “চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া” হয়তো আমার দেহ এমন কি হৃদয়ও মাজা হয়েছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক, তজ্জনিত বুদ্ধি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবহেলা করার মত আমার গণ্ডারচর্মধিনিন্দিত দার্ঢ্য নির্মিত হয়েছে স্টুডেনের প্যার স্টেন্লেস্টিল ও সাউথ আফ্রিকার আন্-কাট্ ডায়মণ্ড মিশিয়ে আর আছেন, ভূতনাথের ঠাকুমা । যাকে বলতে পারেন আমার টাওয়ার অব্ পাওয়ার ।

তহুপরি আমার অভিজ্ঞা বলে এই সব “আজ-আছে-কাল-নেই” জিভের লিকলিকিনি অনেকখানি বিপ্লবসন্তোষমনা পরশ্রীকাতরতা বশতঃ । ইলিয়েট রোডের সায়েব মেমরা বড়াঁদনে যখন নানাবিধ ফুঁতির সঙ্গে একে অঙ্কে জড়িয়ে ধরে পেই পেই করে নৃত্য করে তখন আমরা—হিন্দুমুসলমানরা—প্রাণভরে ছ্যা ছ্যা করি বটে, কিন্তু তখন কসম খেতে হলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির পাট প্লে করা বন্ধ করে স্বীকার করতে হবে, মনের গোপন কোণে হিংসেয় মরি, “হায় ! আমাদের রদ্দী বুড়তা সমাজ এ-আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো কেন ?” নয় কি ? সত্য বলুন । কিন্তু আপনার কথা আলাদা । আপনি বিদেশে বিস্তর নেচেছেন, আর এখন, আমাদের মত নিরীহদের মূহুমন্দ নাচাচ্ছেন । আহা ! গোস্ সা করলেন না তো ? শুনেছি, সৈয়দরা বড্ড রাগী হন । ভবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সাস্তনার বাণীও পেয়েছি ; ঔয়াদের রাগ নাকি খড়ের আগুনের মত—ধপ্ করে জ্বলে আর ঝপ্ করে যায় নিভে—সঙ্গে সঙ্গে !

অবশ্য একটা জিনিস আমাকে গোড়ার দিকে কিছুটা বেদনা দিয়েছিল—এই সব নগণ্য ক্ষুদে ক্ষুদে, কিন্তু বিষেভর্তি চেরা-জিভ যখন আমার স্বামী, আপনার বন্ধু ডাক্তারের বিরুদ্ধে হিস্ হিস্ করে বিষ বমন করতো। সেখানে আমি যে নাচার। আমি কি রকম জানেন? আপনার ডাক্তার যখন কোনো রুগীকে ইনজেকশন দেয় তখন আমি সেদিকে তাকাতে পারিনে। আমার বলতে ইচ্ছে করে, না হয় দাওনা, বাপু, ইনজেকশনটা আমাকেই।

অবশ্য আল্লার মেহেরবানী। ডাক্তারের কাছে এ-সব হামলা পৌঁছয় না। তাঁর রিসার্চ-ক্লবফরম্ দিয়ে তিনি তাঁর পক্ষেদ্রিয় অবশ্য অসাড় করে রেখেছেন।

আপনাকে বলেছি কি সেই গল্পটা? এটি আমি শুনেছি বাচ্চা বয়সে আমাদের বাড়ির এক নিরক্ষর দাসীর কাছ থেকে। তাই এটা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনী মাত্র—কেতাব-পত্রে স্থান পায় নি বলে হয়তো আপনার অজানা।

এক বাদশা প্রায়ই রাজধানী থেকে দূরে বনের প্রান্তে একটি নির্জন উদ্যানভবনে চলে যেতেন শাস্ত্র জ্ঞা। সেখানে বালক যুবরাজের ক্রীড়াসঙ্গী নর্মসথারূপে জুটে যায় এক রাখাল ছেলে। তাদের মধ্যে রাজপুত্র কৃষক-পুত্রের ব্যবধান ছিল না।

বাদশা মারা গেলে পর যুবরাজ বাদশা হলেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে যুবরাজ আর সুযোগ পান নি সেই উদ্যানভবনে আসার। যখন এলেন তখন সন্ধান নিলেন তাঁর রাখাল বন্ধুর—স্বয়ং গেলেন তার পর্ণকুটিরে। রাখাল ছেলে পূর্বেরই মত মোড়ামুড়ি দিল। যুবরাজ শুধোলেন, “তোমার বাপকে দেখছি না যে?”

“তিনি তো কবে গত হয়েছেন! আল্লা তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।”

“গোর দিলে কোথায়?”

“ঐ তো হোথায়, খেজুর গাছটার তলায়। বাবা ঐ গাছের রস

আর তাড়ি খেতে ভালোবাসতো বলে আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন ওরই পায়ের কাছে গোর দি।” (নাগরিক বিদগ্ধ ওমর খৈয়ামও ড্রাক্সাকুঞ্জ সমাধি দিতে বলেছিলেন, না ?)

রাখাল ছেলে জানতো, আগের বাদশা গত হয়েছেন। তাই শুধোলো, “আর হুজুর বাদশা’র গোর কোথায় দেওয়া হলো ?”

ঈষৎ গর্ভভরে নবীন রাজা বললেন, “জানো তো রাজা-বাদশারা বড় নিমকহারাম হয়, বাপের গোরের উপর কোনো এমারৎ বানায় না।...আমি, ভাই, সে-রকম নই। বাবার গোরের উপর বিরাট উঁচু সৌধ নির্মাণ করেছি, দেশবিদেশ থেকে সর্বোত্তম মার্বেল পাথর জোগাড় করে।...এই বনের বাইরে গেলেই তার চুড়োটা এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।”

রাখাল ছেলে বললে, “সে আর দেখি নি? কিন্তু তুমি, ভাই, করেছ কি? শেষবিচার কিয়ামতের দিন, আল্লাহ হুকুমে ফিরিশ্তা ইসরাফিল যখন শিঙে বাজাবেন তখন কত লক্ষ মণ পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেহেশৎ বাগে। তাঁর জগ্ন এমেহন্নতী তৈরি করলে কেন?...আর আমার বাবা তার গোরের উপরকার আধ হাত মাটি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে হুশ হুশ করে চলে যাবে আল্লাহ পায়ের কাছে।”

প্রিয় মৈয়দ সাহেব, আমাকে দিয়েছে জ্যাস্ত গোর বিরাট ইট-সুরকির এই বাড়িতে। বধু হয়ে যে-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে সির্ সির্ করেছিল, যদিও আমার পরনে তখন অতি পুরু আড়ি-বেল বেনারসী শাড়ি, কিংখাপের জামা আর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আপনার ডাক্তারের ঠাকুমার কাশ্মীরী শাল—যার সাচ্চা জরির ওজনই হবে আধসের।

আপনি এ-বাড়ির অতি অল্প অংশই চেনেন। এ-বাড়ির পুরো পরিক্রমা দিতে হলে ঘণ্টাটাক লাগার কথা। আমাকে কয়েক দিন পর পরই এ-পরিক্রমা লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম খুব একটা মন্দ লাগতো না—প্রাচীন দিনের কতশত সম্পদ, টুকিটাকি, নবীন দিনের সঞ্চয়ও কিছু কম যায় না—এস্ট্রক কার যেন প্রেজেন্ট দেওয়া একটা টোলভিসন সেট—যদিও কবে যে এটা কাজে লাগবে, সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে! যেন জাহ্নঘরে এটা-ওটা দেখছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু চিন্তা করুন, যদি আপনাকে জাহ্নঘরে আহারনিজ্রা দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে হয়, তবে কি রকম হাল হয়!

তবু বালি, এও কিছু নয়। সামান্য ইট-পাথর, প্রাচীন দিনের সঞ্চয়—এরা প্রাণহীন। এরা আমার মত সজীব প্রাণচঞ্চল জীবকে আর কতখানি সম্মোহিত করবে?

কিন্তু এরা যে সবাই সর্বক্ষণ চিংকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে,

“ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! ঐতিহ্য! ঐতিহ্য!!”

সবাই বলছে, সাত পুরুষ ধরে এই খানদানী পরিবারে যঃ চলে আসছে, সেইটে তোমাকে মেনে চলতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং মরার সময়ও তার ভবিষ্যতের জন্ম পরিপাটি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আর যারা জ্যান্ত? নায়েব, তাঁর পরিবারবর্গ, এ-বাড়ির দারওয়ান ড্রাইভার বাবুর্চি চাকর হালালখোর, পাশের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন সঙ্কলের চেহারাতেই ঐ একটি শব্দ নিঃশব্দে ফুটে উঠছে: ট্র্যাডিশন। বিগলিতার্থ: বেগমসাহেবা যদি খানদানী প্রাচীন পন্থা মেনে চলেন তবে আমরা তাঁর গোলামের গোলাম, আমরা নামাজের পর পাঁচ বেকৎ আল্লার পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলবো, “ইয়া খুদা, এই শহর-ইয়ার বাস্তু ‘জিলুল্লা’, এই ছুনিয়ায় ‘আল্লার ছায়া’। তাঁরই স্মৃতিতল ছায়াতে আমাদের জীবন, আমাদের

সংসার, আমাদের মৃত্যু, আমাদের মোক্ষ। তুমি তাঁকে শতায়
করো, সহস্রায়ু করো ! আমেন !”

আমি সিনিকু নই। তাদের এ-প্রার্থনায়, তাদের ঐতিহ্যরক্ষার্থ-
কামনায় প্রচুর আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই
আদিম ইনস্টিনক্ট, জীবনসংগ্রামে কোনোগতিকে টিকে থাকবার,
কোনোগতিকে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা।...আজ যদি কালিঘাটের
মন্দির নিশ্চিহ্ন করে পুরুৎ পুজোরীদের আদেশ দেন “চরে খাও গে !”
তবে তারা “যাবে কোথায় ? বর্তমান যুগোপযোগী জীবনসংগ্রামে
যুদ্ধ করার মত কোনো ট্রেনিং তো এদের দেওয়া হয় নি। এদের
অবস্থা হবে, খাঁচার পাখিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যা হয়। খাঁচার
লোহছুর্গে দীর্ঘকাল বাস করে সে আত্মরক্ষার কৌশল ভুলে গিয়েছে,
ছ’বেলা গেরস্তের তৈরি ছোলা-কাড়ং খেয়ে খেয়ে ভুলে গিয়েছে
আপন খাওয়া সংগ্রহ করার ছলা-কলা।

আবার আমার ‘লোক-লস্করের’ কথায় ফিরে আসি। এদের
সবাইকে যদি আমি কাল ডিসমিস করে দি,—সে এক্কেয়ার ডাক্তার
আমাকে দিয়েছেন—তবে কি হবে ? অধিকাংশই না খেয়ে মরবে।
তারা শুধু জানে ট্র্যাডিশন। তাদের জন্ম হয়েছে এ শতাব্দীতে,
কিন্তু মৃত্যু হয়ে গিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

আমি একাধিকবার চেষ্টা দিয়েছিলুম এ-বাড়িতে ফ্রেস্ ব্লাড
আমদানি করতে। চালাক চতুর ছ’একটি ছোকরাকে বয়্ হিসেবে
নিয়ে এসেছি। জানেন কি হলো ? পক্ষাধিক কাল যেতে না যেতেই
তারা ভিড়ে গেল প্রাচীনপন্থী দারওয়ান বাবুর্চির সঙ্গে। বুঝে গেল,
কুটির ঐ-পিঠেই মাখন মাখানো রয়েছে। সিনেমা যাওয়া পর্যন্ত
তারা বন্ধ করে দিল। অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেড়শ’ কিংবা তারো
বেশী ট্র্যাডিশনের মায়াজাল ছিন্ন করার মত মোহমুদগর আমি
রাতারাত—রাতারাত দূরে থাক, বাকি জীবনভর চেষ্টা করলেও—
নির্মাণ করতে পারবো না।

অবশ্য আমার দেবতুলা স্বামী আমাকে বাসরঘরেই সর্বস্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সর্ব বাবদে—সে-কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যায় না। স্বাধীনতা পেয়ে খাঁচার পাখিটার কি হয়েছিল? অনাহারে যখন ভিন্নমি গিয়ে চৈত্রের কাটাচেরা মাঠে পড়ে আছে, তখন শিকরে পাখি তাকে ছেঁ মেয়ে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে কুরে কুরে তার জিগর-কলিজা খেল।

সে-কথা জানে বলেই এ-বাড়ির লোক আমাকে প্রথম দিনই খাঁচাতে পুরতে চেয়েছিল। ওরা সবাই ট্র্যাডিশনের খাঁচাতে। খাঁচার ভিতরকার নিরাপত্তা, অন্তর্জল বাইরে কোথায় পাবে? আমাদের এক সমাজতত্ত্ববিদ নাকি বলেছেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা না পেলেই নাকি আমাদের পক্ষে ভালো হতো। ওঁর বক্তব্য, ইংরেজ আমলে নাকি আমাদের ঘতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনের দুর্শ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

এই বারে মোদা কথা বলি। সেই রাখাল ছেলের বন্ধুর পিতা বাদশা তাঁর সমাধিসৌধের প্রস্তর ভেঙে ভেঙে উঠতে যত না হিমসিম খাবেন, তার সঙ্গে আমার এই উৎকট সঙ্কটের কোনো তুলনাই হয় না। জ্যান্ত গোরের মানুষ আপন ছটকটানিতে নিরুদ্দ-নিঃশ্বাস হয়ে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে।

তথাপি আমি ঐ খানদানী পাষণদুর্গে থাকতে চাই নি। ঠিক মনে নেই, তবে গল্পটি খুব সম্ভব সার্থকা সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর; একটি বালিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যুবকের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। অহেতুক যোগাযোগের ফলে তার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল এক অতি দুর্ধর্ম কৃষাণরক্তশোষক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। আমার মনে নেই, মেয়েটি হয়তো বা অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিল, কিংবা হয়তো বলদৃশু

পদে স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছিল, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এ-জমিদার পুরুষক্রমে যা করছেন, যেটা ছু ছত্রে বলা যায়,

“পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে ছুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।”

(আবার রবীন্দ্রনাথ ! এই মুহুম্মদী মামদোর উপর তিনি আর কত বৎসর ভর করে থাকবেন !) সেই পিচেশী রক্তশোষণ সে চিরতরে বন্ধ করবে—আপ্রাণ সংগ্রাম দিয়ে, প্রয়োজন হলে পরমারাধ্য স্বামীকে পর্ষস্তু চ্যালেঞ্জ দিয়ে, ডিফাই করে ।

এবং দিয়েও ছিল সে মোক্ষম লড়াই তাঁর খাগারিণী শাশুড়ীর বিরুদ্ধে—তিনিই ছিলেন এই প্রজা-শোষণ-উচাটনের চক্রবর্তিনী ।

সংক্ষেপে সারি । তার বহু বৎসর পরে কি পরিস্থিতি উদ্ভাসিত হলো ? সেই পূর্বেরটাই । যথা পূর্বং তথা পরং ! যদৎ তদৎ পূর্ববৎ । ইতিমধ্যে শাশুড়ী মারা গিয়েছেন এবং সেই “বিদ্রোহী” তনুদেহ-ধারিণী বধুটি দশাসই গাডুগুম্ কলেবর ধারণ করে হয়ে গেছেন সে-অঞ্চলের ডাকসাঁইটে রক্তশোষিণী !

ট্র্যাডিশন ! ট্র্যাডিশন !! সেই দ' থেকে বাঁচে কটা ডিঙি ?

কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন ;

“বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।' --দেবতা দয়া করে বললেন--'লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না । মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই !”

সেই ভূতই হলো ট্র্যাডিশন !

তারপর মনে আছে সেই ভূত-ট্র্যাডিশনের পায়ের কাছে “দেশসুদ্ধ সবাই-কে” কি খাজনা দিতে হলো ?

“শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে [খাজনা দেবে] “আক্র দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে’ ।”

সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-‘খাজনা’ দিতে রাজী ছিলাম না। তার কারণ এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে যে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে, আমার ধর্ম আমার ইমান যাবে।

শুভ্রা আশাপূর্ণার সেই বধুর মত দিনে দিনে আপন সত্তা হারিয়ে হারিয়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির অচলায়তনে বিলোপ হতে চাই নি। সেইটেই হতো আমার মহতী বিনষ্টি।...

কিন্তু তবু জানেন, সৈয়দ সাহেব, হাসিকান্না হীরাপান্না রান্নাবান্না নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কেটে যাচ্ছিল। আমাদের কচিকাঁচা বয়সে একটা মামুলি রসিকতার কথোপকথন ছিল “কি লো, কি রকম আছিস?” “কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না।” আমার বেলা কিন্তু “দিন কাটার” সঙ্গে সঙ্গে ছৎপিণ্ড কেটে কেটে রক্ত ঝরে ঝরে ফুসফুসের রক্তে রক্তে প্রবেশ করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধনিঃশ্বাস করে তুলছিল। সর্বশেষে একদিন আমাকে ডুবে মরতে হতো, আমার আপন দিল-ঝরা খুনে। আমি কর্তার কাছে গুনেছি, যুদ্ধের সময় বুলেটের সামান্যতম এক অংশ যদি ছৎপিণ্ডে ঢুকে সেটাকে জখম করতে পারে তবে তারই রক্তক্ষরণের কলে সমস্ত ফুসফুস ফ্লাডেড্ হয়ে যায়, এবং বেচারী আপন রক্তে ডাউনড হয়ে মারা যায়।

অবশ্য আমার বেলা বুলেটের টুকরো নয়। ঐ ভুতুড়ে বাড়ির ট্র্যাডিশনের একখানা আস্ত চাঁই।...

আপনি অবশ্যই শুধোবেন, অকস্মাৎ তোমার এ-পরিবর্তন এল কি করে ?

পরিবর্তন নয়। জাগরণ। নব জাগরণ।

“রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয় ।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ...”

আমার ‘নব জাগরণের’ পর আমি এ-কবিতাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। স্পষ্টত এখানে রূপনারান রূপকার্থে। অবশ্য এর পিছনে কিছুটা বাস্তবতাও থাকতে পারে। শুধু পদ্যায় নয়, কবি গঙ্গাতেও নৌকোয় করে সফরে বেরুতেন। হয়তো বজবজ অঞ্চলে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে যেখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। জেগে উঠলেন রূপনারানের কূলে, ‘কোলে’ও হতে পারত। ‘স্বপ্ন’ দেখাছিলেন এতক্ষণ। অর্থাৎ তাঁর আশী বৎসরের জীবন স্বপ্নে স্বপ্নে, স্বপ্নের আবাস্তবতায় কাটাবার পর হঠাৎ রূপনারানের কূলে পরিপূর্ণ বাস্তবের অর্থাৎ ‘রূপের’ সম্মুখীন হলেন। এক আলঙ্কারিক রূপের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূষণ না থাকলেও যাকে ভূষিত বলে মনে হয় তাই ‘রূপ’। অর্থাৎ পিওর, নেকেড রিয়ালিটি। তার কোনো ভূষণ নেই।

আর ‘নারায়ণ’ অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

আমি অন্তত এই অর্থেই কবিতাটি নিয়েছি।

তাই আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে। তাঁর রূপস্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম “লতীক্” (সুন্দর)। এবং তিনি শিব এবং সত্যও বটে।

কারণ আমি যখন আমার রূপনারানের তীরে পৌঁছলুম, রূঢ়তম-রূপে আমার নিজাভঙ্গের ‘দ্বিজদেহ’ সম্মুখীন হলুম তখন শুধু যে আমার পূর্ববর্ণিত

ট্র্যাডিশন ! ট্র্যাডিশন !!

ট্র্যাডিশনের পাষণপ্রাচীর নির্মিত 'অচলায়তন' দেখতে পেলুম,
তাই নয় ।

আতঙ্ক, বিষয়, এমন কি নৈরাশ্যে প্রায় জীবমৃত্যুবস্থায় আমি
আরো অনেক অন্ধপ্রাচীর, কনসেনটেশন ক্যাম্পের চতুর্দিকে যেরকম
চার দিকে ইলেকট্রিকাইড লোহার কাঁটা জাল থাকে, সেগুলোও
দেখতে পেলুম ।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক বিভীষিকাময় : ভুল আদর্শ, ভুল
মরালিটি, বেকার 'পরোপকার', মহাশূন্যে দোহলায়মান আলোক-
লতার উপর স্তরে স্তরে ফুটে-ওঠা নঙ্গীতের ক্ষণস্থায়ী আকাশকুম্ভ,
কবি বায়রনের ভাষায়

“এ যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া

শ্যামা লতিকার শোভা,

নিকটে ধূসর জর্জর অতি

দূর হতে মনোলোভা ॥”

তার কি সব ভুল দেখেছিলুম তার কিরিস্তি আপনাকে দিতে
গেলে পুরো একখানা “মোহম্মদী পঞ্জিকা” লিখতে হবে । এককথায়
দেহের ভুল, হৃদয়ের ভুল, মনের ভুল—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভুল । অর্থাৎ
কিশোরী অবস্থা থেকেই শুরু করেছি ভুল এবং চলোছি ভুল পথে ।

আমি নিরাশবাদী নই, অতএব চেলে সাজাতে হবে নতুন করে ।
জীবনের সঙ্গে রিটার্নম্যাচের এখনো সময় আছে—প্রস্তুতি করবার ।

*

*

*

কিস্ত পছা কি ?

শিশু যেমন মায়ের হাতে মার খেয়ে মায়ের কোলেই ঝাঁপবে
পড়ে আমি তেমনি “রূপনারানের কূলে” নয় “রূপনারায়ণের কোলে”
আছাড় খেয়ে পড়লুম ।

“বিশ্বরূপের” অতিশয় রূঢ় প্রকাশ এই পৃথিবীতে আমরা যাকে “সৌন্দর্য” বলি। তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। অতি ক্ষুদ্র কীট ও তার জীবনস্পন্দনে অন্তহীন গ্রহসূর্য তারায় তারায় যে জীবনস্পন্দন আছে তার লক্ষাকোহিনী অংশ যতখানি অন্ধভাবে অনুভব করে, ঠিক ঐ অতি অল্পখানি। সে-ই প্রচুর! পর্যাণ্ডেরও প্রচুরতর অপর্ধাণ্ড! আরব্য রজনীর অন-নশ্শার একঝুড়ি ডিম দিয়ে কারবার আরম্ভ করে উজ্জিবাবানুকে বিয়ে করবার প্ল্যান কষেছিল। তার হিসেবে রক্তিমভর ভুল ছিল না—ভুল ছিল তার হঠকারিতায়। আর আমার হাতে তো কুল্লে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি ডিম। কার্ডিনাল নিউম্যান কি গেয়েছিলেন—স্মৃতিদেবলোর জগ্নু ক্ষমা ভিক্ষা করছি—“আমি তো যাত্রাশেষের দূরদিগন্তের কাম্যভূমি দেখতে চাই নে; আমাকে, প্রভু, একটি পা কেলার মত আলো দেখাও।” “আই ডু নট উয়োর্ট টু গী ছ ডিসটেন্ট সীন / ওয়ান স্টেপ ইনাক্ ফর মী।” তাই আমি “বিশ্বরূপ লতীফের” সন্ধানে বেরলুম।

এরপর আমার যে সব নব নব অভিজ্ঞতা হলো তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই, কখনো হবে না, কারণ আমি তাপসী রাবেয়া নই। আমি সব-কিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। তাই আপনি আমার চোখ কেমন যেন কুয়াশা-ভরা ফিল্মে-ঢাকা দেখেছিলেন।

অতএব অতি সংক্ষেপে সারছি।

প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখলুম, আপনি স্বপ্নমগ্ন না হলেও রূপনারানের তীরে আপনি এখনো পৌঁছেন নি। প্রার্থনা করি, কখনো যেন না পৌঁছতে হয়।

সবাইকে যে পৌঁছতে হবে এমন কার, কোন্ মাথার দিব্যি? যদি রূপনারানে পৌঁছতেই হয় তবে যেন পৌঁছেন আপনার গুরুরই মত আশী-বছর বয়সে। আমার কপাল মন্দ (মুনিঋষিরা হয়তো বলবেন “ভাগ্যবস্ত” আমি “অধগুসৌভাগ্যবতী”), আমি যৌবনেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। কোনো ইয়োরোপীয় বিলাসরম্ভসে

নিমজ্জিত এক ধনীর সন্তান যৌবনে বলেছিলেন “স্মালভেশন, মুক্তি, মোক্ষ ? নিশ্চয়ই চাই, প্রভু । কিন্তু not just yet—” অর্থাৎ একটু পরে হলে হয় না, প্রভু ? আমার বিলাসবাসনা তেমন কিছু-একটা নেই, কিন্তু আমার যে ভয় করে । আপনার কাছে যাওয়া হলো না । ৫

তখন পেলুম পীর সাহেবকে । আমার বড় আনন্দ, আপনি তাকে ভুল বুঝেন নি । তিনি কক্থনো আদৌ আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চান নি । বরঞ্চ তিনি যেন হলেন এমবারাসট—যেন একটা ধক্কে পড়লেন । বুঝে গেলুম, তাঁর যেন মনে হয়, যৌবনের কাম বাসনা ইত্যাদি খানিকটে পুড়িয়ে নিয়ে তার পর ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নামা প্রশস্ততর ।

* * *

আপনি জানেন, যদিও পরমকর্মে আমার আসক্তি ছিল সামান্যই, তবু আমি শ্রীঅরবিন্দের আধা-পর্ম-আধা-কালচারাল লেখাগুলো সব সময়ই মন দিয়ে পড়েছি । বুঝেছি অবশ্য সিকি পরিমাণ । তাঁর কথা আমার মনে পড়ল সর্বশেষে । কৃপণ যে-রকম তার শেষ মোহরটির কথা স্মরণ করে সব খতম হয়ে যাওয়ার পর ।

তাঁর সে-লেখাটির নাম বোধহয় উত্তরপাড়া ভাষণ ।

আলীপুরের বোমার মামলা তখন সবে শেষ হয়েছে । সমস্ত বাঙলাদেশ উদ্গ্রীব, এবারে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলাদেশকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন । আর বাঙলাদেশের সঙ্গে বিজাড়ও রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ।

কী গুরুতর দায়িত্ব ! মাত্র একটি লোকের স্বন্ধে !

তখন তিনি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে,—তিনি আপন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুদিনের জন্ত নির্জনে চিন্তা করতে চান ।

আর আমি তো সামান্য প্রাণী। আমার এ-ছাড়া অন্য কোনো গতি আর আছে কি ?

আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হবে। এ-রকম কেরেশ্‌তার মত স্বামী কটা মেয়ে পায় ! তাই জানি, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইব তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। তিনি নিজে ধার্মিক—তাই বলে যে তিনি আমার ধর্মজীবনের অভিযানে বাধা দেবেন না, তা নয়। আমি যে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে বসে বুকে মরবো সেটা তিনি কিছুতেই সহিতে পারবেন না।

হায় আল্লা তালা ! আমাকে তুমি এ কী নির্দেশ দিলে যার জন্ত আমার এই প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমার মালিককে ছেড়ে যেতে হচ্ছে ! সৈয়দ সাহেব, আমি জানি আর আমার স্বামী জানেন, আমাদের আজও মনে হয়, আমাদের বিয়ে যেন সবেমাত্র কয়েক দিন আগে হয়েছে। আমরা যেন এই মাত্র বাজ্‌গশ্‌তী (বাঙলায় কি বলে ? দ্বিরাগমন ?) সেরে স্ত্রীমারের কেবিনে একে অন্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একে অঙ্কে চিনে নিচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, “আমি কী ভাগ্যবান !” লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁর পদস্পর্শ করে বললুম, “আপনি এ কী করলেন ? আমি যে এখনই এই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলুম।”

তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলেন “পাগলী !”

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজ প্রমাণ হতে চললো, আমি পাগলিনী। নইলে আমি আমার এমন মনীষ ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি কেন ?

কত বলবো ? এর যে শেষ নেই।

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের জন্ত কষ্ট হয়,—আপনি

কতখানি বেদনা পাবেন, সে-কথা আমি ভাবাছিনে। যাবার বেলা শেষ একটি কথা বলি। যবে থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় (আল্লা সে-দিনটিকে রোশ্-নীময় করুন!) তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আপনার ভক্ত চেলার সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। হয়তো আপনার চেয়ে কাঁচা লেখকের ভক্তের সংখ্যা আরো বেশী। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এবং অতিশয় পুলকিত হয়েছিলুম। আপনার “ভক্ত” নেই, আপনার কোনো রমণী উপাসিকা নেই। আমিই তখন হলুম আপনার অদ্বিতীয়া সখী, নর্মসহচরী—যে নামে ডাকতে চান, ডাকুন। এ-হেন গৌরবের আসন ত্যাগ করে যেতে যায় কোন্ মূর্খী! তবু যেতে হবে।

সর্বশেষে আপনাকে, নিতান্ত আপনাকে একটি কথা বলি :

ঐ যে কবিতা—কবিতা বলা ভুল, এ যেন আপ্তবাক্য—
“রূপনারানের কোলে/ জেগে উঠিলাম” এর শেষ দুটি লাইনকে আমি
অকুণ্ঠ স্বীকার দিতে পারাছিনে। লাইন দুটি ;

“সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে

মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।”

এখানে আমি কুষ্টিয়ার লালনফকীরের আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, “এখন আমার দেহ সুস্থ, মন সবল, পঞ্চেন্দ্রিয় সচেতন। এ-অবস্থায় যদি আল্লাকে না পাই তবে কি আমি পাব মৃত্যুর পর?—যখন আমার দেহমন প্রাণহীন, অচল অসাড়া?” আমি “সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে” মৃত্যু দিয়ে “সকল দেনা শোধ” করবো না।

আমার যা পাবার সে আমি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই পাব।

খুদা হাকিঙ্! কী আমানিল্লা !!

আপনার স্নেহধন্য কনীজ্

শহর-ইয়ার

হাত থেকে ঝরঝর করে সব কটি পাতা বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল।

এতক্ষণ আমার (এবং শহুর্-ইয়ারেরও) আদরের আলসেসীমান কুকুর “মাস্টার” আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

এখন হঠাৎ বারান্দার পূর্ব প্রান্তে গিয়ে নিচের ছুঁপায়ের উপর বসে উপরের ছুঁপা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়তে আরম্ভ করলো। সম্পূর্ণ অহেতুক, অকারণ।

তবে কি মাস্টার বুঝতে পেরেছে, তার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ! আল্লাই জানেন সে গোপন রহস্য।

* * *

অবসন্ন মনে মৃত দেহে শয্যা নিলুম। ঘুম আসছে না।

ছপুর রাত্রে হঠাৎ দেখি মাস্টার বিছাৎবেগে নালার দিকে ছুটে চলেছে। হয়তো শয়ালের গন্ধ পেয়েছে।

তার খানিকক্ষণ পরে ঐ ছপুর রাত্রে কে যেন বারান্দায় উঠল। উঠুক। আমার এমন কিছু নাই যা চুরি যেতে পারে।

হঠাৎ শুমি ডাক্তারের গলা। আমার কামরার ভিতরই।

এক লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলুম। বাতি জ্বাললুম।

এ কী! আমি স্তেবেছিলুম ওকে পাবো অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায়। দেখি, লোকটার মুখে তিন পোঁচ আনন্দের পলস্তরা।

কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বললে,
“নাশ্বার ওয়ান : আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।

নাশ্বার টু : আমরা আগামী কাল যাচ্ছি সুইডেনে। আমার রিসার্চের কাজ সেখানেই ভালো হবে।

নাস্তার খুী : (কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন) শহর ইয়া-
অন্তঃসত্ত্বা ।

নাস্তার ফোর —”

আমি বাধা দিয়ে বললুম “সে কোথায় ?”

“বারান্দায় । মাস্টারকে খাওয়াচ্ছে ।”

* * *

বারান্দায় এসে শহর-ইয়ারকে বললুম, “সুইডেনে তুমি নির্জনতা
পাবে ।”

তারপর শুধালুম, “আবার দেখা হবে তো ?”

সে তার ডান হাত তুলে—দেখি, আমি তাকে ঢাকা থেকে এনে
যে শাঁখার কাঁকন দিয়েছিলুম সেইটে পরেছে—সে হাত তুলে আশ্বে
আশ্বে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, “কী জানি, কী হবে ।”

* * *

আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
ছিলেন । তিনি আমাকে বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ছর্বল
হাত তুলে বলেন—তখন তাঁর চৈতন্য ছিল কি না জানিনে—“কী
জানি, কী হবে ।” ’

—